সুদূর প্রাচ্যে হিন্দু উপনিবেশ

শ্রীরমেশ চন্দ্র মজুমদার

লিখিত

'Hindu Colonies In The Far East

গ্রন্থের অনুবাদ

অনুবাদিকা

শ্রীসুমিত্রা চৌধুরী, বি, এ,

সম্বোধি পাবলিকেশানস প্রাইভেট লিমিটেড

বাইশ স্ট্র্যাণ্ড রোড,

কলিকাতা-১

মূল্য—পনের টাকা

প্রকাশক
শ্রীরমেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়
সম্বোধি পাবলিকেশানস প্রাইভেট লিমিটেড
বাইশ ষ্ট্র্যাণ্ড রোড
কলিকাতা-এক

মুদ্রক
পি, বি, প্রেস
বত্রিশ-ই শরৎ বসু রোড
কলিকাতা-কুড়ি

মুখবন্ধ

প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে সুদূর প্রাচ্যে হিন্দু উপনিবেশ সম্বন্ধে আমি ইংরাজীতে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলাম (*Hindu Colonies in the Far East*)। কয়েক বৎসরের মধ্যেই মুদ্রিত গ্রন্থের সকল কপি নিঃশেষিত হওয়ায় অনেকে ইহার পুনর্মুদ্রণ ও বাংলা ভাষায় এই বিষয়ে একখানি গ্রন্থ লিখিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় আমি ইহার কোনটিই করিতে পারি নাই। পাঁচ বৎসর পূর্বে আমি ইংরাজী গ্রন্থখানির সংশোধন ও কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছি। ইহার পর অনেকে আবার আমাকে এই বিষয়ে একখানি বাংলা বই লিখিতে অনুরোধ করেন। আমিও উচ্চশিক্ষার বাহন হিসাবে দেশীয় ভাষার উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। কিন্তু সময়াভাববশতঃ আমি এই গ্রন্থ লিখিতে পারি নাই। সম্প্রতি সম্বোধি পাবলিকেশানস আমার ইংরাজী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশের প্রস্তাব করেন। নতুন কোন বাংলা গ্রন্থ লেখার সম্ভাবনা না থাকায় আমি এই প্রস্তাবে সম্মত হই। কিন্তু আমার পক্ষে এই অনুবাদ করা সম্ভবপর নহে জানিয়া আমার কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী সুমিত্রা চৌধুরী এই ভার গ্রহণ করিতে স্বীকার করে। শ্রীমতী ইতিহাসে অনার্স সহ বি, এ, পাশ করিয়া এ বিষয়ে বহু অধ্যয়ন করিয়াছে। তাহার উৎসাহ ও দক্ষতার পরিচয় পাইয়া আমি সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মত হই। আমার ইংরাজী বইর নতুন সংস্করণ অবলম্বনে এই অনুবাদ

করা হইয়াছে—এবং আমি ইহা আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছি। ইংরাজী বইতে যে সকল চিত্র ছিল তাহাও ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। বিদেশী নামের বানান ও শিল্প-সম্বন্ধীয় বহু শব্দের সর্বসম্মত স্বীকৃত বাংলা পরিভাষা না থাকায় অনেক সময় বন্ধনীর মধ্যে ইংরাজী নাম ও শব্দ যোগ করা হইয়াছে। তথাপি মন্দিরাদির বর্ণনা সকল স্থলে খুব সহজবোধ্য ভাষায় করা সম্ভবপর হয় নাই। আমি আশা করি এই গ্রন্থের সাহায্যে অনেকে প্রাচীন হিন্দু জাতির ইতিহাসের এক বিস্মৃতপ্রায় কিন্তু গৌরবময় অধ্যায় সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারিবেন।

শ্রীরমেশ চন্দ্র মজুমদার।

নির্ঘণ্ট

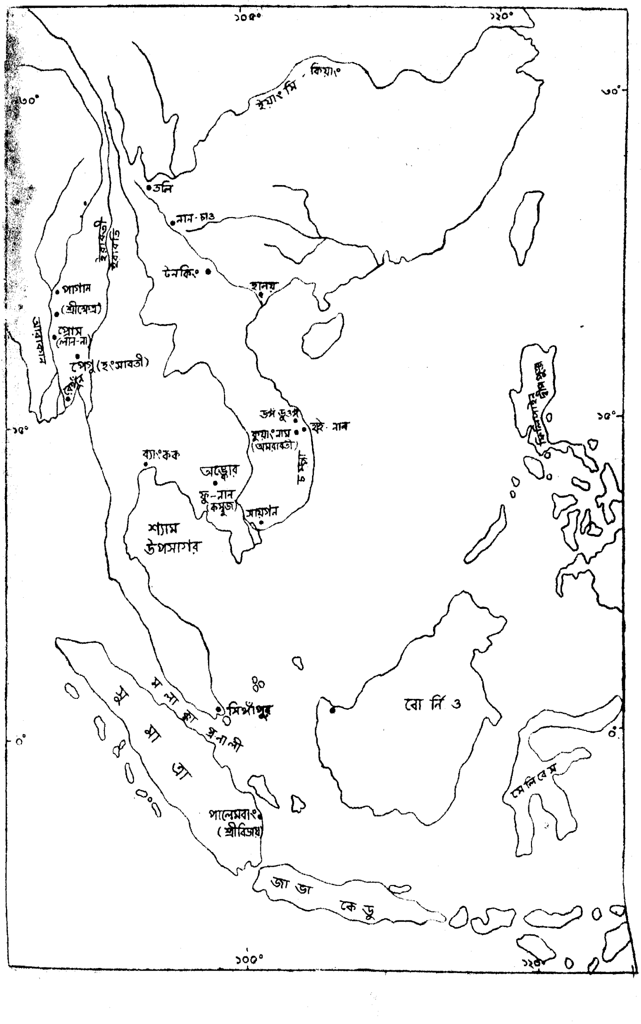
সূচীপত্র

প্রথম ভাগ

উপক্রমণিকা

দ্বিতীয় ভাগ

সুবর্ণদ্বীপ



১০৫°
১২০°
৩০°
ইয়াং সি - কিয়াং
তলি
নান-চাও
টনকিং
হানয়
পাগান
(শ্রীক্ষেত্র)
প্রোম
আরাকান
পেগু (হংসাবতী)
১৫°
ব্যাংকক
অঙ্কোর
ফু-নান
(কম্বুজ)
সায়গন
শ্যাম
উপসাগর
(অমরাবতী)
সিঙ্গাপুর
বোর্নিও
০°
সেলিবেস
পালেমবাং
(শ্রীবিজয়)
জাভা
কেডু
১০০°

প্রথম ভাগ

উপক্রমণিকা

প্রথম অধ্যায়

দেশ ও অধিবাসী

১। দেশ

এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পুর্বে যে বৃহৎ উপদ্বীপ অবস্থিত তাহা ইন্দোচীন নামে পরিচিত। ভারত মহাসাগরে অবস্থিত এই উপদ্বীপের উত্তরে চীন, উত্তর-পশ্চিমে ভারতবর্ষ, পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর ও পূর্বে চীন মহাসাগর।

ব্রহ্ম (বর্মা), শ্যাম (বর্তমান থাইল্যাণ্ড), মালয়, লাওস, কাম্বোডিয়া, আনাম ও টনকিন (ভিয়েৎনাম) প্রভৃতি দেশগুলি লইয়া ইন্দোচীন গঠিত।

এই উপদ্বীপের প্রায় সমস্ত উত্তর-পশ্চিমাংশ ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত। মধ্য এশিয়ার উচ্চ পর্বতশ্রেণী এই দেশকে ভারত ও চীন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইহার উত্তর ও পশ্চিম ভাগে বিস্তৃত হইয়াছে। এই পর্বতমালা হইতে নির্গত হইয়া কতকগুলি সমান্তরাল পাহাড় ইন্দোচীনের দক্ষিণ প্রান্ত অবধি চলিয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যেকার উপত্যকায় ইরাবতী ও তাহার তিনটি শাখানদী ছিন্দুইন, সিত্তাঙ্গ ও সালউইন প্রবাহিত। ইরাবতী মোহনার ব-দ্বীপ হইতে কৃষির উপযোগী বিস্তীর্ণ উপকুলের উৎপত্তি হইয়াছে।

মালয় উপদ্বীপের উত্তরাংশ শ্যাম (বর্তমান থাইল্যাণ্ড) দেশের অন্তর্গত। এই রাজ্যের উত্তর সীমানায় বর্মা ও লাওস, পশ্চিমে বর্মা

ও সাড়ে তিনশো মাইল ব্যাপী বঙ্গোপসাগরের উপকূল, দক্ষিণে মালয় এবং পূর্বে কাম্বোডিয়া ও লাওস।

মালয় নামক একটি সরু ভূখণ্ড এশিয়া মহাদেশের সর্বাপেক্ষা দক্ষিণ সীমানার নির্দেশক। মালয় উপদ্বীপের উত্তরে শ্যাম রাজ্য, পশ্চিমে মালাক্কা প্রণালী ও বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে সিঙ্গাপুর প্রণালী এবং পূর্বে শ্যাম উপসাগর ও চীন সাগর।

ইন্দোচীনের পূর্বাংশে আনাম অবস্থিত। এই দেশের উত্তরে টনকিন, দক্ষিণে কোচিন-চীন, পূর্বে চীনসাগর ও পশ্চিমে লাওস ও কাম্বোডিয়া।

টনকিনের দক্ষিণে আনাম, পূর্বে টনকিন উপসাগর, উত্তরে চীন ও ও পশ্চিমে লাওস্ অবস্থিত। টনকিন ও আনাম এই দুই দেশের বর্তমান নাম উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম। উত্তর হইতে লাওস্, কাম্বোডিয়া ও কোচিন-চীন এই তিনটি রাজ্য দক্ষিণ দিকে পরপর অবস্থিত।

ইন্দোচীন নামে পরিচিত এই বৃহৎ উপদ্বীপটিকে প্রকৃতি পর্বতমালা দ্বারা চারিটি বিভাগে বিভক্ত করিয়াছে। পশ্চিমে (১) বর্মা এবং (২) শ্যাম ও মালয় উপদ্বীপ, (৩) পূর্বে আনাম ও টনকিন, (৪) মধ্যে লাওস্, কাম্বোডিয়া ও কোচিন-চীন।

ছোট বড় প্রায় ছয় হাজারেরও বেশী দ্বীপ লইয়া পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (East Indies) গঠিত। ইহা ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মালয় দ্বীপপুঞ্জ ও ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি বিবিধ নামে অভিহিত হয়। মালয় উপদ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত সুমাত্রা নামে বড় দ্বীপ হইতে এই দ্বীপপুঞ্জ সুরু হইয়াছে এবং ইহা সরু সুন্দা প্রণালী দ্বারা দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত যবদ্বীপ (জাভা) হইতে বিচ্ছিন্ন। জাভার পর পূর্বদিকে নিউগিনি পর্য্যন্ত শ্রেণীবদ্ধভাবে দ্বীপমালা অবস্থিত। এই দ্বীপপুঞ্জ উত্তরে ফিলিপাইন অবধি বিস্তৃত। উত্তরে অবস্থিত ইন্দোচীন হইতে এই দ্বীপপুঞ্জ দক্ষিণ চীন সাগর, ও দক্ষিণে অষ্ট্রেলিয়া হইতে টিমোর

সাগর দ্বারা বিচ্ছিন্ন। এই দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিমে ভারত মহাসাগরে বহু ছোট বড় দ্বীপ আছে। ইহাদের মধ্যে আন্দামান, নিকোবর, সিংহল, মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ ও মাদাগাস্কার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই দ্বীপমালার উত্তরে এইরূপ আর একটি দ্বীপমালা পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে বিস্তৃত। প্রথমে বিস্তীর্ণ বোর্ণিও দ্বীপ—ইহা পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সবচেয়ে বড়। তারপর সেলিবেস এবং ইহার পর মলাক্কাস বা মসল্লা দ্বীপ (Spice Island) নামে অভিহিত কতকগুলি দ্বীপের সমষ্টি।

প্রাচীন ভারতবাসীর কাছে ইন্দোচীন ও মালয় দ্বীপপুঞ্জ সুবর্ণভূমি নামে পরিচিত ছিল। এই নামকরণ হইতে বোঝা যায় যে তখনকার লোকদের মনে বিশ্বাস ছিল যে এই দেশে প্রচুর পরিমাণে সোনা পাওয়া যায়—অন্তত এমন সব দামী জিনিষ পাওয়া যায় যাহার মূল্য সোনার তুল্য।

২। অধিবাসী

ইন্দোচীনের সর্বপ্রাচীন অধিবাসীরা সম্ভবতঃ অষ্ট্রেলিয়া ও নিউগিনির মেলানেসিয়া জাতির এক শাখা ছিল। কিন্তু এখন আর তাহাদের কোন চিহ্ন নাই। ইহার পর আসে আনাম অথবা বর্তমান দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বর্তমান অধিবাসী চামদের পূর্বপুরুষ।

ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের সাহায্যে ইহারা চম্পা নামে এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

ইহার পর যে জাতি আসিল তাহার দুইটি শাখা—মন ও খ্মের। খ্মের জাতি সম্ভবতঃ আদিম অধিবাসীদের তাড়াইয়া কাম্বোডিয়া, কোচিন চীন ও লাওস দেশে বসবাস করে।

ব্রহ্মদেশের ইরাবতী ও সালউইন নদীর উপত্যকায় মন জাতি বাস করিত এবং এই দেশের অন্যান্য অংশ মঙ্গোল জাতীয় তিব্বতীয়-

ব্রহ্ম (Tibeto-Burman) গণ অধিকার করিয়াছিল। মন জাতি ক্রমে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া খ্মেরদের সহিত এক সঙ্গে শ্যাম ও লাওস দেশে বসবাস করে। শ্যাম দেশের এই মিশ্রিত মন-খ্মের জাতি ও কাম্বোডিয়ার খ্মের জাতির মধ্যে বরাবরই একটি প্রভেদ লক্ষিত হয়। থাই জাতি প্রথমে চীনদেশের দক্ষিণে ইউনান প্রদেশে বাস করিত। যে আনাম জাতি প্রথমে টংকিন প্রদেশে বাস করিত এবং পরে সমস্ত চম্পা দখল করে তাহারা সম্ভবতঃ থাই জাতির শাখা।

ইতিহাস ও নৃতত্ত্বের দিক দিয়া মালয় উপদ্বীপ পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত এবং এতুইটি একত্রে মালয়াশিয়া নামে পরিচিত। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়ঃ—

(১) মালয় উপদ্বীপের আদিম ও অসভ্য পর্বতবাসী সেমাঙ্গ ও সকাই জাতি।

(২) মালয় ভাষা ভাষী আদিম মালয় জাতি। সুমাত্রার বটক, অচিনিস্, গয়ো এবং লাম্‌পোং, বোর্ণিওর দায়াক, ও সেলিবেস, টারণেট ও টিডোর দ্বীপের আদিম অধিবাসীরা ইহাদের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের মধ্যে হিংস্র নরখাদক ও আছে আবার শান্ত, সত্যবাদী অতিথিবৎসল সৎলোকও দেখা যায়।

(৩) আধুনিক মালয় অধিবাসী। ইহাদের প্রধানতঃ চার ভাগে বিভক্ত করা হয়ঃ—(১) যাহারা মালয় উপদ্বীপ এবং সুমাত্রা ও বোর্ণিওর উপকূলবর্তী অঞ্চলে বাস করে; (২) জাভাবাসী—ইহারা জাভা মাদুরা, বলি এবং সুমাত্রা ও লম্বোকের কোন কোন অংশে বাস করে; (৩) সেলিবেসের বুগী; এবং (৪) ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের তগলা জাতি।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের কিছু পূর্বে বা প্রারম্ভে যখন প্রথম ভারতবর্ষ হইতে ঔপনিবেশিকগণ পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আসে তখন তাহারা উপরে বর্ণিত এই সকল জাতিকেই দেখিতে পায়। ইহাদের মধ্যে

আদিম উলঙ্গ বর্বর হইতে আরম্ভ করিয়া অপেক্ষাকৃত সুসভ্য ও শিল্পকলাবিদ্ প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকই ছিল। তবে ভাষাবিদ্‌গণ গবেষণার দ্বারা যে সকল প্রমাণ পাইয়াছেন তাহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের প্রারম্ভে যে ভারতীয় উপনিবেশ এখানে গড়িয়া উঠে তাহার বহু পূর্বে কোন কারণে মধ্য ভারতের বহু সংখ্যক আদি অধিবাসীরা এখানে আসিয়া বসতি আরম্ভ করিয়াছিল। কারণ মালয়ের অধিবাসীদের ভাষার সহিত ভারতের মুণ্ডা খাসিয়া প্রভৃতি জাতির ভাষার মিল আছে। তবে বৈজ্ঞানিকেরা এ সম্বন্ধে সঠিক কোন সিদ্ধান্তে এখনও উপনীত হন নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতীয় উপনিবেশের সূত্রপাত

ভারতবর্ষ হইতে প্রথমে কবে বা কি কারণে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আসিয়া ভারতবাসীরা উপনিবেশ স্থাপন করে তাহার কোন সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে এখানে আসার প্রধান কারণ হয়ত এইসকল স্থানের ঐশ্বর্য। বহু প্রাচীনকাল হইতে এই দ্বীপপুঞ্জের বহুবিধ ঐশ্বর্যের, বিশেষতঃ সোনা ও নানাবিধ খনিজ দ্রব্য প্রভৃতির কথা ভারতে প্রচলিত ছিল, এবং ভারতে এইস্থান সুবর্ণভূমি বা সুবর্ণ-দ্বীপ এই নামে পরিচিত ছিল। নানাবিধ মসল্লাও এইদেশে উৎপন্ন হইত। প্রথমদিকে ভারতীয় বণিকগণ সম্ভবত বাণিজ্যের উদ্দেশ্যেই এই সকল দ্বীপে আসেন। কারণ এই সময় মালয় উপদ্বীপের একটি ছোট রাজ্যের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে বলা হইয়াছে যে "এই রাজ্যের (চৈনিক নাম টুয়েন-সুইন) যে বাজার তাহা পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন কেন্দ্র। প্রত্যহ হাজার হাজার বণিক ভারত, পার্থিয়া ও আরও বহু দূর দূর দেশ হইতে তাহাদের বহুবিধ মূল্যবান দ্রব্যাদি লইয়া আসে। পাঁচশো ভারতীয় বণিক পরিবার, দুইশত বৌদ্ধ ও হাজারেরও অধিক ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষ হইতে এখানে আসিয়া বাস করিতেছে। টুয়েন-সুইনের স্থানীয় অধিবাসীদের মেয়েদের বিবাহ করিয়া ভারতীয় ব্রাহ্মণেরা এখানেই বাস করিতেছে ও স্থানীয় অধিবাসীরা তাহাদের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। ব্রাহ্মণেরা নানারূপ দেবদেবীর পূজা করে।"

উপরে বর্ণিত বিবরণ হইতে বোঝা যায় যে বাণিজ্য ছাড়া ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেও অনেক ভারতবাসী, এদেশে আসিয়াছিল।

বৌদ্ধ জাতক এবং অন্যান্য অনেক পুরানো পুথি হইতে এই সকল দূর প্রান্তে উপনিবেশ স্থাপনের অনেক কাহিনী জানা যায়। এইসব

কাহিনীর ঐতিহাসিক মূল্য হয়ত বিশেষ নাই, কিন্তু তাহাদের সবগুলি আলোচনা করিলে এই কথাই মনে হয় যে এক সময়ে ভারত ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে নিয়মিত বাণিজ্য চলিত। বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ভারতীয় বাণিজ্য-তরীগুলি এই সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল, এবং ইহার জন্য ভারতবাসীরা যে কষ্ট ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছে তাহার বিবরণও এই কাহিনীগুলি হইতে জানা যায়।

খ্রীষ্টাব্দের বহু পূর্বে প্রচলিত বৌদ্ধ জাতকের গল্পে ভারত হইতে সুবর্ণভূমিতে সমুদ্রপথে যাওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য।

(১) বিদেহের রাজা যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলে তাঁহার রাণী ধন দৌলত লইয়া চম্পা (ভাগলপুর) নগরে আশ্রয় নেন। কিছুদিন বাদে তাঁহার পুত্র উপযুক্ত বয়সপ্রাপ্ত হইলে রাণীকে বলেন, "তোমার অর্থের অর্দ্ধেক আমাকে দাও। আমি এই অর্থের সাহায্যে সুবর্ণভূমিতে যাইব, সেখান হইতে প্রচুর ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়া আনিয়া পিতার রাজ্য উদ্ধার করিব"। রাণী পুত্রকে নিষেধ করিয়া বলিলেন "পুত্র! সমুদ্র যাত্রায় সাফল্যের আশা কম, কিন্তু বিপদের আশঙ্কা খুব বেশি। তুমি যাইও না।" কিন্তু রাজপুত্র নিষেধ না শুনিয়া কয়েকজন বণিকের সঙ্গে জাহাজে যাত্রা করিলেন। রাজপুত্রের জাহাজডুবি হইয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ফিরিয়া মিথিলা রাজ্য উদ্ধারে সক্ষম হইয়াছিলেন।

(২) বারাণসী সহরের নিকটে ছুতারদের একটি বড় শহর গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই শহরের একহাজার ছুতার পরিবার বিদেশে গিয়া বসবাস করা স্থির করিল। এই উদ্দেশ্যে তাহারা গাছ কাটিয়া খুব বড় ও মজবুত জাহাজ তৈরী করিল। জাহাজ তৈরী শেষ হইলে তাহারা তাহাদের পরিবারবর্গ লইয়া জাহাজে

করিয়া সমুদ্রের দিকে যাত্রা করিল। সমুদ্রপথে আসিতে আসিতে তাহারা একটি দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই দ্বীপে তাহারা নানাবিধ ফলের গাছ, যথা কলা, আম, নারিকেল ইত্যাদি ও ধান, আখ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাইল। তখন তাহারা ঐ দ্বীপে সপরিবারে বসবাস করিতে লাগিল।

(৩) প্রাচীনকালে ভরুকচ্ছ (গুজরাটে অবস্থিত ব্রোচ সহর) নামে খুব প্রসিদ্ধ এক বন্দর ছিল। সেখানকার প্রধান নাবিকের পুত্র অতি অল্প বয়সেই নাবিকের কাজে দক্ষ হইয়া উঠিল। পিতার মৃত্যুর পর পুত্র নাবিকদের প্রধান হইল। নাবিকের কাজে সে এতদূর পারদর্শী ছিল যে, সে যে জাহাজ পরিচালনা করিত তাহা কখনও বিপথগামী হইত না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অনবরত সমুদ্রের লোনা জলের সংস্পর্শে তাহার দুইটি চোখই দৃষ্টিহীন হইয়া গেল। কিন্তু সমুদ্র সম্বন্ধে তাহার কান এমন ছিল যে বণিকেরা বাণিজ্যে যাইবার সময় এই অন্ধ নাবিককেই তাহাদের প্রধান নাবিক হিসাবে নিযুক্ত করিত এবং সেও বিভিন্ন সমুদ্রের নানা বিপদের মধ্য হইতে বণিকদিগকে বাণিজ্য সামগ্রীসহ ফিরাইয়া আনিত।

সুবর্ণভূমিতে বাণিজ্য যাত্রার নানারকম গল্প বৃহৎকথা নামক গ্রন্থেও পাওয়া যায়। এই গল্পগুলিও খৃষ্টাব্দের পূর্ব হইতে প্রচলিত ছিল। ইহাদের মধ্যে সানুদাসের গল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আচের নামে এক দুঃসাহসী স্বর্ণ উপার্জনের আশায় সুবর্ণভূমিতে যাত্রার আয়োজন করিতেছিল; সানুদাস তাহার সঙ্গী হইল। তাহারা সমুদ্র অতিক্রম করিয়া এক পর্বতের তলদেশে অবতরণ করিল। পর্বতের গায়ে যে সব লতা ঝুলিয়াছিল তাহা ধরিয়া তাহারা এই পর্বতে উঠিল। সেখানে মালভূমিতে তাহারা একটি নদীর পারে উপস্থিত হইল। কিন্তু যে কোন জিনিষ এই নদীর জলের সংস্পর্শে আসে তাহাই পাথরে পরিণত হয়। নদীর দুইপারে বাঁশগাছ ছিল ও তাহাদের কঞ্চিগুলি নদীর উপরে ঝুলিয়াছিল। তখন সানুদাস ও

অন্যান্যেরা এই বাঁশগুলি ধরিয়া নদী পার হইল। কিছুদূরে তাহারা একটি উঁচু চড়াইয়ের মাঝখানে একটি সরু পথ দেখিতে পাইল। সেই পথ এত সরু যে মানুষের পক্ষে হাঁটা অসম্ভব। এইখানে তাহারা কতগুলি ভিজা কাঠ জড় করিয়া আগুন জ্বালিল। আগুনের ধোঁয়া দেখিয়া কিরাতের দল আসিয়া উপস্থিত হইল। কিরাতদের নিকট হইতে সানুদাসেরা কয়েকটি ছাগল কিনিল ও ছাগলের উপর চড়িয়া ঐ পথ অতিক্রম করিল। এই পথ অতিক্রম করার সময় তাহারা কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিল একদল লোক আসিতেছে। আচেরের দলের লোকদের সাথে তাহাদের মারামারি আরম্ভ হইল কিন্তু শেষ পর্যন্ত আচেরের দলই জয়ী হইল, তাহারা শত্রুদের খাদে ফেলিয়া দিয়া পথ পার হইল। তখন আচের তাহার সঙ্গীদিগকে ছাগলগুলি মারিয়া ফেলিতে বলিল; উদ্দেশ্য এই যে ছাগলের চামড়া ছাড়াইয়া লইয়া তাহার ভিতরে নিজেরা বসিয়া থাকিবে তখন বড় বড় পাখীরা তাহাদিগকে মাংসখণ্ড ভাবিয়া নিজেদের বাসায় নিয়া যাইবে। কারণ তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে পাখীর বাসায় সোনা পাওয়া যাইবে। আচেরের এরকম নিষ্ঠুরতায় সানুদাস বিরক্ত হইয়া উঠিল এবং সে তাহার ছাগলটিকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু আচেরের অনুচরদের হাত হইতে তাহার ছাগলটিও রক্ষা পাইল না। আচের যেমন অনুমান করিয়াছিল পাখীরা সত্যই মাংসখণ্ড মনে করিয়া তাহাদের লইয়া চলিল। কিন্তু সানুদাসকে যে পাখীটি নিয়া যাইতেছিল আরেকটি পাখী মাংসের লোভে তাহাকে আক্রমণ করে। এই দুই পাখীর মারামারিতে ছাগলের চামড়াটি ছিড়িয়া গেল এবং সানুদাস একটি পুকুরের মধ্যে গিয়া পড়িল। এই পুকুরটি একটি বনের মধ্যে অবস্থিত ছিল। পরের দিন সানুদাস এক নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই নদীর পারের বালিগুলি সোনার চূর্ণ মিশ্রিত ছিল। এর কাছেই একটি আশ্রম ছিল সেখানে সানুদাস এক সাধুর দেখা পাইল।

সানুদাসের গল্পের মধ্যে কতটা সত্য এবং কতটা কল্পনা তাহা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। কিন্তু এটুকু বেশ বোঝা যায় যে তখনকার এই সব অভিযানে বহু বিপদের সম্মুখীন হইতে হইত। কিন্তু ভারতবাসীরা ইহা অগ্রাহ্য করিয়া নতুন দেশে বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপনের জন্য অগ্রসর হইয়াছিল।

তখনকার দিনের সমুদ্র-যাত্রার একটি মোটামুটি বিবরণ চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বর্ণনা হইতে পাওয়া যায়।

পঞ্চম খৃষ্টাব্দে ফা-হিয়েন সমুদ্র পথে প্রথমে বাংলা দেশের বন্দর তাম্রলিপ্ত (তমলুক) হইতে সিংহল দ্বীপে এবং পরে তথা হইতে চীনে যাত্রা করেন। একটি খুব বড় বানিজ্য পোতে ফা-হিয়েন রওনা হন। এই পোতে দুইশত লোক ছিল। অনুকূল বাতাসে পোতটি দুই তিন দিন পূর্বদিকে যাইবার পর ঝড় আরম্ভ হইল। ঝড়ে জাহাজের তলায় ছিদ্র হইয়া গেল। বণিকেরা ভয়ে তাহাদের ভারী ভারী মাল পত্রগুলি জলে ফেলিয়া দিল। তেরদিন এইভাবে ঝড় চলিল, কোন রকমে ভাসিতে ভাসিতে জাহাজটি একটি দ্বীপে গিয়া পৌছিল। ভাটায় জল নামিয়া গেলে পর জাহাজের তলার ছিদ্রগুলি মেরামত করিয়া আবার তাহারা রওনা হইল। এইস্থানে সমুদ্রে জলদস্যুদের উৎপাত খুব বেশী ছিল, এবং একবার তাহাদের হাতে পড়িলে নিশ্চিত মৃত্যু। চারিদিকে বিস্তৃত জলরাশির মধ্যে দিকনির্ণয়ের একমাত্র উপায় দিনে সূর্য ও রাত্রে চাঁদ ও নক্ষত্র মণ্ডলী। আবার যেদিন বৃষ্টি হয় সেদিন দিক নির্ণয়ের কোন উপায় থাকে না, জাহাজ হাওয়ায় ভাসিতে ভাসিতে যায়। আকাশ পরিস্কার হইলে সূর্য অথবা চাঁদ দেখিয়া দিক নির্ণয় করিয়া অবার জাহাজের গতিমুখ ঠিক করা হয়। ইহাছাড়া আবার জলে নিমজ্জিত পাহাড়ে ধাক্কা লাগিয়া জাহাজ ভাঙ্গিয়া যাইবার আশঙ্কাও ছিল। এইভাবে নব্বই দিন চলিবার পর জাহাজ যবদ্বীপে (জাভা) পৌছিল।

সাহিত্যের মাধ্যমেই আমরা সমকালীন জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাইয়া থাকি। উল্লিখিত বিবরণগুলি হইতে এবং তৎকালীন প্রচলিত লোকসাহিত্যে বণিকদের সমুদ্র পথে দূরদূরান্তে বাণিজ্য করিতে যাইবার উল্লেখ হইতে এটুকু বেশ বোঝা যায় যে সেই সময় সমুদ্র পার হইয়া নানাদেশ আবিষ্কার এবং সমুদ্র পথে অভিযানে ভারতবাসীরা বিশেষ অভ্যস্ত ছিল।

প্রাচীন ভারতবাসীরা যে সকল সমুদ্র পথে যাতায়াত করিত তাহার মোটামুটি নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায়। উত্তরে প্রসিদ্ধ বন্দর তাম্রলিপ্ত (মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত তমলুক) হইতে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে নিয়মিত জাহাজ চলাচল করিত। সাধারণতঃ তখন নাবিকেরা বর্মা দেশের উপকূল ধরিয়া অগ্রসর হইত অথবা সোজাসুজি বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিত। তাম্রলিপ্ত ছাড়া আরও কয়েকটি বন্দরও ছিল; ইহাদের একটি পালুরা (উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলায়) আর তিনটি অন্ধ্রপ্রদেশে মসলিপত্তনের নিকটে। ভারতবর্ষের উপকূল ধরিয়া নিয়মিত জাহাজ চলাচল করিত। গঙ্গা যেখানে বঙ্গোপসাগরে মিশিয়াছে সেখান হইতে সিংহল দ্বীপ হইয়া ব্রোচ বন্দর পর্যন্ত নিয়মিত জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা ছিল।

জলপথ ব্যতীত ভারতীয় ঔপনিবেশিকেরা স্থলপথেও পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দেশে যাতায়াত করিত। তাহারা পূর্ব-বাংলা, মণিপুর ও আসামের মধ্য দিয়া বর্ম্মাদেশে পৌঁছিত। চীনা বিবরণ হইতে জানা যায় যে খৃঃ পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে বর্মা ও ইউনানের ভিতর দিয়া স্থলপথে ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশের সঙ্গে নিয়মিত বাণিজ্য চলিত। এই পথ ধরিয়া ভারতবাসীরা দূরপ্রাচ্যের দেশগুলিতে আসে এবং বর্মা দেশে ছিন্দুইন নদীর পার্বত্য-সঙ্কুল উপত্যকায় এবং ইরাবতী, সলউইন, মেকং ও লাল নদীর (Red River) উপত্যকা হইতে ইউনান পর্যন্ত উপনিবেশ স্থাপন করে। ত্রয়োদশ খৃঃ পর্যন্ত ইউনান ভারতীয়দের প্রদত্ত গান্ধার নামে পরিচিত ছিল।

মণিপুর ও আসামের সীমান্তে অবস্থিত পর্বতমালার পূর্বে তা-সিন (Ta-tsin) নামে একটি হিন্দুরাজ্য অবস্থিত ছিল। আরও ১৫০ মাইল পূর্বে ছিন্দুইন নদী ছাড়াইয়া ঙ্গান-সি (Ngan-Si) শহরের উত্তরে আর একটি হিন্দু রাজ্য ছিল। ইউনান প্রদেশেই নান-চাও (Nan-Chao) বা তালি (Tali) রাজ্য অবস্থিত ছিল এবং এখানকার প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে ভারতবর্ষের সম্রাট অশোকের এক পুত্র এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বর্মা দেশের উত্তরভাগে প্রোম, পাগান, তাগাউঙ্গ ও অন্যান্য আরও অনেক জায়গায় ভারতবাসীরা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে এবং এখন পর্যন্ত এই সব জায়গাগুলির ভারতীয় নাম অল্পবিস্তর পরিবর্তিত রূপে প্রচলিত আছে। মধ্য-ইন্দোচীনের লাওস দেশে যে কয়েকটি হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহারও প্রমান পাওয়া যায়। যে সব ঔপনিবেশিকরা জলপথে যাতায়াত করিত তাহারা সমুদ্রপথে অবস্থিত আরাকান, নিম্ন বর্মা অঞ্চল, মালয় উপদ্বীপ, শ্যাম, কাম্বোডিয়া, কোচিন-চীন, ও আনাম, এবং ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও, বলি প্রভৃতি দ্বীপগুলিতে অনেকগুলি রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে এখন পর্যন্তও নানাস্থানের প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে সেই সেই জায়গায় যে সকল প্রাচীন রাজবংশ রাজত্ব করিত তাহাদের আদিপুরুষ ভারতবর্ষ হইতে আসিয়া এই সকল স্থানে রাজ্য স্থাপন করেন।

ব্রহ্মদেশের একটি কিম্বদন্তী হইতে জানা যায় যে বুদ্ধদেবের জন্মের বহুপূর্বে কপিলবস্তু হইতে শাক্যবংশের একজন রাজা একদল সৈন্যসহ আসিয়া ইরাবতী নদীর তীরে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। যে রাজবংশ তিনি স্থাপন করেন তাহা ৩১শ পুরুষ ধরিয়া ব্রহ্মদেশে রাজত্ব করিবার পর পূর্বদেশ—সম্ভবতঃ চীন—হইতে আগত একদল আক্রমণকারীর হাতে পরাজিত হয়। এই সময় ভারতের গঙ্গা নদীর উপত্যকা হইতে দ্বিতীয়

একদল ক্ষত্রিয় ঔপনিবেশিক এইদেশে আসে। এই ক্ষত্রিয় দলের প্রধান প্রথম প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের শেষ রাজার বিধবা রাণীকে বিবাহ করেন এবং একটি নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তর বর্মাদেশের রাজ্য প্রতিষ্ঠার সূত্রপাতের বিবরণ হিসাবে ইহাই জানা যায়।

আরাকানে প্রচলিত কিম্বদন্তী হইতে জানা যায় যে এই-দেশের প্রথম রাজা ছিলেন বারাণসী রাজ্যের রাজার এক পুত্র। ইনি রামাবতা নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। এই রামাবতী নামের অপভ্রংশ রম্ব্যি বা রামি নাম এখনও প্রচলিত। কাম্বোডিয়ায় রাজ্য স্থাপনের সূত্রপাত হিসাবে যাহা জানা যায় তাহা নিম্নে বিবৃত হইল :—

"ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা আদিত্যবংশ তাঁহার এক পুত্রের উপর বিরূপ হইয়া তাহাকে রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দেন। রাজপুত্র কোক থ্লোক (Kok Thlok) দেশে আসেন ও স্থানীয় রাজাকে পরাজিত করিয়া নিজে রাজা হন। একদিন সায়াহ্নে এই নতুন রাজা সমুদ্র উপকূলে ভ্রমন করিতেছিলেন এমন সময় হঠাৎ জোয়ার আসায় সেই স্থানে রাত্রি যাপন করিতে বাধ্য হন। একটি অপরূপ রূপসী নাগকন্যা উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং রাজা তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে রাজী হন। তখন নাগিনীর পিতা নাগরাজা তাহার ভাবী জামাতার রাজ্য বিস্তার করার উদ্দেশ্যে এইদেশের যে অঞ্চল সমুদ্রের জলে মগ্ন ছিল সেই অঞ্চলের সমুদ্রের সমস্ত জল পান করিয়া ফেলে। তাহার পর রাজার এক নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দেশের নাম পরিবর্তন করিয়া 'কাম্বোজ' রাখা হয়।" দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নানাস্থানে যে ভারতীয় উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং ক্রমশঃ এইসকল স্থানে ভারতীয়েরা রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল উপরোক্ত কাহিনীগুলি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া

যায়। কিন্তু এই উপনিবেশগুলি যে কোন্ সময়ে আরম্ভ হইয়াছিল তাহার কোন সঠিক তারিখ নির্ণয় করা যায় না। চীনা ও গ্রীক লেখকের বিবরণ এবং এইসব জায়গায় যে ভারতীয় লেখগুলি (inscriptions) পাওয়া যায় তাহা হইতে এই প্রমাণিত হয় যে এই উপনিবেশগুলি দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে এবং কোন কোনটি ইহারও পূর্বেই স্থাপিত হইয়াছিল। ইহা অনুমান করা স্বাভাবিক যে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের পূর্বেই তাহারা এই সকল স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল এবং এই উপনিবেশ স্থাপনের পূর্ব হইতে ভারতবর্ষের সহিত এই সকল স্থানের নিয়মিত যাতায়াতের প্রচলন হইয়াছিল। কাজেই খ্রীষ্টজন্মের বেশ কয়েক শতাব্দী আগে হইতেই যে ভারতবর্ষ এবং ইন্দো-চীন ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহে মানিয়া লওয়া যায়।

দ্বিতীয় ভাগ

সুবর্ণদ্বীপ

প্রথম অধ্যায়

প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ

১। মালয় উপদ্বীপ

খুব প্রাচীনকাল হইতেই মালয় উপদ্বীপে হিন্দুসভ্যতার বিস্তার হইয়াছিল। ভারত ও চীনের বাণিজ্যপথের মধ্যে অবস্থিত এই উপদ্বীপ খ্রীষ্টজন্মের বহু পূর্ব হইতেই ভারতবর্ষের পরিচিত ছিল।

খ্রীষ্টীয় প্রথম পাঁচ শতাব্দের মধ্যে অনেকগুলি হিন্দুরাজ্য এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে 'লাঙ্গ-কিয়া-সু' রাজ্য দ্বিতীয় শতাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দেশ সম্বন্ধে চীনা গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায়।

"এই দেশের লোকেরা বলে যে প্রায় চারশত বছর আগে (অর্থাৎ ১০০ খ্রীষ্টাব্দে) এই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে যখন রাজার শাসন শিথিল হইয়া আসে তখন রাজ্যের লোকেরা রাজার একজন শক্তিশালী আত্মীয়কে রাজা করিতে চাহে। রাজা খবর পাইয়া ঐ আত্মীয়কে বন্দী করেন, কিন্তু যতবারই শিকল দিয়া তাহাকে বাঁধিয়া রাখা হয় ততবারই শিকল ছিঁড়িয়া যায়। এই ঘটনায় রাজা তাহাকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী মনে করিয়া ভয় পাইয়া তাহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিলেন। তখন ঐ ব্যক্তি ভারতবর্ষে গিয়া আশ্রয় লইল। এবং ঐ দেশের রাজার বড় মেয়েকে বিবাহ করিল। লাং-কিয়া-সু-এর রাজার হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে রাজ্যের বড়

বড় কর্মচারীরা ভারতবর্ষ হইতে এই ব্যক্তিকে ফিরাইয়া আনিয়া *দেশের রাজা করিল। প্রায় কুড়ি বছর রাজত্ব করার পর তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার ছেলে ভগদত্ত রাজা হইলেন। ৫১৫ খ্রীঃ ভগদত্ত আদিত্য নামে দূতের হাতে চীন সম্রাটের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন।"* ৫২৩, ৫৩১, এবং ৫৬৮ খ্রীঃ ভগদত্ত চীনে দূত পাঠান।

অন্যান্য হিন্দুরাজ্যের মধ্যে 'কামলঙ্কা,' 'কলসপুর' (বর্মাদেশের দক্ষিণ প্রান্তে অথবা মালয় উপদ্বীপের উত্তরে), 'কল' (কেড্ডা) এবং পহঙ্গ রাজ্যের নাম উল্লেখযোগ্য। কামলঙ্কার অপর নাম কর্মরঙ্গ। কেহ কেহ মনে করেন যে ইহা হইতেই কামরাঙ্গা ফলের নাম উৎপত্তি হইয়াছে। মালয় উপদ্বীপে প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার কিছু নিদর্শন আছে। সুঙ্গইবাটুতে কয়েকটি ভাঙ্গা পাথরের মূর্তি ও একটি হিন্দু মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। ইহার কাছেই কেড্ডাতে একটি ইটের তৈরী বৌদ্ধ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। এখানে প্রাপ্ত একটি সংস্কৃত খোদিত লিপি হইতে জানা যায় ইহা খ্রীষ্টীয় চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দে তৈরী হইয়াছিল। ইহার কাছেই কয়েকটি স্তম্ভ পাওয়া যায়—সম্ভবতঃ কোন বৌদ্ধ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ—এগুলিতেও যে উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া যায় তাহার দ্বারা এইগুলি স্থাপনের সময় চতুর্থ অথবা পঞ্চম শতাব্দ নির্দেশ করে। পেরাকে হিন্দুদেবতা বিষ্ণু ও তাঁহার বাহন গরুড়ের মূর্তি অঙ্কিত সোনার অলঙ্কার এবং হিন্দু রাজা শ্রীবিষ্ণুবর্মনের নামাঙ্কিত একটি কর্ণেলিয়ান প্রস্তরের প্রাচীন সীলমোহর (seal) পাওয়া গিয়াছে।

ইহা ছাড়া আরও অনেক সুন্দর সুন্দর মূর্তি ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ টাকুয়াপার চারিদিকে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব উপকূলে ব্যাণ্ডন উপসাগরের ধারে চৈয়া (caiya), ন্যাখন শ্রী ধম্মরৎ (Nakhan Sri Dhammarat) এবং ভিয়েংশ্রা (Vieng Sra) প্রভৃতি জায়গা-গুলিতে মন্দির, মূর্তি প্রভৃতি হিন্দু বসতির অনেক চিহ্ন বিদ্যমান। লিগোর, চৈয়া ও টাকুয়াপার উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বেই এইরূপ বসতি ছিল। মালয়ে এইরূপ বহু উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি সংস্কৃত ভাষায় চতুর্থ বা পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দে প্রচলিত ভারতীয় লিপিতে লেখা। ইহাদের মধ্যে দুইটিতে বৌদ্ধমন্ত্র থাকায় বোঝা যায় যে এইস্থানে বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার হইয়াছিল। কেড্ডার নিকট তিনটি সংস্কৃত মহাযান সূত্র উৎকীর্ণ একটি মাটির ফলক পাওয়া গিয়াছে। এই সূত্র তিনটি 'সাগরমতিপরিপৃচ্ছা' নামক গ্রন্থের চীনা অনুবাদে পাওয়া যায়। এই লিপিগুলি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে চতুর্থ বা পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতীয়েরা মালয় উপদ্বীপের উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিমে উপনিবেশ স্থাপন করে এবং ঔপনিবেশিকদের মধ্যে যেমন দক্ষিণ ভারতের লোক ছিল তেমন উত্তর ভারতের লোকও ছিল। একটি উৎকীর্ণ লিপিতে 'রক্তমৃত্তিকার অধিবাসী' বুদ্ধগুপ্ত নামে একজন মহানাবিকের উল্লেখ আছে। 'রক্তমৃত্তিকা' বাংলাদেশের মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটি গ্রামের প্রাচীন নাম বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

মালয় উপদ্বীপের পূর্ব হইতে পশ্চিমে হিন্দু ঔপনিবেশিকদের বসবাসের চিহ্ন ছড়ানো রহিয়াছে। প্রাচীন লেখ ও এইসব ভগ্নাবশেষ হইতে অনুমান হয় যে ভারতবর্ষ হইতে আসিয়া প্রথমে তাহারা আধুনিক 'টাকুয়াপা' নামক বন্দরে অবতরণ করিত এবং স্থলপথে ব্যাণ্ডন উপসাগরের কূলে পৌঁছিত। এখান হইতে আবার সমুদ্রপথে জাভা, সুমাত্রা ও অন্যান্য দ্বীপগুলিতে যাত্রা করিত। আবার অনেকে মলাক্কা প্রণালী ঘুরিয়া বরাবর সমুদ্রপথে এইসব দ্বীপগুলিতে আসিত।

মালয় পুরাতত্ত্ব মিশনের এক রিপোর্টে বলা হইয়াছে: "হিন্দু উপনিবেশ পশ্চিম হইতে পূর্বে বিস্তৃত ছিল। ইহাদের মধ্যে ত্যাখন শ্রী ধম্মরৎ (লিগোর) প্রধান ছিল। এখানে একটি বিরাট 'স্তূপ' ও তাহার চারিদিকে পঞ্চাশটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কিছু উত্তরে চৈয়াতে আর একটি উপনিবেশ ছিল।

সেখানে প্রথমে ব্রাহ্মণ্য ও পরে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই দুই স্থানের ঔপনিবেশিকরা প্রধানতঃ কৃষিজীবি ছিল। অন্যান্য স্থানের অধিবাসীরা টিন ও সোনার খনিতে কাজ করিয়া বহু ধন-সম্পদের অধিকারী হইয়াছিল।

"যে সমস্ত প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে ব্যাণ্ডন উপসাগরের কূলে অবস্থিত দেশগুলিতেই ভারতীয় সভ্যতার প্রথম বিস্তার হইয়াছিল। পশ্চিমে অবস্থিত টাকুয়াপা হইতে ভারতবাসীরা স্থলপথে এখানে আসিয়া বসবাস করিয়াছিল একথা এখানে লোকমুখে এখনও প্রচলিত। টাকুয়াপার কাছাকাছি অনেক জায়গার লোকদের আকৃতিতে ভারতীয় সাদৃশ্য দেখা যায়। ন্যাখন শ্রী ধম্মরৎ ও পতলাংয়ে ভারতীয় ব্রাহ্মণ উপনিবেশ দেখা যায় এবং তাহাদের পূর্বপুরুষ ভারতবর্ষ হইতে মালয়ের মধ্য দিয়া স্থলপথে আসিয়া এই সব স্থানে বসবাস করিয়াছিল বলিয়া তাহারা দাবী করে।"

২। জাভা

মালয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে জাভা একটি বড় দ্বীপ। জাভার উত্তরে ছোট বড় অনেক দ্বীপ আছে, ইহার মধ্যে মাদুরা দ্বীপই প্রধান। মাদুরা ও জাভার মধ্যবর্তী প্রণালী খুবই সরু, কোন কোন জায়গায় এক মাইলেরও কম চওড়া। এইজন্য মাদুরা দ্বীপকে জাভার অংশ হিসাবে ধরা হয়।

এক সারি পর্বতমালা জাভার মধ্যভাগে অবস্থিত হইয়া জাভা দ্বীপটিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। এখানে অনেক নদী আছে কিন্তু দুইটি ছাড়া অন্যগুলি সবই নৌচলাচলের অযোগ্য। কিন্তু এই নদীগুলি জাভাদ্বীপের সেচ কার্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। ইহাদের সহায়তায় জাভার ভূমি উর্বরা শস্য-শ্যামলা হইয়াছে।

হিন্দু উপনিবেশ এই দ্বীপের প্রথম যুগের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। এখানে প্রচলিত কিম্বদন্তীতে প্রথম

ঔপনিবেশিকগণ ও তাহাদের নায়ক অজিশক মহাভারতে উল্লিখিত হস্তিনাপুরের রাজবংশীয়রূপে বর্ণিত হইয়াছে। অন্য একটি প্রচলিত কাহিনী হইতে জানা যায় যে হস্তিনাপুর হইতে কয়েকজন রাজপুরুষ প্রথমে গুজরাটে আসেন এবং তাঁহাদের বংশধরেরা কিছুকাল পরে জাভায় গমন করেন।

আবার অন্য কতকগুলি কিম্বদন্তীতে জাভার আদি উপনিবেশকারীদিগকে কলিঙ্গ প্রদেশের লোক বলা হইয়াছে। ইহাদের একটিতে বলা হইয়াছে যে "কলিঙ্গ দেশের রাজা প্রায় কুড়িহাজার পরিবারকে জাভা দ্বীপে প্রেরণ করেন, এবং ক্রমশ ইহাদের বংশ বিস্তৃত হয়। কিন্তু ২৮৯ শকাব্দ পর্যন্ত ইহাদের মধ্যে সভ্যতার কোন বিস্তার হয় নাই। এই সময়ে কানো নামে এক রাজার রাজত্বে ইহারা সভ্যতার আলোকে আসে। কানোর বংশধরগণ চারিশতাধিক বৎসর রাজত্ব করেন। এই সময়ে অস্তিনা নামক স্থানে আর একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পুলসর, তাঁহার পুত্র অবিয়াস, ও তাঁহার পুত্র পাণ্ডুদেবনাথ পরপর এখানে রাজত্ব করেন।"

এই গল্পের শেষ অংশের রাজাদের নাম ও মহাভারতে খ্যাত রাজ পুরুষদের নামের মিল খুবই সুস্পষ্ট—পরাসর (পুলসর), ব্যাস (অবিয়াস) এবং পাণ্ডু।

পরবর্তীকালে প্রচলিত প্রবাদ অনুযায়ী এখানে হিন্দু রাজত্ব ৫৬ খৃঃ স্থাপিত হয়। অজিশকের সময় ৭৮ খ্রীঃ জাভায় নূতন অব্দের প্রচলন হয়। ভারতেও ৭৮ খৃঃ শকাব্দের আরম্ভ হয়। ১৩২ খ্রীঃ জাভার রাজা দেববর্মণ চীনদেশে দূত প্রেরণ করেন। কাজেই খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দে যে জাভায় হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ইহা সুনিশ্চিত।

পশ্চিম জাভায় অবস্থিত হিন্দু রাজ্যের কিছু বিবরণ সংস্কৃত লেখ হইতে জানা যায়। এই লেখ চারটি রাজা পূর্ণবর্মনের রাজত্বকালের।

ইহাতে বলা হইয়াছে যে পূর্ণবর্মনের পূর্বে তাঁহার পিতা রাজাধিরাজ ও পিতামহ রাজর্ষি রাজত্ব করিয়াছিলেন। পূর্ণবর্মনের রাজধানীর নাম ছিল তারুমা এবং তিনি বাইশ বছর রাজত্ব করেন।

মধ্য জাভায় অবস্থিত হিন্দু রাজ্যকে চীনারা হো-লিং (Ho-ling) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। হো-লিং অথবা কলিঙ্গ রাজ্য ভারতের কলিঙ্গ প্রদেশের অধিবাসীদের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। সপ্তম খ্রীষ্টাব্দে ইহা বৌদ্ধ ধর্মের একটি কেন্দ্র ছিল। হো-লো-টান (Ho-lo- tan) নামে আর একটি রাজ্যের নাম চীনারা উল্লেখ করিয়াছে! পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে অনুমান করেন যে এই রাজ্যটিও জাভায় অবস্থিত ছিল। ৪৩০ হইতে ৪৫২ খ্রীঃ মধ্যে এই রাজ্য হইতে চীনে দূত প্রেরণ করা হয়।

৩। সুমাত্রা

মালয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সুমাত্রা দ্বীপটি বোর্ণিওর পরে সর্বাপেক্ষা বড়। ইহার দুইটি মাথা সরু ও মধ্যস্থান চওড়া। বিষুবরেখা ইহার মধ্যখান দিয়া গিয়া ইহাকে দুইভাগে ভাগ করিয়াছে। একটি পর্বতমালা লম্বালম্বি ভাবে এখানে অবস্থিত থাকার ফলে পশ্চিমে ভারত সাগরের ও পর্বত মালার মধ্যে সরু সমতল ভূমি ও পূর্বে বিস্তৃত উর্বরা সমতল ভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। এখানে খনিজ সম্পদ প্রচুর, কিন্তু লোক বসতি খুবই কম।

ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য এখানে খুব প্রাচীনকাল হইতে হিন্দু উপনিবেশ আরম্ভ হয়। চীন ও ভারতের বাণিজ্য পথের মধ্যে অবস্থিত এই দ্বীপের পূর্বভাগে তখন অনেক বন্দর ও বাণিজ্য কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। খ্রীষ্টীয় অব্দের দু'তিনশ বছর আগে না হইলেও অন্তত ইহার গোড়ার দিকে যে এখানে হিন্দু উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

সুমাত্রাদ্বীপের সর্বপ্রথম হিন্দু রাজ্য শ্রীবিজয় (পালেমবাঙ্গ)। চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দে অথবা ইহার কিছু আগে এই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সপ্তম খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ইহা খুব ক্ষমতাশালী হইয়া ওঠে। ইহা এই সময়ে মলয়ু (আধুনিক জাম্বি) নামে অপর একটি হিন্দু রাজ্য জয় করে এবং বঙ্কা দ্বীপে ইহার রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। ৬৮৪ খ্রীঃ শ্রীজয়নাশ (অথবা জয়নাগ) নামে এক বৌদ্ধ রাজা এখানে রাজত্ব করিতেন। ৬৮৬ খ্রীঃ তিনি অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারী জাভার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং এই উপলক্ষে একটি ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। এই ঘোষণাপত্রের দুইটি প্রতিলিপি পাথরে খোদিত আছে।

শ্রীবিজয়ের রক্ষাকর্তা দেবতাগণের প্রশস্তি দিয়া ইহার আরম্ভ। তারপর ইহাতে বলা হইয়াছে যে শ্রীবিজয় রাজ্যের অধীনস্থ রাজ্যগুলির কোন লোক যদি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, বিদ্রোহের পরিকল্পনা, কিম্বা এই উভয় কার্যের সাহায্য করে তাহা হইলে তাহাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে। প্রকৃত দোষীর সঙ্গে তাহার পরিবার ও জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সকলেই দোষী সাব্যস্ত হইবে ও শাস্তি পাইবে। অপর পক্ষে যাহারা এই রাজ্যের অনুগত থাকিবে তাহারা দেবতার আশীর্বাদ পাইবে।

ইৎসিং (I-tsing)-এর বিবরণ হইতে জানা যায় যে দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপগুলির মধ্যে শ্রীবিজয় বৌদ্ধ সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। এখানকার রাজার নিজস্ব বাণিজ্যতরী শ্রীবিজয় ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য করিত। চীনের সহিত বাণিজ্যেরও প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল শ্রীবিজয়। এখান হইতে চীনে সমুদ্রপথে নিয়মিত বাণিজ্যতরী চলাচল করিত।

লিগোরে (Ligor, মালয় উপদ্বীপে) প্রাপ্ত ৭৭৫ খ্রীঃ উৎকীর্ণ লেখ হইতে জানা যায় যে শ্রীবিজয় রাজ্য ব্যবসা বাণিজ্যে এবং শক্তিতে খুব ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। আশেপাশের সমস্ত

রাজ্যগুলি শ্রীবিজয়ের বশ্যতা স্বীকার করিত। এই লেখ হইতে প্রমাণিত হয় যে শ্রীবিজয়ের বৌদ্ধ রাজা ৭৭৫ খ্রীঃ আগেই সমগ্র মালয়ে না হউক ব্যাণ্ডন উপসাগর পর্যন্ত তাহার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

লেখগুলি হইতে বেশ বোঝা যায় যে সপ্তম খ্রীঃ শেষ ভাগ হইতে অষ্টম খ্রীঃ শেষভাগ পর্যন্ত শ্রীবিজয়ের রাজারা আক্রমণাত্মক নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। ৬৮৬ খ্রীঃ মধ্যে শ্রীবিজয়ের রাজারা পার্শ্ববর্তী রাজ্য মলয়ু অধিকার করেন, বঙ্কা দ্বীপ জয় করেন এবং জাভার মত শক্তিশালী রাজ্যের বিরুদ্ধেও সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। একশতাব্দীর মধ্যেই এই রাজ্য মালয় দ্বীপপুঞ্জে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ভারত মহাসাগর হইতে চীন মহাসাগরে যাতায়াতের দুইটি পথই নিজেদের পরিচালনাধীনে রাখার উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই যে শ্রীবিজয় রাজ্য উত্তর-পশ্চিমে মলাক্কা প্রণালী ও দক্ষিণ পূর্বে সুন্দ প্রণালীতে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল তাহা অনুমান করা যায়। এই দুই স্থান অধিকার করার ফলেই শ্রীবিজয়ের রাজারা পূর্ব হইতে পশ্চিমের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। চীনা ইতিহাসে দেখা যায় যে ৬৭০ হইতে ৭৪১ খ্রীঃ মধ্যে বহুবার শ্রীবিজয় হইতে চীনে দূত পাঠানো হইয়াছিল।

চীনা ইতিহাসে কান-টো-লি (Kin-to-li) নামে যে রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা খুব সম্ভবত সুমাত্রা-তেই অবস্থিত ছিল। ৪৫৪ হইতে ৪৬৪ খ্রীঃ মধ্যে কোন এক সময়ে এই রাজ্যের রাজা, শ্রীবরনরেন্দ্র, রুদ্র নামে একজন হিন্দুকে দূত রূপে চীন দেশে পাঠান। ৫১৯ খ্রীঃ বিজয়বর্মণ নামে আর একজন রাজা চীন দেশে দূত পাঠান। ইহার পিতা গৌতম সুভদ্র বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং ৫০২ খ্রীঃ ইনি এইস্থানে রাজত্ব করিতেন।

৪। বোর্নিও

বোর্নিও মালয়দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সবচেয়ে বড় দ্বীপ কিন্তু লোক বসতি খুব কম। গভীর জঙ্গল ও পর্বতমালায় দ্বীপটি আচ্ছন্ন।

মহাকাম ও কাপুয়াস এই দুইটি নদীর তীরে হিন্দু উপনিবেশকারীদের বহু স্মৃতিচিহ্ন ছড়ানো রহিয়াছে। প্রচীন কালের যে সব নিদর্শন পাওয়া যায় তাহা হইতে এই অনুমান হয় যে এখানকার উপনিবেশ বহুদিন হইতে ধীরে ধীরে গড়িয়া ওঠে এবং অনেকদিন স্থায়ীও হইয়াছিল। সমুদ্রের সাথে যে স্থানে নদী মিলিত হইয়াছে সেখানে বন্দর প্রতিষ্ঠার সুবিধা ও নদীপথে দেশের অভ্যন্তরে যাতায়াতের সুবিধাই পূর্বোক্ত নদী দুইটির তীরে বসতি গড়িয়া ওঠার প্রধান কারণ।

এই অঞ্চলে হিন্দু সভ্যতা বিস্তারের সর্বপ্রাচীন চিহ্ন মহাকাম নদীর তীরবর্তী মুয়রা-কামান (Muara Kaman) নামক স্থানে প্রাপ্ত সাতটি সংস্কৃত লেখ। এইগুলি যজ্ঞ উপলক্ষে স্থাপিত পাথরের যুপকাষ্ঠের গাত্রে খোদিত হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে কুণ্ডুঙ্গের (কৌণ্ডিন্য) পৌত্র ও অশ্ববর্মনের পুত্র রাজা মূলবর্মন 'বহু-সুবর্ণকম' নামে এক যজ্ঞ করেন এবং বপ্রকেশ্বরের পুণ্যক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের কুড়ি হাজার গাভী দান করেন। এই লেখগুলি আনুমানিক ৪০০ খ্রীঃ রচিত; কাজেই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে চতুর্থ খ্রীঃ এখানে হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম রাজ দরবারে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল; জন সাধারণের মধ্যে ব্রাহ্মণদের সংখ্যাও বিশেষ কম ছিল না।

হিন্দু সভ্যতার অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য মুয়রা-কামানের উত্তরে কামবেঙ্গ গুহা। গুহাটি দুই অংশে বিভক্ত। পিছনের অংশে কতগুলি হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবতাদের মূর্তি ও কয়েকটি ক্ষয়প্রাপ্ত কাঠের বরগা পাওয়া যায়। মূর্তিগুলির নীচে বেদীতে

বসাইবার জন্য লোহার কাঁটা আছে। লোহার কাঁটাগুলি থাকায় বোঝা যায় যে এক সময়ে মূর্তিগুলি কোন মন্দিরে স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু বিপদের আশঙ্কায় গুহার ভিতরে নিরাপদ স্থান হিসাবে রাখা হইয়াছে। হিন্দু মূর্তিগুলি শিব, গণেশ, নন্দী, অগস্ত্য, নন্দীশ্বর ব্রহ্মা, স্কন্দ ও মহাকাল প্রভৃতি দেবতার।'

ইহা ছাড়া আরও যে সকল হিন্দু মন্দির প্রভৃতির ভগ্নাংশ বোর্ণিওতে পাওয়া যায় তাহা হইতে বোঝা যায় যে খ্রীষ্টাব্দের প্রথম বা দ্বিতীয় শতকেই এখানে হিন্দু উপনিবেশকারীরা বসবাস আরম্ভ করিয়াছিল। অনেকে মনে করেন যে বোর্ণিও দ্বীপই বায়ু পুরাণে বর্ণিত বর্হিণ দ্বীপ।

৫। বলিদ্বীপ

বলিদ্বীপ জাভার পূর্বে অবস্থিত। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান মাত্র দেড় মাইল আন্দাজ চওড়া একটি প্রণালী। বলিদ্বীপের পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে একটি পর্ব্বতমালা বিস্তৃত এবং ইহার দুই দিকে উর্ব্বরা উপত্যকা ও সমতল ভূমি। এই দ্বীপে অনেক নদ নদী আছে কিন্তু এগুলি এত অপ্রশস্ত যে ছোট ছোট নৌকা ছাড়া অন্য কিছু নদী পথে যাইতে পারে না।

মালয়দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে একমাত্র বলিদ্বীপেই ইস্‌লাম ধর্ম বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই এবং প্রাচীন হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতা এখনও এই দ্বীপে বিরাজ করিতেছে। এই দ্বীপগুলির আদিম অধিবাসীদের রীতিনীতির সংস্পর্শে আসিয়া হিন্দু ধর্মের ও সমাজের কি পরিবর্তন হইয়াছিল তাহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন এখানে পাওয়া যায়।

৫১৮ খ্রীঃ চীনের লিয়াং (Liang) বংশের রাজত্বকালে বলির রাজা চীন দেশে দূত প্রেরণ করেন।

লিয়াং বংশের ইতিহাসে বলিদ্বীপের রাজা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"রাজবংশের নাম কৌণ্ডিন্য এবং এর আগে চীনের সহিত তাহার কোন সংযোগ ছিল না। তাঁহার বংশ পরিচয় হিসাবে রাজা কিছুই

বলিতে পারেন না, কিন্তু শুদ্ধোদনের পত্নী তাঁহাদের দেশের মেয়ে একথা উল্লেখ করেন।

"রাজা ফুল তোলা সিল্কের কাপড় ব্যবহার করেন এবং মাথায় মূল্যবান পাথর খচিত সোনার মুকুট পরেন। তাঁহার তরবারি সোনার কাজ করা। তাঁহার সিংহাসন সোনার তৈরী ও পা রাখিবার আসন রূপার। মেয়ে অনুচরেরা সোনার অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া তাঁহাকে সাদা পালক অথবা ময়ূর পালকের পাখা দ্বারা ব্যজন করে। রাজা বাহিরে যাইবার সময় সুগন্ধি কাঠের তৈরী গাড়ীতে যান। এই গাড়ী টানার কাজে হাতী ব্যবহার হয়। গাড়ীর আগে ও পিছে অনুচরেরা শঙ্খ ও ঢাক বাজাইয়া যায়।"

এই বর্ণনা হইতে বোঝা যায় যে ষষ্ঠ শতকে হিন্দু উপনিবেশ-কারীরা এখানে রাজত্ব করিত এবং এখানে বৌদ্ধ ধর্ম প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।

ইৎ-সিং (I-tsing) এর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপগুলির মধ্যে যে দ্বীপগুলি 'মূল-সর্বাস্তিবাদ-নিকায়'-র রীতিনীতি সর্বান্তঃকরণে অনুসরণ করিত, বলি তাহাদের অন্যতম। বলিদ্বীপে বৌদ্ধ ধর্মের আধিপত্যের আভাস ষষ্ঠ শতকে চৈনিক ইতিহাসেও পাওয়া যায়। কাজেই অনুমান করা যায় যে হিন্দু উপনিবেশের গোড়ার দিকেই বৌদ্ধ ধর্ম এখানে স্থান লাভ করিয়াছিল।

৬। সপ্তম খ্রীষ্টাব্দে সুবর্ণদ্বীপে হিন্দু সভ্যতা

প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে হিন্দুরা আসিবার পূর্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নব প্রস্তর যুগের (Neolithic Age) সভ্যতা বিদ্যমান ছিল। ইতিহাসে দেখা যায় যে যখনই কোন উন্নত মানের সভ্য জাতি আদিম সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়াছে তখনই তাহারা নিজেদের ধর্ম্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি ধীরে ধীরে বিস্তার করিয়াছে

এবং ক্রমশ আদিম অধিবাসীরা নিজেদের পৃথক সত্বা হারাইয়া ইহাদের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে যখন হিন্দুরা প্রথম সুবর্ণদ্বীপে আসিল তখনও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই।

বোর্নিও, মালয়, জাভা প্রভৃতি জায়গায় নব প্রস্তর (Neolithic) যুগের সভ্যতার অনেক নিদর্শন আবিস্কৃত হইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী-কালে এই সকল জায়গায় যে সব সংস্কৃত লেখ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে ভারতীয় ভাষা, ধর্ম্ম, সাহিত্য, শিল্প, রাজনৈতিক ও সামাজিক নিয়ম সমস্তই এখানে প্রচলিত হইয়াছিল।

বোর্ণিওতে প্রাপ্ত মূলবর্ম্মনের লেখ ও পশ্চিম জাভায় প্রাপ্ত আর কয়েকটি লেখ হইতে সামাজিক আচার ব্যবহারে ভারতীয় প্রভাব কি রকম বিস্তার লাভ করিয়াছিল তাহা জানা যায়। হিন্দুদেব-দেবীর মুর্তি পরিচিত ছিল। বোর্ণিওতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, গনেশ, নন্দী, স্কন্দ ও মহাকালের মুর্তি পাওয়া গিয়াছে। জাভার অন্তর্গত টুক-মাস (Tuk Mas) নামে জায়গায় পাওয়া বিষ্ণুর শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও শিবের ত্রিশূল হইতে বোঝা যায় যে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের মতবাদই এখানে প্রচলিত ছিল। ইহা ছাড়া লেখগুলিতে গঙ্গানদীর মাহাত্ম্যেরও উল্লেখ আছে।

ভারতীয় পদ্ধতিতে মাস ও সেই মাসের নক্ষত্রপুঞ্জের গণনা সবই এখানে প্রচলিত হইয়াছিল। এক জায়গা হইতে অন্য জায়গার দূরত্ব গণনার পদ্ধতিও ভারতীয় প্রথার অনুকরণে হইত। গোমতী, চন্দ্রভাগা প্রভৃতি ভারতীয় নদীর নামও এখানে প্রচলিত ছিল।

যে সব মুর্তি ও সংস্কৃত লেখ এখানে পাওয়া যায় তাহা হইতে জানা যায় যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মও এখানে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সংস্কৃত লেখগুলি হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা এখানে খুব ভালভাবেই হইয়াছিল। প্রায় সবগুলি লেখ সুন্দর ও নির্ভুল সংস্কৃতে রচনা। ভারতীয় লিপি সর্বত্র প্রচলিত হইয়াছিল, আর এখানকার মূর্তিগুলি দেখিলে

বোঝা যায় যে ভারতীয় শিল্প পদ্ধতি বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণ হইতেও তখন এই সব জায়গার উপর হিন্দু সভ্যতার প্রভাব কতখানি ছিল তাহা জানা যায়। ফা-হিয়ান যবদ্বীপে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বলিয়াছেন যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচলন বেশী ছিল না। যে দুই শত যাত্রীর সাথে তিনি সমুদ্রপথে যাত্রা করিয়াছিলেন তাহারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ছিল। তখনও বাণিজ্য ও ব্যবসার প্রতি ভারতীয়দের বেশী লক্ষ্য থাকায় এবং বণিক সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুগামী থাকায় সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বেশী প্রভাবশালী ছিল।

কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই জাভায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়। ৫১৯ খ্রীঃ রচিত এক খানি চীনা বইতে বলা হইয়াছে যে কাশ্মীরের রাজবংশে গুণবর্মন নামে একজন ধার্মিক যুবক ছিলেন। তাঁহার যখন ত্রিশ বছর বয়স তখন কাশ্মীরের রাজা মারা যান এবং সকলে গুণবর্মনকে রাজা হইতে অনুরোধ করে; কারণ মৃত রাজার কোন ছেলে ছিল না। কিন্তু গুণবর্মন রাজ্য গ্রহণ করিলেন না এবং সিংহল দ্বীপে চলিয়া গেলেন। সেখান থেকে তিনি জাভায় আসেন এবং সেই দেশের রাজমাতাকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করেন। ক্রমে জাভার রাজাও এই নতুন ধর্ম গ্রহণ করেন। এই সময়ে জাভা রাজ্য শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হয়। তখন রাজা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৌদ্ধ ধর্মের মত-বিরুদ্ধ হইবে কিনা জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে গুণবর্মন বলেন যে শত্রুদের শাসন করা সকলেরই কর্তব্য; তখন রাজা যুদ্ধ যাত্রা করেন ও বিজয়ী হন।

গুণবর্মনের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। চীনা ভিক্ষুরা তাহাদের সম্রাটকে গুণবর্মনকে চীন দেশে আমন্ত্রণ করার জন্য অনুরোধ করেন; সেই অনুসারে সম্রাট জাভার রাজ দরবারে ও গুণবর্মনের কাছে দূত পাঠান। ৪৩১ খ্রীঃ গুণবর্মন নন্দিন নামক এক ভারতীয় বণিকের তরীতে চীনদেশে যান। কিন্তু কয়েক মাস পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

জাভায় বৌদ্ধ ধর্ম কি ভাবে প্রচার হয় তাহা এই গল্প হইতে বোঝা যায়। খ্রীঃ পঞ্চম শতকে গুণবর্মন এই দেশে আসেন ও ধর্ম প্রচার করেন, কিন্তু ক্রমশ বৌদ্ধ ধর্ম অন্যান্য দ্বীপগুলিতেও প্রচারিত হয়। খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে ইৎ-সিং যখন ভারতে আসেন তখন তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ শিখিবার জন্য ছয় মাস শ্রীবিজয় রাজ্যে অবস্থান করিয়া ভারত অভিমুখে রওনা হন। ভারত হইতে ফিরিবার পথেও কিছুদিন তিনি এই রাজ্যে ছিলেন। চীন দেশে কিছুদিন থাকিয়া তিনি আবার শ্রীবিজয়ে ফিরিয়া আসেন। তিনি ভারতবর্ষ হইতে যে সব বৌদ্ধ পুঁথি আনিয়াছিলেন এইখানে সেইগুলি চীনা ভাষায় অনুবাদ করার সুবিধা হইবে মনে করিয়াই তিনি এখানে ফিরিয়া আসেন। শ্রীবিজয় সম্বন্ধে ইৎ-সিং বলিয়াছেন যে—"দক্ষিণ সাগরের দ্বীপগুলির বহু রাজা বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগী এবং তাঁহারা ভালভাবে এই ধর্মের চর্চা করিতে চাহেন। শ্রীবিজয়ের সুরক্ষিত সহরে এক হাজারেরও বেশী বৌদ্ধ এই কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে যে সব পুঁথি ভারতে প্রচলিত সে সমস্তই তাঁহারা অধ্যয়ন করেন এবং ধর্মের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান ভারতে যেমন পালন করা হয় এইখানেও ঠিক সেইভাবে পালন করা হয়। এই কারণে যদি কোন চীনা বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষার জন্য ভারতে যাইতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তিনি যদি ভারতে যাইবার আগে দুই তিন বছর শ্রীবিজয়ে থাকিয়া যান তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে ভারতবর্ষে গিয়া শিক্ষার খুব সুবিধা হইবে।"

এই সমস্ত বিবরণ হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দে সুবর্ণভূমিতে বৌদ্ধধর্মের বহুল প্রচার হইয়াছিল। বিভিন্ন জায়গায় ধর্ম ও সাহিত্য শিক্ষার কেন্দ্র ছিল এবং এই সব কেন্দ্রে বিদেশীরা শিক্ষালাভের আশায় আসিত। শ্রীবিজয় বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল; কিন্তু এখানকার প্রধান বিশেষত্ব এই যে শ্রীবিজয়েই প্রথম বৌদ্ধধর্মের 'মহাযান' মতের প্রচার হয় এবং কালক্রমে এই মহাযান ধর্মমত সুবর্ণদ্বীপে বিশেষ প্রভাবশালী হইয়া

ওঠে। মহাযান ধর্ম মতাবলম্বী অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু ভারতবর্ষ হইতে শ্রীবিজয়ে আসেন ও এই মতবাদ প্রচারে সাহায্য করেন। সপ্তম শতাব্দে কাঞ্চীদেশের অধিবাসী নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ধর্মপাল শ্রীবিজয়ে আসেন। অষ্টম শতাব্দের প্রথম ভাগে বজ্রবোধি নামে একজন দক্ষিণ দেশীয় বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধু তাঁহার শিষ্য অমোঘ-বজ্রকে লইয়া সিংহল হইতে চীনে যাওয়ার পথে পাঁচ মাস কাল শ্রীবিজয়ে অবস্থান করেন। তিনি চীনে তান্ত্রিক মতবাদ প্রচার করেন।

চৈনিক বিবরণ এবং গুণবর্মন, বজ্রবোধি, ধর্মপাল প্রভৃতির কথা হইতে বেশ বোঝা যায় যে ভারত ও সুবর্ণভূমির মধ্যে যোগাযোগ ছিল এবং এই দুই দেশের মধ্যে নিয়মিত যাতায়াত চলিত। পূর্বোক্ত লাং--গা-সু (Lang-ga-su) রাজ্যের গল্প হইতে বোঝা যায় যে এই দুই দেশের মধ্যে সামাজিক সম্বন্ধও ছিল। কারণ ঐ রাজ্যের রাজা ভাইকে নিজের রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিলে ঐ ভাই ভারতবর্ষে গিয়া সেইখানকার রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। এই সমস্ত ঘটনাই ভারত ও তাহার উপনিবেশের মধ্যে যে নিকট সম্বন্ধ ছিল তাহার পরিচয় দেয়।

ধর্মমত ছাড়া সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও হিন্দু সভ্যতার প্রভাব সুস্পষ্ট ভাবে পাওয়া যায়। তান্-তান্ (Tan-Tan) রাজ্য সম্বন্ধে চীনা বিবরণ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তান্-তান্ রাজ্যের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা যায় না তবে এই রাজ্য হইতে ৫৩০, ৫৩৫ ও ৬৬৬ খ্রীঃ চীন দেশে দূত প্রেরণ করা হয়। চৈনিক বিবরণে লেখা হইয়াছে—

“এই রাজ্যের রাজবংশের নাম ক্ষত্রিয় ও রজার নাম শিলিংকিয় (শৃঙ্গ)। রাজা নিজে প্রত্যহ রাজকার্য পরিদর্শন করেন এবং তাঁহাকে আটজন মন্ত্রী এই কার্যে সহায়তা করেন। মন্ত্রীরা সকলেই জাতিতে ব্রাহ্মণ। সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা রাজার গাত্র মার্জনা করা হয়। রাজার মাথায় উচ্চ শিরস্ত্রাণ এবং গলায় বহু মূল্যবান রত্নের মালা থাকে।

তিনি মসলিনের কাপড় ও চামড়ার জুতা ব্যবহার করেন। কাছাকাছি কোথাও যাইতে হইলে রাজা শকটে যান, কিন্তু দূরে কোথাও যাইতে হইলে হাতীতে যান। যুদ্ধের সময় এই দেশের লোকেরা শঙ্খ ও ঢাক বাজায়।"

কা-লা (Ka-la) রাজ্যের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যে চীনা বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে বলা হইয়াছে যে, "বিবাহের সময় যৌতুক হিসাবে সুপারি ভিন্ন অন্য কিছু দেওয়া হয় না। কখনও কখনও দুই তিন শ' ঝুড়ি সুপারি দেয়। বিবাহের পর স্ত্রী স্বামীর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে তাহারা এক ধরণের বীণা, বাঁশী, তামার করতাল, ও লোহার ঢাক ব্যবহার করে। তাহাদের মৃতদেহ পোড়াইয়া ফেলা হয় এবং ভস্মাবশেষ সোনার পাত্রে ভরিয়া সমুদ্রে বিসর্জন দেওয়া হয়।"

ভারতীয় ঔপনিবেশকেরা তাহাদের নিজেদের আচার ব্যবহার রীতি-নীতি সমস্তই সুদূর প্রাচ্যেও প্রচলিত করিয়াছিল। এইজন্য এখনও এইসব জায়গায় ধর্ম, ভাস্কর্য, এবং শিল্প প্রভৃতিতে ভারতীয় প্রভাবের চিহ্ন বর্তমান। অথচ এখানে যে এক সময়ে ভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা এখন কেবল ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে।

সাধারণতঃ লোকের এই বিশ্বাস যে বৌদ্ধ ধর্ম যেমন ভারতের বাহিরে অনেক জায়গায় প্রচারিত হইয়াছিল, হিন্দু ধর্মের সে রকম প্রচার হয় নাই ; ইহা কেবল ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু সুবর্ণভূমির ধর্ম আলোচনা করিলে এই ভুল বিশ্বাস থাকিবে না। কারণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রায় সমস্ত হিন্দু উপনিবেশগুলিতে গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রচলিত ছিল।

ভারতে যখন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রচারিত হয় সেই সময় প্রাচীন বৈদিক ধর্ম হইতে উদ্ভূত এক নতুন হিন্দু ধর্মেরও প্রচার হইতেছিল। এইধর্মের বিশেষত্ব এই যে বৈদিক যুগে যেমন অনেক দেবতার পূজা হইত

এই নূতন ধর্মে তাহার পরিবর্তে প্রধানতঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা শিব এই দেবতাদের মধ্যে একজনের উপসনা হইত। এই তিন দেবতা হইতে তিন সম্প্রদায়ের উৎপত্তি এবং এই নূতন ধর্ম হইতে নূতন সাহিত্য ও পুরাণের সৃষ্টি। পুরাণে বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন পূজাপদ্ধতি ও ক্রিয়াকর্মের বর্ণনা করা হইয়াছে।

কালক্রমে এই নতুন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিশেষ প্রভাবশালী হইয়া ওঠে ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রচলন ভারতবর্ষে আর বিশেষ দেখা যায় না। ক্রমশ বৌদ্ধ ধর্ম্ম এই নতুন হিন্দু মতবাদের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। খ্রীষ্টীয় অব্দের প্রথম হাজার বছরের ভারতবর্ষের ধর্ম বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় কিরূপে নতুন প্রচলিত পৌরাণিক ধর্মমত ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং যে বৌদ্ধ ধর্ম একসময়ে শ্রেষ্ঠ ধর্ম-সম্প্রদায় ছিল তাহা প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

সুবর্ণভূমির হিন্দু ঔপনিবেশকদের ধর্মও যে এইরূপ একটি ক্রম-বিবর্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছিল এই স্থানে প্রাপ্ত লেখগুলি, ধর্ম-সাহিত্য ও নানারূপ দেবদেবীর মূর্তি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয় যায়।

সুবর্ণভূমিতে যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রচলিত ছিল তাহা পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম। এখানে যে সমস্ত লেখ ও ধর্মপুস্তক পাওয়া যায় তাহা হইতে দেখা যায় যে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রতিটি ছোটখাট বিষয় পর্যন্ত ভারতে যেমন এখানেও সেইভাবে পালন করা হইত। বৈষ্ণব ও শৈব এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে শৈব সম্প্রদায় সুবর্ণভূমিতে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় তেমন বিশেষ স্থান অধিকার করে নাই। কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন রেষারেষি ছিল না; বরং পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও সৌহার্দ্যের ভাব পোষণ করিত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য

খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দে সুবর্ণদ্বীপের অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য লইয়া একটি বড় সাম্রাজ্য গড়িয়া ওঠে। এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পর অন্তত পক্ষে প্রথম চারিশত বছর শৈলেন্দ্র বংশের রাজারা এই সাম্রাজ্য শাসন করিতেন। এই জন্য এই সাম্রাজ্য শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য নামে পরিচিত। জাভা ও মালয় উপদ্বীপে যে সমস্ত লেখগুলি পাওয়া যায় তাহা হইতে জানা যায় যে শৈলন্দ্ররা অষ্টম শতাব্দে মালয়ে রাজ্য বিস্তার করেন এবং ৭৭৫ খ্রীঃ বা কিছু পরে লিগোর রাজ্য অধিকার করেন। এর আগে লিগোর শ্রীবিজয় রাজের অধীনে ছিল। ৭৮২ খ্রীঃ পূর্ব্বেই জাভা শৈলেন্দ্র রাজ্যের অধীনে আসে।

অষ্টম খ্রীঃ শতাব্দের শেষ ভাগে সুমাত্রা, জাভা ও মালয় উপদ্বীপের প্রায় সমস্ত হিন্দু রাজ্যগুলি এই নতুন সাম্রাজ্যের অধীনস্থ হয়। যে কয়টি রাজ্য তখন পর্যন্ত নতুন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয় নাই সেইগুলি ইহার প্রভাব অনুভব করিতেছিল। শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য নানাদিক দিয়া এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছিল। সমস্ত সুবর্ণদ্বীপ না হইলেও, ইহার একটি বৃহৎ অংশ লইয়া এক রাজার অধীনে একটি অখণ্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইহাই প্রথম দৃষ্টান্ত। এই রাজ্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে ক্রমশঃ এই রাজ্য ক্ষমতা ও গৌরবের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। রাজ্য বিস্তার করা ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও শৈলেন্দ্রদের অবদান কম নয়। তাহাদের সময় এক নূতন সংস্কৃতি গড়িয়া উঠে। এই সময়ে মহাযান ধর্ম্মমতের বিশেষ প্রচার হয় এবং শৈলেন্দ্রদের পৃষ্ঠপোষকতায় জাভায় 'চণ্ডী কলসন', বরবুদুর প্রভৃতি মন্দির ও স্তূপ নির্মিত হয়। এই সময়ে প্রাক-নাগরী নামে

পরিচিত এক নতুন লিপির প্রচলন হয়। খুব সম্ভবত এই সময় হইতে বিদেশীদের কাছে মালয়াশিয়া কলিঙ্গ নামে পরিচিত হয়।

শৈলেন্দ্রদের রাজ্য প্রথমে কোথায় ছিল সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এক সময়ে এই বিশ্বাস ছিল যে শৈলেন্দ্ররা শ্রীবিজয়ের রাজা ছিলেন এবং ক্রমশঃ জাভা ও মালয়ে রাজ্য বিস্তার করেন। কিন্তু এমন অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় যাহা হইতে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে শৈলেন্দ্ররা জাভা অথবা মালয় উপদ্বীপে কোন রাজ্যের রাজা ছিলেন এবং সেখান হইতে অন্যান্য রাজ্য অধিকার করিয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তবে কোন সঠিক প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত এই সমস্যার সমাধান হইবে না।

শৈলেন্দ্র বংশের আদি রাজ্য যেখানেই থাকুক না কেন তাঁহারা যে অষ্টম শতাব্দে একটি ক্ষমতাশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। বিভিন্ন আরব লেখকরা শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের ধন সম্পদের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। আরবদের কাছে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য জাবাজ বা জাবাগ নামে পরিচিত ছিল। কোন কোন লেখক ইহাকে 'মহারাজের সাম্রাজ্য' এই নামেও উল্লেখ করিয়াছেন। এই সব বিবরণ হইতে জানা যায় যে সমগ্র সুবর্ণদ্বীপ এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং কিছুকালের জন্য চম্পা ও কম্বোজ— সুবর্ণভূমির এই দুইটি ক্ষমতাশালী রাজ্যও এই সাম্রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল।

অষ্টম শতাব্দের শেষ ভাগে জাভার নৌবহর একাধিকবার সুদূর চম্পারাজ্য আক্রমণ করে। সঠিক কোন প্রমাণ পাওয়া না গেলেও কতগুলি কারণে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বারবার জাভার নৌবহরের আক্রমণের ফলে চম্পারাজ্য পরাজিত হয়। কিন্তু এই বিজয় বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই, কারণ অল্প দিনের মধ্যেই চম্পায় আর একটি নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। চম্পায় জাভার অধিকার বেশী দিন স্থায়ী না হইলেও এই ঘটনা হইতে জাভার ক্ষমতার আভাস পাওয়া যায়। এই নৌবহর শৈলেন্দ্রদের দ্বারা প্রেরিত হইয়াছিল

বলিয়া মনে করা হয়, কারণ এই সময়ে জাভা শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিম্বা একজন শৈলেন্দ্রবংশের রাজা ইহার শাসক ছিলেন।

প্রবল নৌশক্তির অধিকারী শৈলেন্দ্ররা এই সময়ে ইন্দোনেশিয়ার একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আরব বণিক সুলেমান শৈলেন্দ্রদের কাম্বোজ বিজয় সম্বন্ধে উপন্যাসের মত একটি কাহিনী বর্ণনা করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন যে, "এই ঘটনায় শৈলেন্দ্ররা ভারতবর্ষ ও চীনের রাজাদের কাছে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।"

অষ্টম শতাব্দীতে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য খ্যাতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে কিন্তু পরবর্তী শতাব্দীতে তাহাদের পতনের সূচনা দেখা দেয়। নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কাম্বোজের রাজা দ্বিতীয় জয়বর্মন (৮০২-৮৫০ খ্রীঃ) শৈলেন্দ্রদের অধীনতা অস্বীকার করেন, এবং ইহার পরে আর কখনও শৈলেন্দ্ররা কাম্বোজ রাজ্যে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না! প্রায় এই একই সময়ে শৈলেন্দ্রদের জাভা রাজ্যের উপর আধিপত্যেরও সমাপ্তি হয়। ৮৭৯ খ্রীঃ-র কিছু আগে কি কারণে যে জাভা রাজ্য শৈলেন্দ্রদের হস্তচ্যুত হয় সেই সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না।

শৈলেন্দ্র সম্রাটদের সহিত বাংলা দেশের পাল সম্রাটদের যোগাযোগ ছিল। শৈলেন্দ্র সম্রাটরা বৌদ্ধ ধর্মের মহাযান মতের অনুগামী ছিলেন। ৭৮২ খ্রীঃ কুমারঘোষ নামে বাংলাদেশের এক অধিবাসী এই সম্রাটদের গুরু ছিলেন। বিহারের নালন্দায় প্রাপ্ত নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রচিত একটি তাম্রলেখতে বলা হইয়াছে যে সমরাগ্রবীরের পুত্র, সুবর্ণদ্বীপের রাজা বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি বিহার নির্মান করেন এব তাঁহার অনুরোধে পালসম্রাট দেবপাল এই বিহারের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য পাঁচটি গ্রাম দান করেন।

জাভা ও কাম্বোজ রাজ্য হারাইলেও শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য ইন্দোনেশিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী সাম্রাজ্য বলিয়াই বহির্জগতে পরিচিত ছিল।

নালন্দা তাম্রশাসনে শৈলেন্দ্রদের সুবর্ণদ্বীপের রাজা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরব বণিকরাও শৈলেন্দ্রদের কথা উল্লেখ করিয়াছে। আগেই বলা হইয়াছে যে আরবদের কাছে তাহাদের রাজ্য জাবাগ বা জাবাজ নামে পরিচিত ছিল। ইবন খর্দ্দৎবে (Ibn Khordadzbch, ৮৪৪-৮৪৮) লিখিয়াছেন যে জাবাগের রাজার নাম মহারাজা। রাজ্যের শুল্ক হিসাবে তিনি দৈনিক প্রায় দুই শত মন সোনা পান। এই সোনা দিয়া একটি ইট তৈরী করিয়া তিনি জলের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া বলেন যে এই আমার সঞ্চিত সম্পদ। এই শুল্কের এক অংশ, আনুমানিক পঞ্চাশ মন সোনা, দৈনিক মোরগের লড়াই হইতে আয় হয়। আইন অনুযায়ী বিজয়ী মোরগের একটি পা রাজার প্রাপ্য, এইজন্য মোরগের অধিকারী পায়ের মূল্য রাজাকে সোনায় দিয়া যায়।

জাবাগ সম্বন্ধে আবু জায়েদ হোসেন একটি বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। ৯১৬ খ্রীঃ এই বিবরণ লিখিত হয়। আসলে এটি ৮৫১ খ্রীঃ সুলেমান রচিত জাবাজের বিবরণ—ইহার সহিত আবু জায়েদ হোসেন নিজস্ব মন্তব্য যোগ করিয়াছেন মাত্র। তিনি সাম্রাজ্য ও রাজধানী উভয়ের নামই জাবাগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার বক্তব্যর সারাংশ ঃ

"সমুদ্রপথে জাবাগ হইতে চীনে যাইতে এক মাস সময় লাগে, তবে অনুকূল হাওয়া থাকিলে ইহার চেয়ে কম সময়েও যাওয়া যায়।

"এই রাজ্যের রাজার উপাধি মহারাজা। রাজ্যের সীমানা ৯০০ (বর্গক্ষেত্র) পর্সং। এই রাজ্যের হাজার পর্সং এর মধ্যে যে দ্বীপগুলি অবস্থিত সেগুলি সকলই এই রাজ্যের অধীন। প্রায় ৪০০ (বর্গক্ষেত্র) পর্সং লইয়া গঠিত শ্রীবুজ (শ্রীবিজয়) ও ৮০০ (বর্গক্ষেত্র) পর্সং লইয়া গঠিত রামি রাজ্য দুইটি জাবাগের অধীনস্থ। আরব হইতে চীনে যাইবার মধ্যপথে অবস্থিত কল শহরটি মহারাজার রাজ্যের সীমানার মধ্যে অবস্থিত। কলর সীমানা প্রায় ৮০

(বর্গক্ষেত্র) পর্সং। কল সহরটি একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে নানারূপ জিনিষের ব্যবসা আছে; ইহাদের মধ্যে কর্পূর, চন্দন-কাঠ, মেহগিনি কাঠ, হাতির দাঁত, টিন, নানারকম মশলা ইত্যাদি প্রধান। এই বন্দর হইতে ওমানে (Oman) নিয়মিত সমুদ্র পথে বাণিজ্য চলাচল হয়।

"মহারাজা এই সমস্ত দ্বীপগুলি শাসন করেন। যে দ্বীপে মহারাজা নিজে বাস করেন সে দ্বীপে খুব ঘন লোক বসতি।

"জাবাগে একটি বিচিত্র নিয়ম আছে। মহারাজের প্রাসাদ একটি অগভীর ঝিল দ্বারা সমুদ্রের সহিত যুক্ত। প্রতিদিন সকালে রাজা সোনার তৈরী একটি ইট ঝিলে নিক্ষেপ করেন। জোয়ারের সময় ইট-গুলি জলে ঢাকা থাকে কিন্তু ভাঁটার সময় দেখা যায়! রাজার মৃত্যুর পর এই ইটগুলি উঠাইয়া গণিয়া ওজন করা হয় ও তাহার হিসাব লিখিয়া রাখা হয়। পরে এই সোনা রাজার পরিবারবর্গ, সেনাপতি ও দাসদাসীদের মধ্যে মর্যাদানুসারে বিতরণ করা হয় ও যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা রাজ্যের গরীব লোকদের দেওয়া হয়।"

মাসুদি (Masudi, ৯৪৩ খ্রীঃ) লিখিয়াছেন—

"চম্পা উপসাগরে মহারাজের সাম্রাজ্য অবস্থিত। সাম্রাজ্যটি এত বড় যে তাহার সীমানা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য এবং তাঁহার সৈন্যবাহিনীও বিশাল। যতগুলি দ্বীপ তাঁহার রাজ্যের অধীন তাহার সব গুলি ঘুরিতে গেলে অতি দ্রুতগামী জাহাজেরও দুই বৎসর সময় লাগিবে। বহু রকমের মশলা ও গন্ধদ্রব্য এই রাজ্যে উৎপন্ন হয় এবং পৃথিবীতে আর কোন রাজার কৃষিজাত এত ধনসম্পদ নাই।"

আলবেরুণী (১০৩০ খ্রীঃ) বলিয়াছেন—"এই সমুদ্রের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জের দূরত্ব ভারত হইতে যতখানি চীন হইতে তাহার চেয়ে কম। এই দ্বীপপুঞ্জের নাম জাবাজ, তবে হিন্দু নাম সুবর্ণদ্বীপ অর্থাৎ সোনার ভূমি। জাবাজের নাম সোনার ভূমি হইবার কারণ এখানে প্রচুর পরিমানে সোনা পাওয়া যায়। হাতে করিয়া

সামান্য একটু মাটি নিয়া ধুইলেই কিছুটা পরিমানে সোনা পাওয়া যাইবে।"

উল্লিখিত আরব লেখকদের বিবরণ হইতে বোঝা যায় যে মালয় দ্বীপপুঞ্জ ও মালয় উপদ্বীপের কিছু অংশ লইয়া একটী ক্ষমতাশালী সাম্রাজ্য নবম খ্রীঃ-র শেষ ভাগ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। কাজেই একথা অনুমান করিয়া লওয়া স্বাভাবিক যে জাভা ও কাম্বোজ রাজ্য হারাইয়াও শৈলেন্দ্ররা যথেষ্ট প্রতিপত্তির সহিত আরও এক শতাব্দী রাজত্ব করিয়াছিল এবং শ্রীবিজয় তাহাদের রাজ্যের একটি অংশ বলিয়া পরিগণিত হইত।

চীনা ইতিহাসে উল্লিখিত সান-ফোৎ-সি (San-fo-tsi) রাজ্য যে শৈলেন্দ্র সামাজ্য সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। এই ইতিহাস হইতে জানা যায় যে দশম খ্রীষ্টাব্দে অনেকবার শৈলেন্দ্র সামাজ্য হইতে চীনের দরবারে দূত প্রেরণ করা হয়।

চীনাদের বিস্তৃত বিবরণ হইতে জানা যায় যে দশম খ্রীঃ রাজনীতি ও বাণিজ্য এই উভয় ক্ষেত্রেই শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

২। শৈলেন্দ্রদের সহিত দক্ষিণ ভারতের চোল রাজ্যের সংগ্রাম

শৈলেন্দ্রদের সহিত দক্ষিণ ভারতের চোল সম্রাটদের যুদ্ধ একাদশ খ্রীঃ-র একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

অতি পুরাতন কাল হইতে যে তিনটি রাজ্য দক্ষিণ ভারতে স্থাপিত হইয়াছিল চোল রাজ্য তাহাদের অন্যতম। করোমণ্ডল উপকূলে অবস্থিত এই রাজ্যের উত্তরে পেনার নদী, দক্ষিণে ভেলারু নদী ও পশ্চিমে কুর্গ রাজ্য অবস্থিত ছিল। দক্ষিণ ভারতে পল্লব রাজাদের সময় চোল রাজ্য বিশেষ প্রভাবশালী ছিল না কিন্তু নবম খ্রীষ্টাব্দে চোল রাজা প্রথম পরান্তক যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন

সেই সময় হইতে চোল রাজারা রাজ্য বিস্তার আরম্ভ করেন। বিখ্যাত চোল সম্রাট রাজরাজ (৯৮৫-১০১৪ খ্রীঃ) বহু যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া দক্ষিণ ভারতের একচ্ছত্র সম্রাটের আসন অধিকার করেন। তাঁহার পুত্র রাজেন্দ্র চোল (১০১৪-১০৪৪ খ্রীঃ) উত্তরে বাংলাদেশ পর্যন্ত অভিযান করেন এবং এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া চোল রাজ্যের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি করেন।

চোল রাজ্যের নৌশক্তিও প্রবল ছিল এবং এই কারণে তাহাদের সহিত ইন্দোনেশিয়ার সংযোগ স্থাপিত হয়। প্রথম দিকে এই দুই রাজ্যের মধ্যে মিত্রতার সম্পর্ক ছিল বলিয়া মনে হয়, কারণ একটি চোল লেখ হইতে জানা যায় যে সম্রাট রাজরাজের রাজত্ব কাল একুশ বছর পূর্ণ হইবার কিছু আগে শৈলেন্দ্র রাজা চূড়ামণিবর্মন নাগপট্টনে (আধুনিক নাগপট্টম) একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করিতে আরম্ভ করেন এবং এই বিহারের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য চোল রাজা একটি গ্রাম দান করেন। বিহারটি নির্মাণ শেষ হইবার আগেই চূড়ামণিবর্মন মারা যান ও তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী শ্রীমারবিজয়োত্তুঙ্গবর্মন এই বিহারের নির্মাণ কার্য শেষ করেন।

এই লেখটি পূর্বোক্ত নালন্দায় প্রাপ্ত দেবপালের সময়কার তাম্রলেখটির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। দুইটিতেই দেখা যায় যে শৈলেন্দ্র রাজারা ভারতে বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করিয়াছেন এবং ভারতীয় রাজা বিহারের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য গ্রাম দান করিয়াছেন। কিন্তু এই দুইটি লেখতে যে সকল শৈলেন্দ্র রাজার নাম আছে সুবর্ণদ্বীপে প্রাপ্ত কোন লেখতে তাহাদের কোন উল্লেখ নাই।

চোল লেখর তারিখ হইতে জানা যায় যে ১০০৫ খ্রীঃ চূড়ামণিবর্মন শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের রাজা ছিলেন, কারণ চোল রাজা রাজরাজের একুশ বছর রাজত্বকাল ১০০৫ খ্রীঃ পূর্ণ হয়, এবং এই সময়ের কিছু পরেই শ্রীমারবিজয়োত্তুঙ্গবর্মন সিংহাসন আরোহন করেন। একথা ধরিয়া লওয়া যায় যে একাদশ খ্রীঃ-র প্রথম দিকে দুই রাজ্যের মধ্যে বেশ

সদ্ভাব ছিল এবং ব্যবসা বানিজ্য চলিত।

কিন্তু চোল রাজা ও শৈলেন্দ্রদের মধ্যে সদ্ভাব বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। অল্পদিনের মধ্যেই দুই রাজ্যের মধ্যে শত্রুতা আরম্ভ হয়।

একখানি চোল লেখ হইতে জানা যায় যে, কম্বুজের রাজা নিজের রাজ্য রক্ষার্থ চোল রাজার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য তাঁহাকে নিজের রথ উপহার দেন। হয়ত কম্বুজের (কাম্বোডিয়া) রাজা শৈলেন্দ্রদের ভয়ে রাজেন্দ্র চোলের সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন এবং এই কারণেই চোলরাজ শৈলেন্দ্র রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। তবে ইহাও অসম্ভব নহে যে শৈলেন্দ্র রাজ্য জয় করিয়া চোলরাজ কম্বুজ রাজ্য জয় করার চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন আত্মরক্ষার্থে কম্বুজরাজ চোলরাজকে খুসী করিবার জন্য উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন। কারণ যাহাই হউক এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, শৈলেন্দ্র ও চোল-রাজাদের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং রাজেন্দ্র চোল শৈলেন্দ্রদের বিরুদ্ধে একটি নৌবাহিনী প্রেরণ করেন। সেই সময়কার চোলরাজগণের অনেক খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে যুদ্ধে এই নৌবাহিনী বিশেষ সাফল্য লাভ করে এবং শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের অনেক অংশ চোল রাজা অধিকার করেন।

এই সমস্ত লিপি হইতে বোঝা যায় যে, এই সময়ে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল কটাহ বা কডাঢ় রাজ্য (মালয় উপদ্বীপের কেড্ডা) এবং শ্রীবিজয়, সুমাত্রা, এবং মালয় উপদ্বীপের আশেপাশের দ্বীপগুলির অনেক ছোট ছোট রাজ্য তাহাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। রাজেন্দ্র চোল শৈলেন্দ্র রাজাকে পরাজিত করিয়া ছোট ছোট দশ এগারটি রাজ্য অধিকার করেন এবং সর্বশেষে কডাঢ় জয় করিয়া তাঁহার অভিযান সমাপ্ত করেন।

রাজেন্দ্র চোল সুমাত্রার পূর্ব উপকূলভাগ এবং মালয় উপদ্বীপের মধ্য ও দক্ষিণভাগ জয় করেন। এই পরাজিত অংশে শৈলেন্দ্রদের

সময়ের দুইটি প্রধান শহর কটাহ ও শ্রীবিজয় অবস্থিত ছিল। রাজেন্দ্র চোলের এই বিজয় কাহিনী যে কেবলমাত্র সভাকবিদের কল্পনাবিলাস নয় একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যায়। চোল রাজ্যের লিপি হইতে সমস্ত পরাজিত রাজ্যের নাম পাওয়া যায়। আবার পরবর্তী কালের চীনা ঐতিহাসিকরা এই সকল রাজ্যের অনেকগুলিকেই শৈলেন্দ্র রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আনুমানিক ১০২৫ খ্রীঃ চোলদের হাতে শৈলেন্দ্রদের এই গুরুতর পরাজয় ঘটে। কিন্তু এই সময়ের বেশ কিছুদিন আগে হইতেই এই দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, কারণ ১০১৭-১৮ খ্রীঃ বা ইহার কিছু আগে চোল নৌবাহিনী কটাহর বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

যদিও শৈলেন্দ্র ও চোল সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া ওঠার বা শৈলেন্দ্রদের শোচনীয় পরাজয়ের কোন সঠিক কারণ নির্ণয় করা সম্ভব নহে, তথাপি সেই সময়কার কতকগুলি ঘটনা যে ইহার জন্য দায়ী তাহা অনুমান করা যায়। চোলদের লিপি হইতে জানা যায় যে সুদূর প্রাচ্যে অভিযান করিবার আগেই চোল সম্রাট কলিঙ্গদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গানদী পর্যন্ত সমস্ত পূর্ব উপকূল ভাগ জয় করিয়াছিলেন। কলিঙ্গ ও বঙ্গদেশের নাবিকদের কাছে প্রাচ্যের দ্বীপগুলি ও সমুদ্রপথ সুপরিচিত ছিল এবং এই দুই দেশ জয় করাতে তাহাদের নৌবাহিনীও চোল সম্রাটদের অধীনে আসিল। পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়ার বাণিজ্য পথের মধ্যস্থলে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য অবস্থিত ছিল। ভৌগোলিক অবস্থানের সহায়তায় তাহারা পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়ার বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে পরিচালনা করিত। এই সাম্রাজ্য জয় করিতে পারিলে বাণিজ্যক্ষেত্রেও প্রাধান্য লাভ করা সম্ভব একথা রাজেন্দ্র চোল জানিতেন। কাজেই যখন সেই সময়কার দুইটি শ্রেষ্ঠ নৌবাহিনী তাঁহার অধীনে আসিল তখন তিনি প্রাচ্যের হিন্দু সাম্রাজ্য জয় করিতে অভিলাষী হইলেন। এই দুই নৌবাহিনীর সাহায্য

না পাইলে এই বিজয় অভিযান তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ।

রাজেন্দ্র চোলের মৃত্যুর পর শৈলেন্দ্ররা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন; তবে চোলরাজা বীররাজেন্দ্র (১০৬৩-৭০ খ্রীঃ) দাবী করেন যে তিনি কডাঢ় রাজ্য জয় করেন এবং এই দেশের রাজা তাঁহাকে কর দিতে স্বীকার করায় তিনি তাহাকে রাজ্য ফিরাইয়া দেন। চোল রাজারা প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল পর্য্যন্ত শৈলেন্দ্র রাজ্যের উপর প্রভুত্ব করিয়াছিলেন, অবশেষে ১০৯০ খ্রীঃ-র কিছু পূর্বে দুইদেশের মধ্যে সন্ধি হয়। কারণ ১০৯০ খ্রীঃ-র চোল লিপি হইতে জানা যায় যে, সেই সময় কডাঢ় দেশের রাজার নিকট হইতে রাজবিদ্যাধর সামন্ত ও অভিমানোত্তুঙ্গ সামন্ত নামে দুইজন দূত চোল রাজা কুলোত্তুঙ্গদেবের সভায় আসেন এবং তাহাদের অনুরোধে চোল রাজা শৈলেন্দ্র-চূড়ামণিবর্মবিহার নামে বৌদ্ধ বিহারটির ব্যয় নির্বাহের জন্য যে গ্রামটি দান করা হইয়াছিল তাহার খাজনা মাপ করেন (চূড়ামণিবর্মন কর্তৃক স্থাপিত এই বিহারটির কথা পুর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে)।

৩। শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের পতন

প্রায় একশত বৎসর যুদ্ধ চলিবার পর শৈলেন্দ্র ও চোলদের মধ্যে বিবাদের মীমাংসা হইল।

মালয় ও সুমাত্রায় রাজ্য বিস্তার করিবার জন্য এক শতাব্দীকাল চেষ্টা করিবার পর চোলেরা এই পরিকল্পনা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এই ব্যাপারে শৈলেন্দ্ররা যদিও যথেষ্ট পরিমাণে অপদস্থ হইয়াছিলেন তবুও ধীরে ধীরে আবার পূর্বের ক্ষমতা ফিরিয়া পাইলেন।

কিন্তু দ্বাদশ খ্রীঃ মাঝামাঝি হইতে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য সম্বন্ধে আর বিশেষ কোন খবর পাওয়া যায় না। এবথা মনে করা ভুল হইবে যে এই সময়েই শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে। যদিও তাহাদের

সাম্রাজ্যের কোন প্রামাণিক খবর পাওয়া যায় না তবু তাঁহারা যে আরও দু'তিনশ বছর রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহার কিছু কিছু নির্দেশ পাওয়া যায়।

চীনা ও আরব বিবরণী হইতে সান-ফোৎ সি (San-fo-tsi) ও জাবাগের (শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের চীনা ও আরব নাম) কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া যায়।

দ্বাদশ খ্রীঃ-র একটি চীনা বিবরণী হইতে জানা যায় যে মলাক্কা প্রণালী সান-ফোৎ-সি রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং এইজন্য এই দেশের রাজা চীন ও পশ্চিম দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য পরিচালনা করিতে সক্ষম ছিলেন। সান-ফোৎ-সি রাজ্যটি একটি প্রধান বানিজ্য কেন্দ্র ছিল এবং সুমাত্রা ও মালয় উপদ্বীপের চৌদ্দটি রাজ্য ইহার অধীন ছিল। ১২৩০ খ্রীঃ চন্দ্রভানু এই দেশের রাজা ছিলেন। সিংহলের পুরাবৃত্ত 'চুল্লবংশ' হইতে চন্দ্রভানুর যে ইতিহাস জানা যায় তাহাও এই রাজ্যকে ক্ষমতাশালী বলিয়াই প্রমাণ করে। চুল্লবংশে চন্দ্রভানুর কথা যাহা লেখা আছে তাহার সারাংশ নিম্নরূপ।

"সিংহলের রাজা দ্বিতীয় পরাক্রমবাহুর একাদশ বৎসর রাজ্যকালে জাবক দেশের রাজা চন্দ্রভানু একদল সৈন্যসহ কক্ষলা বন্দরে অবতরণ করেন। অবতরণ কালে তাহারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ও শান্তির উদ্দেশে আসিয়াছে এই পরিচয় দিয়াছিল ; জাবকের সৈন্যরা একপ্রকার বিষাক্ত তীর ব্যবহার করিত। তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া নদীপথ অধিকার করে এবং সমস্ত সিংহল দেশ আক্রমণ করিয়া বিপর্য্যস্ত করিয়া তোলে। কিন্তু রাজ-প্রতিনিধি বীরবাহু তাহাদের কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সিংহল ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য করেন। কয়েক বছর পরে চন্দ্রভানু সিংহলে মহাতীর্থ নামক স্থানে অবতরণ করেন। এবার তাঁহার সৈন্যদলের মধ্যে পাণ্ড্য, চোল ও অন্যান্য তামিল দেশীয় সৈন্য ছিল। প্রথম দিকে কিছুটা সাফল্য লাভ করিলেও পরে বীরবাহুর পরিচালনায় সিংহলী সৈন্যরা

তাহাদের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে। চন্দ্রভানু কোন রকমে পলাইয়া যাইতে সমর্থ হন কিন্তু তাহার পরিবারবর্গ ও ধন সম্পত্তি সমস্তই বিজয়ী শত্রু সৈন্যদের হস্তগত হয়। সম্ভবতঃ ১২৩৬ ও ১২৫৬ খ্রীঃ চন্দ্রভানু দুইবার সিংহল আক্রমণ করেন।

চন্দ্রভানু যে সিংহলের মত দূরদেশ আক্রমণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহাই তাঁহার ক্ষমতার প্রমাণ। কিন্তু এই যুদ্ধযাত্রা তাঁহার অপরিণামদর্শিতার পরিচায়ক। ইহার জন্য জাবক রাজ্যের যে পরিমাণ শক্তি নিয়োজিত করিতে হইয়াছিল এবং দ্বিতীয় যুদ্ধে পরাজয় এ-সমস্তই তাঁহার নিজ রাজ্যের শক্তি দুর্বল করিয়াছিল।

১২৬৪ খ্রীঃ-র কিছু আগে চন্দ্রভানু পাণ্ড্য রাজা জটাবর্মন পাণ্ড্যর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। পাণ্ড্য রাজাও সিংহল দেশ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া দাবী করেন। আগেই বলা হইয়াছে যে দ্বিতীয়বার সিংহল আক্রমণকালে চন্দ্রভানুর সৈন্যদলের সাথে চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতি দেশের সৈন্যরা ছিল। সম্ভবতঃ চন্দ্রভানু এই দুই রাজ্যের সাথে মিলিত হইয়া সিংহলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু যেমন অনেক সময়েই দেখা যায় যে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়াতে সন্ধিরও আর মূল্য থাকে না, সেইরকম এই ক্ষেত্রেও বীরপাণ্ড্য চন্দ্রভানুর অসহায়তার সুযোগে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন নাই।

চন্দ্রভানুর মৃত্যুর পর শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের বিপর্যস্ত অবস্থার সুযোগে জাভার রাজা কৃতনগর শৈলেন্দ্র রাজ্য আক্রমণ করিলেন। সান-ফোৎ-সির অধীনস্থ মালয় উপদ্বীপের পাহাঙ্গ রাজ্যটি তিনি অধিকার করেন। তিনি ১২৭৫ খ্রীঃ মলয়ুর (জাম্বি) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং ইহাকে তাঁহার অধীনে একটি আলাদা রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠা করেন। এইরূপে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের মধ্যে জাভা নিজের প্রতিষ্ঠা দৃঢ় করিয়া তুলিল এবং পরে এখান হইতে জাভা রাজ্য ক্রমশঃ চতুর্দিকে বিস্তৃত হইল।

কিন্তু এই সময়ে হঠাৎ কৃতনগরের মৃত্যুতে ও তাঁহার রাজ্যের পতনে মলয়ুতে জাভার শাসন শিথিল হইয়া পড়িল। যদিও তখন পর্যন্ত জাভার আক্রমণে বাধা দিবার ক্ষমতা শৈলেন্দ্রদের ছিল তথাপি কৃতনগরের মৃত্যুর সুযোগে হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া পূর্বের ন্যায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইল না। এই সময় হইতে মলয়ু একটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইল এবং সান-ফোৎ-সির প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল।

জাভা রাজ্য ছাড়াও ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দে সান-ফোৎ-সি রাজ্য উত্তর দিক হইতে থাইদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। থাইরা ত্রয়োদশ খ্রীঃ শ্যাম রাজ্য অধিকার করে ও পরে মালয় উপদ্বীপের উত্তরাংশ পর্যন্ত তাহাদের অধিকারে আসে। এইরূপে উত্তরে থাই ও দক্ষিণে মলয়ু এই দুইটি নূতন ক্ষমতাশালী রাজ্যের বিরুদ্ধে সান-ফোৎ-সি রাজ্য বেশীদিন যুঝিতে পারিল না এবং অল্পদিনের মধ্যেই পূর্বের ক্ষমতা ও গৌরব হারাইয়া একটি ছোট স্থানীয় রাজ্যে পরিণত হইল। ইহার পরে এই রাজ্যের অধিকার লইয়া মলয়ু ও থাই রাজ্যের মধ্যে দ্বন্দ্বের সুরু হইল।

চৈনিক বিবরণ হইতে জানা যায় যে প্রায় আরও এক শতাব্দীকাল এইরূপ হীন অবস্থায় সান-ফোৎ-সির অস্তিত্ব বজায় ছিল এবং অবশেষে ১৩৭৭ খ্রীঃ জাভা ইহাকে পরাজিত করে।

চীনের মিং বংশের (Ming Dynasty) ইতিহাসে ১৩৯৭ খ্রীঃ সান-ফোৎ-সির অবস্থা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে ঃ—

"এই সময়ে জাভা সান-ফোৎ-সি রাজ্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে এবং ইহার নাম পরিবর্তন করিয়া কু-কং (Ku-Kang) রাখে। সান-ফোৎ-সির পতনে সমস্ত দেশে অরাজকতার সৃষ্টি হইল এবং জাভার রাজা এই অবস্থা দমন করিতে পারিলেন না। এই সময়ে ঐ স্থানের চীনা অধিবাসীরা ক্যানটনের এক ব্যক্তিকে তাহাদের প্রধানরূপে নির্বাচিত করিল।"

সম্ভবত কোন চীনা জলদস্যু সান-ফোৎ-সির কিছু অংশ দখল করিয়া নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করে। জাভা রাজ্যের দুর্বলতাই এই অবস্থার কারণ। জাভা রাজ্যের যে শক্তি ছিল তাহাতে সান-ফোৎ-সি রাজ্য জয় করা সম্ভব হইয়াছিল কিন্তু নতুন একটি দৃঢ় ক্ষমতাশালী রাজ্য স্থাপন করিবার ক্ষমতা ছিল না। আবার কেহ কেহ এই মত পোষণ করেন যে সান-ফোৎ-সি রাজ্যের অরাজকতার সৃষ্টি জাভা রাজ্যের ইচ্ছাকৃত। কারণ এক সময়ে রাজনীতি ও অর্থনীতি এই উভয় ক্ষেত্রেই শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, ভবিষ্যতে এই স্থানে আবার একটি ঐ রকম ক্ষমতাশালী সাম্রাজ্য গঠন যাহাতে সম্ভব না হয় সেই জন্যই জাভা সান-ফোৎ-সি রাজ্যটি এইভাবে বিনাশ করিল। শেষ পর্যন্ত এই স্থান চীনা দস্যু ও তস্করদের আস্তানায় পরিণত হইল।

পঞ্চদশ খ্রীঃ হইতে সান-ফোৎ-সি রাজ্যের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না কাড়রামে (কেড্ডা) একটি ছোট রাজ্য ছিল এবং ঐ স্থানের বিবরণ হইতে জানা যানা যায় যে, সাতজন হিন্দু রাজা এখানে রাজত্ব করেন ও ১৪৭৪ খ্রীঃ ইহার সর্বশেষ রাজা ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

জাভা (যবদ্বীপ)

১। মতরাম রাজ্য

আগেই বলা হইয়াছে যে পঞ্চম কি ষষ্ঠ শতাব্দে পশ্চিম জাভায় পূর্ণবর্মনের অধীনে একটি হিন্দু রাজ্য ছিল। ইহার পর প্রায় দু'তিনশ' বছর এখানকার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। অষ্টম খ্রীঃ মধ্যে জাভায় একটি ক্ষমতাশালী হিন্দু রাজ্য গড়িয়া ওঠে। খুব সম্ভব মতরাম নামে জায়গায় এ রাজ্যের রাজধানী ছিল। সন্নাহ নামে এক রাজা এই রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। বলা হইয়াছে যে তিনি 'মনু'র ন্যায় ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন এবং অনেক বৎসর যাবৎ রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সঞ্জয় সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি খুব ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন ও অনেক দেশ জয় করেন। সমগ্র জাভা ও বলিদ্বীপ জয় করিয়া তিনি সুমাত্রা, কাম্বোডিয়া ও অন্যান্য দ্বীপে যুদ্ধ-যাত্রা করেন বলিয়া জানা যায়। ৭৩২ খ্রীঃ কেডুর নিকটে চঙ্গল নামে এক জায়গায় সঞ্জয় একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। খুব সম্ভব তিনি ৭১৭ খ্রীঃ সিংহাসনে আরোহণ করেন, কারণ এই বছর হইতে তাঁহার নামে একটি অব্দের প্রচলন হয়।

সঞ্জয়ের মৃত্যুর কিছু পরেই শৈলেন্দ্ররা মধ্য জাভা জয় করেন। যখন শৈলেন্দ্রদের অধীনে এই রাজ্য ছিল তখন সঞ্জয়ের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের কি অবস্থা হইল তাহা ঠিক বলা যায় না। যতদূর জানা যায় তাহাতে এই অনুমান করা যায় যে এই বংশের রাজারা মতরামের ১৫০ মাইল পূর্বে একটি রাজধানী স্থাপন করেন ও সেই খান হইতে রাজ্য পরিচালনা করিতে থাকেন। কিন্তু নবম খ্রীঃ শেষ হইবার আগেই তাঁহারা পুরানো রাজধানী উদ্ধার করেন। অন্ততঃ

৮৯৯ হইতে ৯১০ খ্রীঃ পর্যন্ত ধর্মোদয় মহাশম্ভুর রাজত্বকালে মধ্য ও পূর্ব জাভা তুই অংশই তাঁহার অধীনে ছিল।

সেই সময়কার লেখ হইতে জানা যায় যে অষ্টম ও নবম খ্রীঃ মধ্য জাভাই সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল। কিন্তু শৈলেন্দ্র অধিকারের সময় জাভার রাজগণ রাজ্যের পূর্ব অংশে আশ্রয় লওয়ায় পূর্ব জাভা ক্রমশঃ মধ্য জাভার স্থান গ্রহণ করিল।

ধর্মোদয় মহাশম্ভুর পরে ৯১৩ খ্রীঃ অথবা কিছু আগে দক্ষোত্তম সিংহাসন আরোহণ করেন। ইঁহার উপাধি ছিল বজ্রবাহু ও প্রতিপক্ষ-ক্ষয়। তাঁহার পরে আরো তুইজন মধ্য ও পূর্ব জাভায় রাজত্ব করেন। ইঁহাদের নাম তুলোদং ও বব (Wawa)। শেষোক্ত জনের রাজত্বকাল ৯২৪-৮ খ্রীঃ এবং ইনিই তুইশত বছর আগে স্থাপিত মতরাম রাজ্যের শেষ রাজা।

আনুমানিক ৯২৯ খ্রীঃ সিন্দোক জাভার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং এই সময় হইতে হিন্দু যুগের শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব জাভা সম্পূর্ণ প্রাধান্য লাভ করে। এই একই সময়ে মধ্য জাভার সভ্যতার ও সংস্কৃতির বিলোপ হইতে দেখা যায়। এই তুইটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কোন কারণ নির্ণয় করা যায় না। কাহারও মতে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গার অথবা কোন মহামারী হওয়াতে স্থানীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন অধিবাসীরা মধ্য জাভায় বাস করা দেবতার অনভিপ্রেত মনে করে। আবার কাহারও মতে পুনরায় শৈলেন্দ্ররা আক্রমন করিতে পারে এই আশঙ্কায় জাভার রাজগণ তাঁহাদের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই সময়ে শৈলেন্দ্ররা সুমাত্রা ও মালয় উপদ্বীপে রাজত্ব করিতেছিলেন এবং তাঁহাদের মনে জাভা রাজ্য পুনরুদ্ধারের ইচ্ছা একেবারে অসম্ভব ছিল না। তাঁহাদের নৌবাহিনীর পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যেই জাভায় সৈন্য অবতরণ করান সম্ভব ছিল। এই সমস্ত কারণেই হয়ত জাভার

রাজগণ তাঁহাদের রাজ্য পূর্বদিকে স্থানান্তরিত করেন এবং শৈলেন্দ্রদের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্যই মধ্য জাভাকে জনহীন প্রান্তরে পরিণত করেন।

শৈলেন্দ্রদের আক্রমনের ভয়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল ইহা মনে করা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু তাহাদের বাধা দিবার উপায় হিসাবে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত জনপদকে জনহীন প্রান্তরে পরিণত করা হইয়াছিল ইহা বিশ্বাস করা কঠিন এবং এরূপ সিদ্ধান্ত করার কোন প্রয়োজন নাই। আগে বলা হইয়াছে যে অষ্টম খ্রীঃ মাঝামাঝি মতরাম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শৈলেন্দ্ররা যখন মধ্য জাভা অধিকার করেন তখন এই রাজবংশ পূর্ব জাভা হইতে রাজ্য পরিচালনা করিতে থাকেন। যদিও নবম খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা মধ্য জাভা আবার উদ্ধার করেন এবং সম্ভবত রাজধানীও আবার মতরামে স্থানান্তরিত করিয়া আনেন তথাপি ঐ সময় হইতে রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র পূর্ব জাভাতে স্থাপিত হয়। শৈলেন্দ্র আক্রমণের সম্ভাবনাও এই ব্যবস্থার একটা কারণ হইতে পারে। ইহার পর প্রায় আরও একশ' বছর মধ্য জাভা কৃষ্টি ও সভ্যতার কেন্দ্র স্বরূপ ছিল, কিন্তু এখান হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইবার ফলে ইহার প্রাধান্যও ক্রমশঃ কমিতে লাগিল। ঐ সময়ে কোন অগ্নুদ্‌গার বা মহামারী অথবা শৈলেন্দ্রদের নৌবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ফলে মধ্য জাভা ধ্বংস মুখে পতিত হইল।

যে কোন কারণেই হোক দশম খ্রীঃ-র মধ্যভাগ হইতে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি মধ্য জাভার পরিবর্তে পূর্ব জাভায় বিরাজ করিতে লাগিল। প্রায় পাঁচশো বছর আগে পশ্চিম জাভা হইতে মধ্য জাভায় হিন্দু-সভ্যতার বিস্তার হয় ও ইহাই এতদিন হিন্দুসভ্যতার কেন্দ্র ছিল। পূর্ব জাভায় রাজ্য স্থানান্তরিত হইবার পর আবার সেখানেই হিন্দু সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং প্রায় আরও পাঁচশ বছর বিরাজ করে।

২। পূর্বজাভার উত্থান

পূর্ব জাভার প্রথম রাজার নাম সিন্দোক। যে কারণেই হোক জাভার ইতিহাসে তাঁহার নাম একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। পরবর্তী রাজগণ সকলেই তাঁহার সহিত কোন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেন। কিন্তু তিনি যে বিশেষ কোন কৃতিত্বের দাবী করিতে পারিতেন এইরকম কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। আর যতদূর জানা যায় তিনি উত্তরাধিকার সূত্রেই রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন এবং কোন নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না। অবশ্য এটা নিশ্চিত যে এমন কোন অজানা কারণ আছে যাহার জন্য জাভার পরবর্তী রাজগণ সকলেই তাঁহার বংশধর রূপে পরিচয় দিতে উৎসুক ছিলেন।

সিংহাসনে আরোহণ কালে সিন্দোক শ্রী ঈশানবিক্রম ধর্মোত্তুঙ্গদেব নাম গ্রহণ করেন। আনুমানিক ৯২৯ খ্রীঃ তিনি রাজ্যলাভ করেন এবং প্রায় কুড়ি বছর রাজত্ব করেন। তাঁহার সম্বন্ধে শেষ উল্লেখ পাওয়া যায় ৯৪৮ খ্রীঃ। সিন্দোকের পরে তাঁহার কন্যা রাণী শ্রী ঈশান-তুঙ্গবিজয়া রাজ্য লাভ করেন। ঈশানতুঙ্গবিজয়ার সহিত রাজা শ্রীলোকপালের বিবাহ হয় এবং তাঁহাদের পুত্রের নাম শ্রীমকুটবংশ-বর্ধন।

রাজা মকুটবংশবর্ধনের মহেন্দ্রদত্তা নামে এক কন্যা ছিল। ইনি গুণপ্রিয়ধর্মপত্নী নামেও পরিচিতা ছিলেন। তাঁহার উদয়ন নামে এক ব্যক্তির সহিত বিবাহ হয় ও তাঁহাদের পুত্রের নাম ঐর্লঙ্গ। ঐর্লঙ্গ পূর্বজাভার রাজা ধর্মবংশের কন্যাকে বিবাহ করেন। ধর্মবংশ সম্ভবত মকুটবংশবর্ধনের উত্তরাধিকারী ছিলেন। এই সময় বলিদ্বীপ জাভার অধীন ছিল এবং উদয়ন ও মহেন্দ্রদত্তা জাভার রাজা ধর্মবংশের প্রতিনিধি হিসাবে বলির শাসক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

বলিদ্বীপে যে সমস্ত লেখ পাওয়া যায় তাহাতে ৯৮৯-১০০১ খ্রীঃ পর্যন্ত উদয়ন ও মহেন্দ্রদত্তা উভয়ের নাম দেখা যায় কিন্তু পরে

১০১১-১০২২ খ্রীঃ খালি উদয়নের নাম দেখা যায়। ইহাতে মনে হয় যে ১০০১ হইতে ১০১১ মধ্যে মহেন্দ্রদত্তার মৃত্যু হয় এবং এই সময় হইতে উদয়ন একলা বলিদ্বীপের শাসক ছিলেন।

ধর্মবংশ দশম খ্রীঃ এর শেষ ভাগ হইতে একাদশ খ্রীঃ এর প্রথম ভাগ পর্যন্ত জাভার রাজা ছিলেন। ৯৯২ খ্রীঃ এ তিনি চীনের রাজ-দরবারে দূত প্রেরণ করেন এবং ইহার বিবরণ চীনের ইতিহাসে পাওয়া যায়। এই বিবরণ হইতে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে দীর্ঘকাল ধরিয়া জাভার সহিত চীনের কোন সম্বন্ধ ছিল না। এই সময়ে জাভার পররাষ্ট্রনীতির এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছিল বলিয়া ধরা যায়, কারণ বহু বছর পরে জাভা আবার প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করিল। আগেই বলা হইয়াছে যে এই সময় বলি জাভার শাসনাধীন ছিল এবং ইহা হইতেই প্রমান হয় যে জাভা রাজ্যবিস্তারেও মনোনিবেশ করিয়াছিল। বলি বিজয়ের পরেই সম্ভবত জাভা শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য আক্রমন করে। শৈলেন্দ্রদের প্রধান কেন্দ্র সান-ফোৎ-সি জাভা দ্বারা ৯৯০ খ্রীঃ এ আক্রান্ত হয়, কাজেই ইহার পূর্বেই শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানে তাহারা আক্রমন সুরু করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। জাভার আক্রমণে শৈলেন্দ্ররা এতদূর বিপর্যস্ত হইয়াছিলেন যে তাঁহারা চীনের সম্রাটের কাছে জাভার বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। খুব সম্ভবত এই আবেদনের প্রতিবিধানের জন্যই জাভা ৯৯২ খ্রীঃ চীন দরবারে দূত পাঠায়। ইহা সুনিশ্চিত ভাবে জানা যায় যে দশম খ্রীঃ এ জাভা রাজ্যবিস্তারে অগ্রসর হয় এবং ৯৯০ খ্রীঃ প্রভূত সাফল্য লাভ করে। এইরূপে দশম খ্রীঃ এ ধর্মবংশের অধীনে জাভা ক্ষমতাশালী রাজ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

কিন্তু এই সাফল্য খুবই অল্পদিন স্থায়ী হইয়াছিল, কারন ১০০৩ খ্রীঃ শৈলেন্দ্ররা তাঁহাদের রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন ও চীনের দরবারে দূত পাঠান; এবং এইবার ইহার প্রতিবিধান স্বরূপ জাভার পক্ষ হইতে কোন দূত চীনে পাঠানো হয় নাই।

ইহার পর চার বছরের মধ্যেই ধর্মবংশ ও তাঁহার রাজ্য একটি বিপর্যয়ের মধ্যে পতিত হয়। এই বিপর্যয়ের কোন সঠিক কারণ জানা যায় না। ১০০৬ খ্রীঃ একটি লেখতে বলা হইয়াছে যে সমুদ্রের জলরাশি যেমন সময়ে সময়ে পৃথিবী গ্রাস করে সেইরূপ একটি ভীষণ প্রলয় জাভারাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে এবং ইহার ফলে আনন্দ কোলাহলে মুখরিত জনবহুল রাজধানী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় এবং ১০০৬ খ্রীঃ রাজাও মৃত্যুমুখে পতিত হন।

অনেকের মতে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গার বা অন্য কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এই বিপর্যয়ের কারণ। কিন্তু ইহাই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় যে কোন শত্রুপক্ষের রাজার আক্রমণের ফলে এই ধ্বংস সাধন হইয়াছিল। কিন্তু কোন্ রাজ্যের রাজা এইরূপে জাভার সর্বনাশ করিয়াছিল তাহা ঠিক জানা যায় না।

যে কেহই জাভার শত্রুতা করুক না কেন তাহার উদ্দেশ্য যে সফল হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ধর্মবংশের সাথে সাথে তাঁহার রাজ্য ও রাজপ্রাসাদ দুই-ই বিনষ্ট হয়। তাঁহার ষোল বৎসর বয়স্ক জামাতা ঐর্লঙ্গ কয়েকটি বিশ্বস্ত অনুচরসহ অরণ্যে লুকাইয়া রহিলেন। এখানেও শত্রুরা তাঁহাদের অনুসরণ করাতে তাঁহারা একটি ছোট আশ্রমে আশ্রয় লন। বল্কল পরিয়া সাধু ও সন্ন্যাসীদের দেওয়া খাদ্যে তাঁহারা বাঁচিয়া রহিলেন। এইভাবে তিন বছর কাটিয়া গেলে ধর্মবংশের পক্ষের লোকেরা ঐর্লঙ্গের সন্ধান পাইল। ১০১০ খ্রীঃ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য লোকেরা ঐর্লঙ্গকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করে এবং ধর্মবংশের পক্ষীয় লোকেরা তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করে। ১০১৯ খ্রীঃ মধ্যে ঐর্লঙ্গ পসরুহান নামক জায়গার কাছে একটি ছোট রাজ্য অধিকার করেন এবং ঐ বছরই বৌদ্ধ, শৈব এবং ব্রাহ্মণ এই তিনটি ধর্মের পুরোহিতদের উপস্থিতিতে তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

অভিষেককালে তাঁহার নামকরণ হয় শ্রীলোকেশ্বর ধর্মবংশ ঐর্লঙ্গ অনন্তবিক্রমোত্তুঙ্গ দেব।

১০২৮ খ্রীঃ যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করিয়া ঐর্লঙ্গ তাঁহার হারাণো রাজ্য পুনরুদ্ধারে মনোযোগী হন। পরবর্তী চার বছর বহু রাজার সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। কেহ কেহ তাঁহার বশ্যতা :স্বীকার করেন, আবার যাঁহারা করেন না তাঁহারা নিহত অথবা নির্বাসিত হন।

অবশেষে শত্রুপক্ষের মধ্যে কেবলমাত্র বেঙ্করের রাজা বিজয় বাকী রহিলেন। ইতিমধ্যে ১০৩০ খ্রীঃ ঐর্লঙ্গ একবার বিজয়কে পরাজিত করিয়াছিলেন কিন্তু ১০৩৫ খ্রীঃ একটি সুসজ্জিত বাহিনী নিয়া তিনি বিজয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং আশাতিরিক্ত ফল লাভ করেন। দুইমাস বাদে বিজয় তাঁহার নিজ সৈন্যদের দ্বারা বন্দী ও নিহত হন। ঐর্লঙ্গ বিষ্ণুগুপ্ত (কৌটিল্য) রচিত পুস্তক হইতে যে রাজনীতি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহারই ফলে ইহা সাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। বেঙ্কর রাজ্য পতনের সাথে রাজ্য পুনরুদ্ধার কার্যও শেষ হইল এবং ঐর্লঙ্গ জাভার একচ্ছত্র অধিপতি হইলেন।

ঐর্লঙ্গের সময় জাভা অন্যান্য দেশের সংস্পর্শে আসে। যে সব দেশ হইতে লোক এই সময়ে জাভায় বাণিজ্য বা অন্য কোন উদ্দেশে আসিত তাহাদের একটি তালিকা সেই সময়কার বিবরণীতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে ক্লিঙ্গ (কলিঙ্গ), সিংঘল (সিংহল), দ্রাবিড় (চোলদেশ), কর্ণাটক(দক্ষিণ ভারতের কানাড়া), চম্পা (ভিয়েৎনাম), ক্মির (কম্বোজ) প্রভৃতি সহজেই সনাক্ত করা যায়।

একটি লেখ হইতে জানা যায় যে, বন্যায় ব্রান্টাস নদীর উপকূল ভাসিয়া যাওয়াতে লোকের বহু ক্ষতি হয় এবং ইহার প্রতিরোধের জন্য ঐর্লঙ্গ একটি বাঁধ নির্মাণ করান। ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে উনবিংশ শতাব্দীতেও এই বাঁধ দ্বারা সেচ কার্যের অনেক সুবিধা হইয়াছে। উক্ত লেখ হইতে আরও জানা যায় যে ঐর্লঙ্গ ঐ বাঁধ

নির্মাণ করায় যে সকল বিদেশী বণিক এবং পোতাধ্যক্ষরা ব্রান্টাস নদীর মোহানার নিকট এই বন্দরে আসিত তাহারা খুব আনন্দিত হয়। এই বন্দরটি আধুনিক সুরাবায়া অথবা ইহার নিকটে অবস্থিত ছিল এবং সুরাবায়ার মতই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিল। অপর একটি লেখ হইতে জানা যায় যে আধুনিক টুবান বা তাহার নিকটে আর একটি বন্দর ছিল। এই সব হইতে বোঝা যায় যে ঐর্লঙ্গের সময়ে জাভা বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিল।

পরবর্তীকালে জাভায় প্রচলিত কাহিনী হইতে জানা যায় যে বৃদ্ধ বয়সে ঐর্লঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার সম্বন্ধে ১০৪২ খ্রীঃ শেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। সন্ন্যাস গ্রহণের পর হইতে মৃত্যু পর্যন্ত ঐর্লঙ্গ সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। ১০৪৯ খ্রীঃ ঐর্লঙ্গের মৃত্যু হয়। জাভার ইতিহাসে তাঁহার ন্যায় বিচিত্র ঘটনা-সঙ্কুল জীবন আর দেখা যায় না। তিনি প্রকৃত বীরের ন্যায় যুদ্ধ ও শান্তি উভয় সময়েই রাজ্য পরিচালনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

ঐর্লঙ্গকে বিষ্ণুর এক অবতার বিশেষ বলিয়া গণ্য করা হইত। বেলহান নামক স্থানে তাঁহার শেষকৃত্য সমাধা হয় এবং সেখানে গরুড়ের উপর অবস্থিত একটি বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া যায়। এই মূর্তিটি ভাস্কর্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন এবং সম্ভবত বিষ্ণুর মূর্তি হইলেও এইটি ঐর্লঙ্গেরই প্রতিমূর্তি। এই সময়ে যে ভাস্কর্য শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল তাহাও ইহা হইতে প্রমাণিত হয়। ঐর্লঙ্গ যে সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন তাহা বোঝা যায়, কারণ তাঁহার উৎসাহে ও সাহায্যেই কণ্ব নামে এক কবি 'অর্জুন বিবাহ' নামে বিখ্যাত কাব্য রচনা করেন। জাভায় এই ধরণের কাব্য রচনা এই প্রথম।

৩। কডিরি রাজ্য

মৃত্যুর পূর্বে ঐলঙ্গ তাঁহার রাজ্য দুইপুত্রের মধ্যে ভাগ করিয়া দেন। ইহার ফলে পূর্ব জাভা বহুকাল পর্যন্ত দুইটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে বিভক্ত রাজ্য হইতে যে কি বিষময় অবস্থার সৃষ্টি হয় সে সম্বন্ধে ঐর্লঙ্গের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল এবং তিনি প্রায় সারাজীবন এই সমস্যার সমাধানের জন্য সমস্ত রাজ্যগুলি একত্রিত করিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে সফলতাই তাঁহার জীবনের প্রধান কৃতিত্ব। অথচ তিনিই আবার মৃত্যুকালে তাঁহার রাজ্য ভাগ করিয়া গেলেন। নিশ্চয়ই অত্যন্ত দায়ে ঠেকিয়াই তাঁহাকে এই কাজ করিতে হয়। ঐর্লঙ্গের দুইপুত্র যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন এবং সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া কেহই শক্তি প্রয়োগে পশ্চাৎপদ হইতেন না। এই কারণে দুই পুত্রের মধ্যে মিটমাট করিতে না পারিয়া গৃহযুদ্ধের হাত এড়াইবার জন্য বাধ্য হইয়া বৃদ্ধ বয়সে তিনি এই ব্যবস্থা করিলেন, কারণ একমাত্র এই ব্যবস্থা দ্বারাই তাঁহার মৃত্যুর পর রাজ্যের উত্তরাধিকার সমস্যার সমাধান শান্তিপূর্ণ ভাবে হইতে পারিত।

এইরূপে পূর্ব জাভায় পঞ্জলু ও জঙ্গল নামে দুইটি রাজ্যের উদ্ভব হইল। পশ্চিম অংশের রাজ্যের নাম অল্পদিনের মধ্যেই পরিবর্তিত হইয়া কডিরি হইল এবং ত্রয়োদশ খ্রীঃ এর শেষ ভাগে ইহা গেলাঙ্গে-লাঙ্গ নামে উল্লিখিত হইত। রাজধানী কডিরি 'দহ' নামেও পরিচিত ছিল। আধুনিক কডিরি নামে শহর যে এই স্থানেই অবস্থিত সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

জঙ্গল রাজ্যের রাজাধানীর নাম বা অবস্থিতি সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। সম্ভবত ঐর্লঙ্গের রাজধানী কহুরিপনেই পূর্ব রাজ্যের রাজধানী অবস্থিত ছিল। জঙ্গল রাজ্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু খবর পাওয়া যায় না। বস্তুত: এই রাজ্যের অস্তিত্ব খুব বেশীদিন ছিল কিনা ইহাই সন্দেহের বিষয়।

অপরপক্ষে কডিরি রাজ্যের অনেক রাজার নাম জানা যায়। তাঁহারা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁহাদের অধীনে জাভা শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। কডিরি রাজ্যের প্রথম যে রাজার নাম জানা যায় তিনি শ্রীজয়বর্ষ দিগ্‌জয় শাস্ত্রপ্রভু। ইনি ১১০৪ খ্রীঃ রাজত্ব করিতেন এবং তাঁহার পৃষ্ঠপোষণে কবি ত্রিগুণ জাভার বিখ্যাত কাব্য কৃষ্ণায়ণ রচনা করেন।

ধর্ময় কর্ত্তৃক জাভার প্রাচীন ভাষায় রচিত স্মরদহন কাব্যে কামেশ্বর নামে এক রাজার উল্লেখ আছে। খুব সম্ভবত ইনি ১১১৫ হইতে ১১৩৫ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। কবি রাজাকে কামদেবের অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাঁহার বাসস্থান দহন পৃথিবীর মধ্যে এক আশ্চর্য স্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতাব নাম শ্রীঈশানধর্ম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ঐর্লঙ্গের ন্যায় তাঁহার পরবর্তী বংশধরগণ অর্থাৎ কডিরির রাজারাও তাঁহাদের বংশাবলী সিন্দোক-ঈশান হইতেই আরম্ভ করিতেন। কামেশ্বরের রাণীর নাম ছিল শ্রীকিরণ।

কামেশ্বরের পর তাঁহার পুত্র জয়ভয় সিংহাসনে আরোহন করেন। যে কয়জন রাজার নাম এখন পর্যন্ত জাভায় সাধারণ কিম্বদন্তীতে প্রচলিত আছে জয়ভয় তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার নাম প্রচলিত থাকিবার কারণ বোধ হয় এই যে তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় বিখ্যাত কাব্য 'ভারত-যুদ্ধ' রচিত হয়। সম্ভবত ১১৩৫ হইতে ১১৫৭ খ্রীঃ পর্যন্ত ইনি রাজত্ব করেন। কবি সেডঃ ভারত-যুদ্ধ কাব্য সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই; পরে সম্ভবত জয়ভয়ের রাজ্যকালে পনুলু ইহা সমাপ্ত করেন।

এই রাজ্যের আরও কয়েকজন রাজার নাম জানা যায়,—যথা সর্বেশ্বর (১১৬০-১), আর্যেশ্বর (১১৭১), ক্রোঞ্চার্যদীপ (১১৮১) এবং দ্বিতীয় কামেশ্বর (১১৮৫)। কিন্তু ইঁহাদের নাম ব্যতীত আর কিছুই জানা যায় না। কডিরি রাজ্যের শেষ রাজা ছিলেন কৃতজয়।

পররতোন নামে জাভার ভাষায় রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে কৃতজয় পুরোহিতদের তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে বলিলেন এবং যখন তাঁহারা ইহাতে অস্বীকার করিলেন তখন তাঁহাদের ভয় দেখাইবার জন্য কয়েকটি অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিলেন। কিন্তু পুরোহিতরা ইহাতে বশ্যতা স্বীকার করা দূরে থাকুক সকলে একত্রিত হইয়া তুমাপেলের অধিপতির কাছে আশ্রয় লইলেন। তুমাপেলের অধিপতি কডিরি রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং কৃতজয় পরাজিত হইয়া (১২২২ খ্রীঃ) একটি আশ্রমে আশ্রয় লইলেন। কৃতজয়ের পরাজয়ের সাথে সাথেই কডিরি রাজ্যও নিশ্চিহ্ন হইল।

চীনা বিবরণী হইতে কডিরি রাজের কথা জানা যায়। এই বিবরণী হইতে মনে হয় যে সেই সময় জাভাদ্বীপটি তিনটি রাজ্যের মধ্যে বিভক্ত ছিল। ইহাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও বড় রাজ্যের নাম শো-পো এবং ইহার অধীনে জাভা ও কাছাকাছি অন্যান্য দ্বীপের প্রায় পনরোটি ছোট ছোট রাজ্য ছিল। শো-পো কডিরি রাজ্যের চীনা নাম। ইহাতে বলা হইয়াছে যে জাভার নিকটে যে আটটি দ্বীপ শো-পোর অধীন তাহাদের অধিবাসীরা অসভ্য ও বর্বর। যদিও এই দ্বীপগুলি এখন সনাক্ত করা সম্ভব নহে তবে এইগুলি যে মালয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহাদের মধ্যে দুইটি যে বলি ও বোর্ণিও, তাহা একপ্রকার নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এইসব হইতে বোঝা যায় যে এই সময় জাভা পূর্বদিকে বলি, বোর্ণিও ও অন্যান্য অসভ্য ও অর্দ্ধসভ্য জাতির উপর রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কাজেই মজপহিত সাম্রাজের গোড়া-পত্তন যে কডিরি রাজ্যের সময়েই হইয়াছিল একথা বলিলে ভুল বলা হইবে না।

কডিরি রাজ্যের সময় জাভায় শিল্প ও সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলে জাভার ইতিহাসে ইহা একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। পরবর্তীকালে জাভার বিশাল

সাম্রাজ্যের সূচনা এই সময়ে হইয়াছিল এবং সংস্কৃতির দিক দিয়া 'ভারত-জাভা' কৃষ্টি এখানে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল।

৪। সিংঘসারি রাজ্য

অন্যান্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতাদের ন্যায় সিংঘসারি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা 'কেন অংরোক' সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। এই সব প্রচলিত গল্পগুলি হইতে অলৌকিক ঘটনাগুলি—যথা তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা শিবের অবতার অথবা পুত্র ছিলেন—বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাতে জানা যায় যে অংরোক পাংকুর নামে এক কৃষকের পুত্র ছিলেন এবং প্রথমে চুরি ডাকাতি করিয়া জীবন কাটাইয়াছিলেন। পরে তুমাপেলের (সিংঘসারি) শাসনকর্তার অধীনে কাজে যোগ দেন। অবশেষে অংরোক তাঁহার প্রভুকে হত্যা করিয়া বিধবা রাণী ডেডেস্‌কে বিবাহ করেন এবং 'কবি' পর্বতের পূর্বদিকের ভূখণ্ডের শাসনকর্তা হইয়া বসেন।

নতুন জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিবার অল্পদিনের মধ্যেই অংরোকের সহিত কডিরি রাজ্যের রাজা কৃতজয়ের সংঘর্ষ বাধে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে কডিরির পুরোহিতদের সহিত কৃতজয়ের ঝগড়া হয় এবং এই সুযোগে অংরোক নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। তাহার নতুন নামকরণ হয় রাজস এবং সম্ভবত 'অমূর্বভূমি'।

এই সময়ে কডিরি ও তুমাপেলের মধ্যে যুদ্ধ অপরিহার্য হইয়া উঠে। রাজস কডিরির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন; সম্ভবত তখনও কডিরির পুরোহিতরা তাঁহার সহায় ছিলেন। ১২২২খ্রীঃ গণ্টেরে যুদ্ধ হয়। অনেকক্ষণ ব্যাপী ভীষণ যুদ্ধের পর কৃতজয়ের ভাই ও সেনাপতি মহীষ বলুঙ্গান যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন ও অধিনায়কহীন সৈন্যরা পলায়ন করে। কৃতজয়ের অবশিষ্ট সৈন্যরা কডিরির নিকট আবার পরাজিত হয়।

ক্রমশঃ তাঁহার রাজ্যের আধিপত্য এই রাজ্যের দূর দূরান্তরে প্রতিষ্ঠিত হইল।

কৃতনগরের অন্যান্য যে বিজিত জায়গাগুলি সনাক্ত করা যায় তারার মধ্যে পহঙ্গ ঐ নামে অভিহিত মালয় উপদ্বীপের একটি জেলা এবং বকুলপুর বোর্ণিও দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ। গুরুন্ সম্ভবত গোরঙ্গ অথবা গোরম অর্থাৎ পূর্বাঞ্চল। এইরূপে কৃতনগর সুমাত্রা দ্বীপে, জাম্বি, বোর্ণিও ও মালয় উপদ্বীপের কিছু অংশে, বলি, সুন্দ ও মাদুরা প্রভৃতি স্থানে রাজ্য বিস্তার করিলেন এবং জাভাকে সুবর্ণ দ্বীপের একটি প্রধান রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠা করলেন। সুমাত্রা অধিকারের কালে অথবা পরে সেইখানকার জাভার সৈন্যদের শৈলেন্দ্র অথবা তাঁহাদের পরবর্তী উত্তরাধিকারীগণ যে বিতাড়িত করিতে পারিলেন না তাহাতেই বোঝা যায় যে এই সময় হইতে তাঁহাদের শক্তি নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল ও অন্য একটি নূতন ক্ষমতা ক্রমশ: সেইস্থান অধিকার করিয়া লইতেছিল।

এই সময়ে জাভার রাজকুমারী তপসীর সহিত চম্পার রাজা তৃতীয় জয়সিংহবর্মণের (১২৮৭-১৩০৭ খ্রীঃ) বিবাহ হয়। এই বিবাহকে জাভার অন্যান্য দেশের সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপনের অঙ্গ হিসাবে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই সময়ে চম্পা রাজ্য চীনের দুর্ধর্ষ মোঙ্গল রাজ কুবলাই খাঁর আক্রমণ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়াছিল। চম্পা ও জাভার এই মৈত্রীভাব সম্ভবত উভয়ের কুবলাইখাঁর প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবের ফল। কারণ কুবলাই খাঁ অন্য সকলের মত জাভার রাজাকেও তাঁহার দরবারে আসিয়া তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন (১২৮১ খ্রীঃ)। ১২৮৯ খ্রী: পর্যন্ত কৃতনগর কোন না কোন অজুহাতে ইহা এড়াইয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজদরবারে গিয়া অবনতি স্বীকার করার অনুরোধ রক্ষা করিবার আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া চীনের দূতের মুখের অংশ বিশেষ ক্ষতবিক্ষত করিয়া

তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন। এই অবমাননার উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য জাভার বিরুদ্ধে কুবলাই খাঁ এক যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিলেন কিন্তু তাহা জাভায় পৌঁছিবার আগেই আভ্যন্তরিক বিদ্রোহের ফলে কৃতনগরকে এই জগৎ হইতে বিদায় নিতে হইল।

কৃতনগর বৈদেশিক রাজনীতিতে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু আভ্যন্তরিক রাজ্য শাসন ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছিলেন। ফলে প্রায়ই রাজ্যে বিদ্রোহ হইত বলিয়া জানা যায়। ১২৭০ খ্রীঃ তিনি চয়রাজের (অথবা ভয়রাজ) বিদ্রোহ দমন করেন। চয়রাজ এতদূর শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল যে নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিতে দ্বিধা করে নাই। এই ঘটনার মাত্র দশ বছর বাদেই আবার মহীষ রঙ্ক পরিচালিত আর একটি বিদ্রোহ তিনি দমন করেন।

কিন্তু কড়িরির শাসনকর্তার হাতে কৃতনগরের মৃত্যু ঘটে। জাভার পুরাবৃত্ত 'পররভোনে' যে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে এই পতনের প্রধান কারণ রাজার কর্মচারী নির্বাচন ক্ষেত্রে বিচার বুদ্ধির অভাব। তাঁহার রগনাথ নামে প্রথমে যে বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন তিনি রাজ্যের মঙ্গলের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাঁহার পরামর্শে রাজার কোন আস্থা নাই দেখিয়া তিনি পদত্যাগ করিলেন। তখন রাজা অরাগনি নামে এক ব্যক্তিকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন। নূতন মন্ত্রী রাজাকে নানাবিধ ভাল খাদ্য ও মদ যোগাইতে ব্যস্ত রহিলেন। রাজার আর একটি খামখেয়ালী কাজ হইল আর্যবীররাজ নামে সমাজের এক নীচু স্তরের বক্তিকে রাজ দরবারে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠা করা। আরও আশ্চর্যের কথা এই যে যখন এই লোকটির বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ পাওয়া গেল তখন রাজা তাহাকে পূর্ব মাদূরার সুঙ্গেনেব নামক জায়গার শাসনকর্তা করিয়া পাঠাইলেন। পররতোন গ্রন্থে বীররাজ ও অরাগনি এই দুইজনকে

কৃতনগরের শনি স্বরূপ বলা হইয়াছে। অরাগনির পরামর্শে রাজা বেশীর ভাগ সৈন্য জাভা হইতে মলয়ুর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ১২৭১ খ্রীঃ হইতে জয়কত্বং কডিরির শাসক নিযুক্ত ছিলেন এবং তিনি যে কোন উপায়ে সিংহাসন দখল করিবার মতলবে ছিলেন। এই সময়ে বীর-রাজ জয়কত্বং-এর সহিত একযোগে বিদ্রোহের আয়োজন করিলেন। বীররাজের প্ররোচনায় জয়কত্বং এই কাজে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সৈন্যের একটি ছোট দল উত্তর দিক হইতে সিংঘসারির দিকে অগ্রসর হইল। মদ্যপানে ব্যস্ত কৃতনগর জয়কত্বং বিদ্রোহ করিয়াছেন প্রথমে একথা বিশ্বাস করেন নাই, কারণ তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে তিনি তাঁহার অনুগত। কিন্তু যখন আহত লোকদের দেখিয়া তিনি অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করিলেন তখন তিনি যথাসম্ভব সৈন্য জোগাড় করিয়া জয়কত্বং-এর সৈন্যদের বিরুদ্ধে উত্তর দিকে পাঠাইলেন। তাঁহার দুই জামাতা এই সৈন্য পরিচালনা করেন। ইহাদের একজন কুমার বিজয়, অন্যজন জয়-কত্বং-এর পুত্র অর্দ্ধরাজ। রাজবাহিনী জয় লাভ করিল ও উত্তর দিক হইতে বিদ্রোহীদের বিতাড়িত করিল। কিন্তু ইতিমধ্যে একটি বড় ও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্যদল কডিরি হইতে গোপনে দক্ষিণ দিক হইতে অগ্রসর হইয়া বিনা বাধায় সিংঘসারি পৌছিল। তাহারা রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিল এবং পররতোনের বিবরণ অনুসারে রাজা ও মন্ত্রীকে মদ্যপানে রত অবস্থায় দেখিতে পাইল। উভয়েই কডিরির সৈন্যদের দ্বারা নিহত হইলেন। এই ঘটনা ১২৯২ খ্রীঃ ঘটিয়াছিল।

পররতোনের বিবরণে কৃতনগরকে যতদূর সম্ভব খারাপভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে, কিন্তু অন্যান্য কয়েকটি বিবরণে ঠিক ইহার বিপরীত বর্ণনা পাওয়া যায়। 'নাগর-কৃতাগম' নামক বিখ্যাত ঐতিহাসিক কাব্যে বলা হইয়াছে যে রাজা "রাজনীতির ষাড়্গুণ্য সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন, সকল বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, (বৌদ্ধ) ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানী ছিলেন, এবং ব্যবহারিক জীবনে ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন।" ইহাতে অতিরঞ্জন আছে সন্দেহ নাই কিন্তু কয়েকটি

লেখতে রাজার সম্বন্ধে চারি দ্বীপের অধিপত্য এবং তাঁহার বিদ্যা ও আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ রাজার বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার কথা লোক-প্রসিদ্ধ ছিল। রাজা সমস্ত জীবন অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত এই ধর্মের আচার নিয়মগুলি পালন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র সংক্রান্ত সব কিছু, বিশেষ করিয়া তর্ক ও ব্যাকরণ শাস্ত্র এবং যেগুলি আধ্যাত্মিক বিষয়ে রচিত এই সবগুলি সম্বন্ধে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। রাজা নিজে যোগ ও সমাধি অভ্যাস করিতেন এবং অনেক পুণ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন।

কৃতনগর সম্বন্ধে এই দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের বিবরণের অর্থ সম্ভবত এই যে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের অনুগামী ছিলেন এবং এই সম্প্রদায়ের মতে মদ্যপান ধর্মপালনের এক অঙ্গ হিসাবে ধরা হইত। পররতোনে যে রাজার মদ্যপানের কথা বলা হইয়াছে তাহা সম্পুর্ণ সত্য, কিন্তু যাহাদের মতে ইহা নিষ্ঠার সহিত ধর্মপালনের অঙ্গমাত্র তাহাদের হইতে পররতোনের রচয়িতার দৃষ্টিভঙ্গী অন্যরূপ ছিল।

পররতোনে বলা হইয়াছে যে বিদ্রোহী সেনাদল যখন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিল তখনও রাজা মদ্যপানে ব্যস্ত ছিলেন। ইহা সত্য না হইলেও পূর্বোক্ত বিবরণ মোটামুটি সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়। বাহিরে রাজ্য বিস্তার নীতি ও ধর্মপালনে রাজা এতদূর ব্যস্ত ছিলেন যে রাজ্যের অভ্যন্তরে ষড়যন্ত্রের বিষয়ে তিনি সম্পুর্ণ উদাসীন ছিলেন এবং ইহার প্রতিকারেরও কোন বন্দোবস্ত করেন নাই। কৃতনগরের রাজ্য বিস্তার নীতি লোকবল ও অর্থ এই উভয় দিক দিয়াই জাভার শক্তি ক্রমশ: দূর্বল করিয়া আনিতেছিল ; আর তাছাড়া নূতন বিজিত রাজ্যগুলিতে রাজার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিতে বেশীর ভাগ সৈন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। এইজন্য রাজ্যে যখন বিদ্রোহ দেখা দিল তখন যথেষ্ট সৈন্য উপস্থিত ছিল না। পররতোনে রাজার চরিত্রের

আর একটি লক্ষণের উল্লেখ করা হইয়াছে যে তিনি অনুপযুক্ত লোকের উপর আস্থা স্থাপন করিতেন। ইহা যে কিছু পরিমাণে সত্য তাহা জয়কত্বং ও বীররাজের মত দুইজন চক্রী লোকের উপর রাজার গভীর বিশ্বাস হইতে বোঝা যায়। তাঁহার ধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগ প্রায় ধর্মোন্মত্ততার পর্যায়ে পৌঁছিয়াছিল এবং ইহাও রাজকার্যের বিঘ্ন ঘটাইতেছিল। ইহা সহজেই বোঝা যায় যে রাজা শাস্ত্র আলোচনা ও ধর্মের আনুষঙ্গিক ক্রিয়া পালনে এতদূর নিমগ্ন ছিলেন যে তাঁহার পক্ষে রাজ্যের শুভাশুভের দিকে নজর দেওয়া সম্ভব ছিল না। নিরুপদ্রব হইবার জন্য পরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা তাঁহার চরিত্রের আর একটি লক্ষণ। চতুর্দিক হইতে বিপদের আশঙ্কা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া তিনি তাঁহার রাজ্য বিস্তার নীতি ও শাস্ত্র আলোচনায় ব্যস্ত রহিলেন এবং ইহাই শেষ পর্যন্ত তাঁহার সর্বনাশের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। এইরূপে চরিত্রের যে সব বিশেষত্বের জন্য তিনি কিছু সংখ্যক লোকের কাছে বিশেষ সম্মানের আসন পাইয়াছিলেন তাহাই আবার তাঁহার সর্বনাশের কারণ হইল। কৃতনগরের চরিত্রের এই বিপরীত-ধর্মী লক্ষণ-গুলির জন্য পররত্তোন ও নাগর-কৃত্তাগমে তাঁহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই রকমের বিবৃতি পাওয়া যায়।

পর্যটক মার্কোপোলো (১২৯২ খ্রীঃ) কৃতনগরের রাজ্য সম্বন্ধে একটি বিবরণ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিবরণে জানা যায় যে এই সময়ে জাভা একটি সমৃদ্ধিশালী রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। ইহার প্রভূত ধন সম্পদ ছিল এবং ইহা বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

৫। মজপহিত রাজ্যের পত্তন

কৃতনগরের মৃত্যুর সাথে সাথে সিংঘসারি রাজ্যের পতন হইল এবং এই সুযোগে জয়কত্বং কডিরি রাজ্যের প্রাধান্য আবার প্রতিষ্ঠা

করিলেন। জয়কত্বংএর সাফল্য বিভিন্ন দিক হইতে বিচার করা যায়। কৃতনগরের বংশের লোকের চক্ষে তিনি বিশ্বাসঘাতক, কিন্তু অন্যদিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে আনুমানিক দুই শতাব্দী কাল শ্রেষ্ঠ রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকার পর প্রায় সত্তর বৎসর কাল যে কডিরি রাজ্য বিগতশ্রী হইয়াছিল, জয়কত্বং পুনরায় তাহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু তাঁহার সাফল্য ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল। শীঘ্রই তাঁহাকে দুই দিক হইতে বিপদের সম্মুখীন হইতে হইল। কুমার বিজয় ও মোঙ্গল সম্রাট কুবলাই খাঁ দুইজনেই জয়কত্বংএর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে যখন উত্তরদিক হইতে সিংঘসারি রাজ্য আক্রান্ত হয় তখন কৃতনগর তাঁহার দুই জামাতা কুমার বিজয় ও অর্দ্ধরাজের অধীনে যথাসম্ভব সৈন্য সংগ্রহ করিয়া উহাদের বিরুদ্ধে পাঠান। তিন তিনবার কডিরির সৈন্যদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বিজয় ভাবিয়াছিলেন যে তিনি শত্রুদের সমূলে বিনাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই সময়ে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে পুর্বদিক হইতে আর একদল কডিরি সৈন্যের আবির্ভাব হইল এবং অর্দ্ধরাজ তাহাদের সাথে যোগ দিল। এই ঘটনায় বিজয়ের সৈন্যদলের প্রভূত ক্ষতি হইল এবং তাহারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পিছাইয়া আসিতে বাধ্য হইল। বিজয় ও অর্দ্ধরাজ সিংঘসারি হইতে শত্রু দমনের জন্য রওনা হইবার পর কডিরির অন্য একদল সৈন্য দক্ষিণদিক হইতে অগ্রসর হইয়া সিংঘসারি দখল করে এবং কৃতনগরকে নিহত করে। এই সকল কার্য সমাধা করিয়া তাহারা উত্তরদিক হইতে আগত সৈন্যদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হয় এবং এই সময়ে জয়কত্বংএর পুত্র অর্দ্ধরাজও পিতার পক্ষ অবলম্বন করেন।

এই সব কারণে বিজয়ের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। যে ছয়শত লোক তখনও তাঁহার দলে অবশিষ্ট ছিল তাহাদের লইয়া

তিনি উত্তরদিকে যাত্রা করিলেন এবং বহুক্লেশ সহ্য করিয়া মাত্র বার জন অনুচর লইয়া মাতুরা পৌঁছিলেন।

মাতুরার শাসনকর্তা বীররাজের জীবনে যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছিল তাহা সমস্তই কৃতনগরের কৃপায়, এইজন্য তাহাকে মিত্ররূপে পাইবার আশায় বিজয় মাতুরায় গিয়াছিলেন। বীররাজ ও জয়কত্বংএর ষড়যন্ত্রের সম্বন্ধে অবশ্যই বিজয়ের কোন ধারণা ছিল না। বীররাজ প্রথমে বিজয়কে দেখিয়া বিস্মিত হইলেও পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া বিজয়কে যথোচিত সম্মান দেখাইয়া অভ্যর্থনা করিল। বিজয় বীররাজের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন এবং এই আশ্বাস দিলেন যে, "যদি আমার উদ্দেশ্য সফল হয় তাহা হইলে আমি জাভাদেশকে দুই ভাগে ভাগ করিব, এক ভাগ তোমার ও অন্য ভাগ আমার হইবে।" বীররাজের পক্ষে এই লোভ সংবরণ করা কঠিন হইল; সে জয়কত্বংকে পরিত্যাগ করিয়া বিজয়ের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল।

সংক্ষেপে বীররাজের পরিকল্পনা ছিল নিম্নরূপ :—

বিজয় জয়কত্বংএর কাছে নতি স্বীকার করিবেন এবং তাহার অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করিবেন। যখন তিনি বুঝিতে পারিবেন যে রাজার উপর কিছু প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছেন তখন ট্রিক (Trik) এর নিকটে অবস্থিত এক খণ্ড পতিত জমি মাতুরার অধিবাসীদের বসতি স্থাপনের জন্য চাহিয়া লইবেন। বিজয় কডিরির লোকবল ও অন্যান্য সব খবর সংগ্রহ করিয়া নতুন বসতিতে বাস করিবার অনুমতি চাহিয়া লইবেন এবং এখানে আসিয়া তিনি সিংঘসারি হইতে তাঁহার বিশ্বাসী লোকদের ও কডিরির রাজার বিরুদ্ধবাদীদের একত্রে জোগাড় করিবেন।

এই পরিকল্পনা সুষ্ঠুরূপেই কার্যে পরিণত হইল। একটি নূতন বসতির সৃষ্টি হইল। একজন অধিবাসী একটি বিল্ব (মজ) ফল মুখে দিয়া উহার তিক্ত (পহিত) আস্বাদের জন্য ফেলিয়া দেওয়াতে

এই জয়গার নাম হইল 'মজপহিত' অথবা সংস্কৃত বিল্বতিক্ত বা তিক্তবিল্ব। এই নতুন বাসস্থান হইতে বিজয় বীররাজকে খবর পাঠাইলেন যে সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু তাহারা কিছু করিবার আগেই কুবলাই খাঁর সৈন্যদল জাভা আক্রমণ করিল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে কুবলাই খাঁর দূতের মুখের অংশ বিশেষ ছেদন করিয়া কৃতনগর তাহার সহিত শত্রুতা সাধন করিয়াছিলেন। এই অপমানের শোধ লইবার জন্য কুবলাই খাঁ একদল সৈন্য জাভার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই সৈন্যদল ১২৯৩ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব জাভার উত্তর উপকূলে অবস্থিত টুবান (Tuban) নামক বন্দরে অবতরণ করে। এখানে চীনা সৈন্যদল দুইভাগে বিভক্ত হইয়া একদল স্থলপথে ও অন্যদল সমুদ্রপথে সোলো (Solo) নদীর মোহনা এবং সেখানে হইতে সুরবায়া (Surabaya) নদী অভিমুখে যাত্রা করে।

ইতিমধ্যে বিজয় নিজেকে মজপহিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং এখন চীনা অভিযানকে নিজের অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় হিসাবে গ্রহণ করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি নিজে চীনের আনুগত্য স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ও আরও চৌদ্দজন কর্মচারীকে চীনা সৈন্যদলের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য পাঠাইলেন।

অন্যদিকে জয়কত্বং তাঁহার রাজ্য এই আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করিতে উদ্‌যোগী হইলেন। তিনি তাঁহার প্রধান মন্ত্রী হি-নিং-কুয়ানকে (Hi-ning-kuan) একটি নৌবাহিনী দিয়া সুরাবায়া নদীর প্রবেশ পথ রক্ষা করিতে পাঠাইলেন ও নিজে সৈন্য লইয়া মজপহিতের দিকে রওনা হইলেন।

চীনা সৈন্যদল সুরবায়া নদীর মুখে পৌঁছিয়া জয়কত্বংএর নৌবাহিনী সম্পূর্ণ পরাজিত করে। হি-নিং-কুয়ান রাতারাতি পলাইয়া যায় এবং চীনারা এক হাজারেরও অধিক সংখ্যক বড় বড়

জাহাজ অধিকার করে। ১২৯৩ খ্রীঃ এর তৃতীয় মাসের প্রথম দিনে এই ঘটনা ঘটে।

নৌযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া চীনা সৈন্যদল বিজয়কে জয়কত্বং এর বিরুদ্ধে সাহায্য করিবার জন্য মজপহিতের দিকে অগ্রসর হয়। সপ্তম দিবসে কডিরির সেনাদল তিনদিক হইতে বিজয়কে আক্রমণ করে, কিন্তু তাহারা পরাজিত হয়।

মজপহিত রক্ষা পাইল, কিন্তু তখনও কডিরির রাজার প্রধান সৈন্যদল অপরাজিত ছিল। এইজন্য পনরো তারিখে চীনা সেনাদল তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া কডিরি আক্রমণ করিবার উদ্দেশে রওনা হইল।

উনিশ তারিখে বিভিন্ন সৈন্যদল কডিরির রাজধানী 'দহ'তে পৌছিল। এখানে জয়কত্বং লক্ষাধিক সৈন্য লইয়া ইহাদের বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। সকাল ছয়টা হইতে বেলা দুইটা পর্যন্ত যুদ্ধ চলিল। চীনা সেনাদল তিনবার কডিরির সৈন্যদের আক্রমণ করে, এবং শেষে পরাজিত কডিরি সেনাদল পলায়ন করে। কয়েক হাজার সৈন্য নদীতে ডুবিয়া মারা যায় এবং পাঁচ হাজারেরও বেশী সৈন্য নিহত হয়। রাজা নিজে শহরের ভিতর আত্মগোপন করেন এবং চীনের সৈন্যদল শহর অবরোধ করে। অবশেষে সন্ধ্যার দিকে জয়কত্বং আত্মসমর্পন করেন, এবং তাঁহার স্ত্রী, পুত্র ও কর্মচারী সকলকে বন্দী করিয়া লইয়া বিজয়ী সেনাদল ফিরিয়া যায়। জয়কত্বংএর পুত্র পাহাড়ে পলাইয়া যান কিন্তু একজন চীনা সৈন্যাধ্যক্ষ লোকজন লইয়া তাঁহাকেও বন্দী করিয়া আনে।

এই সময়ে বিজয় নিজের দেশে ফিরিয়া গিয়া সম্রাটের কাছে নতুন করিয়া আনুগত্য স্বীকার করিয়া পত্র দিবার জন্য অনুমতি চাহিলেন এবং যাইবার সময় যে সমস্ত মূল্যবান জিনিষপত্র যুদ্ধের সময় তাহারা লাভ করিয়াছিল তাহা চীনা দরবারে পৌঁছিয়া দিবার জন্য নিয়া গেলেন। চতুর্থ মাসের দ্বিতীয় দিবসে বিজয় চীনা শিবির

হইতে রওনা হইলেন এবং তাঁহার সাথে চীনা সেনাপতি দুইজন সৈন্যাধ্যক্ষ সহ দুইশ' সৈন্য দিলেন।

জয়কত্বংএর দিক হইতে নিশ্চিন্ত হইয়া বিজয় চীনাদের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখা দরকার মনে করিলেন না। তিনি তাঁহার চীনা রক্ষীদের হত্যা করিয়া একদল সৈন্য জোগাড় করিলেন এবং যখন চীনা সৈন্যরা কডিরি হইতে ফিরিয়া আসিতেছিল তখন তাহাদের আক্রমণ করিলেন। চীনা সেনাপতিরা প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিয়াও সাহসের সহিত যুদ্ধ করেন এবং তাঁহাকে হটাইয়া দেন।

চীনা সেনাপতিরা বিজয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মনস্থ করেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একজন এ সম্বন্ধে সম্রাটের মতামত জানিতে চাহিবার জন্য দরবারে লোক পাঠাইবার প্রস্তাব করিলেন। অন্য দুইজন এই প্রস্তাবে রাজী হইলেন না। সেইজন্য তাঁহারা চতুর্থ মাসের চব্বিশ তারিখে সমস্ত সৈন্য ও বন্দীদের এবং যে সমস্ত ছোট রাজ্যগুলি তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল তাহাদের দূতদের নিয়া জাভা হইতে ফিরিয়া গেলেন। জাভা পরিত্যাগ করিবার পূর্বে চীনারা জয়কত্বং ও তাঁহার পুত্রকে নিহত করে। অল্প কয়েকদিনের জন্য কডিরি রাজ্যের যে পুনরুত্থান হইয়াছিল জয়কত্বংএর মৃত্যুর সাথে তাহার সমাপ্তি হইল।

এইরূপে চীনা সৈন্যদের জাভা আক্রমণ শেষ হইল। তাহারা কৃতনগরকে শায়েস্তা করিতে আসিয়াছিল কিন্তু কার্যতঃ তাঁহার শত্রু জয়কত্বংকে নিহত করিয়া তাঁহার বংশকেই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গেল। এই আক্রমণের ফল এই হইল যে বিজয় জাভার অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভুরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং মজপহিতে তাঁহার নতুন রাজধানী স্থাপিত হইল। বিজয় শীঘ্রই চীন সম্রাটের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন; কারণ জাভা হইতে সম্রাটের দরবারে ১২৯৭, ১৩০০ ও ১৩০৮ খ্রীঃ এ দূত প্রেরণ করা হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

৬। জাভা সাম্রাজ্য

বিজয় কৃতরাজস জয়বর্ধন এই নামে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। মজপহিতে নতুন রাজার রাজধানী স্থাপিত হইল এবং ১২৯৪ খ্রী: একখানি লেখতে তিনি নিজেকে অখণ্ড জাভার অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। যদিও রাজধানী পরিবর্তিত হইয়াছিল তথাপি নতুন রাজ্য ও সিংঘসারি রাজ্যকে অবিচ্ছেদ্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে; শুধু জয়কত্বংএর উত্থানের জন্য ইহাদের মধ্যে দুই বছরের ব্যবধান ছিল। কৃতরাজসের নিজকে সিংঘসারি রাজ্যের ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী মনে করিবার একাধিক দাবী ছিল। তিনি পুরানো রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অপুত্রক কৃতনগরের চার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অবশ্য কৃতরাজস নিজের ক্ষমতা-বলেই রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতনগরের কন্যাদের প্রভাবও এই ব্যাপারে তাঁহার সহায় হইয়াছিল। কৃতনগরের কন্যা হিসাবে যে তাঁহাদের প্রভাব যথেষ্ট ছিল তাহা প্রমাণিত হয় যখন কৃতরাজসের মৃত্যুর কয়েক বছর পরে তাঁহার সর্বকনিষ্ঠা রাণী—স্বর্গীয় রাজার রাণী বা রাজমাতা বলিয়া নহে কিন্তু কৃতনগরের কন্যা এই অধিকারে—রাজ্য পরিচালনা করিতে থাকেন। এই রাণীর নাম ছিল গায়ত্রী, কিন্তু সাধারণত: তিনি রাজপত্নী বলিয়া উল্লিখিত হইতেন। এই রাণীর দুই কন্যা ছিল, অপর তিন রাণী নি:সন্তান ছিলেন।

কৃতরাজসের পঞ্চম রাণী ছিলেন মলয়ুর রাজকন্যা। সুমাত্রায় অবস্থিত এই রাজ্যটি কৃতনগর জয় করিয়াছিলেন। জাভার যে সেনাদল এখানে নিযুক্ত ছিল তাহারা স্বভাবতই তাহাদের রাজার আকস্মিক মৃত্যুর খবরে ফিরিয়া আসিবার বন্দোবস্ত করিল। তাহারা তাহাদের সাথে মলয়ুর দুই রাজকন্যাকে নিয়া আসিল, কিন্তু তাহাদের ফিরিবার দশদিন আগেই বিজয় চীনা সৈন্যদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। ছোট রাজকন্যা দর-পেটক ইন্দ্রেশ্বরী নামেও

পরিচিত ছিলেন; কৃতরাজস তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। দর-পেটকের একটি পুত্র হয় এবং এই পুত্রই সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হয়। ১২৯৫ খ্রী: কৃতরাজস এই পুত্রের জয়নগর নাম রাখেন এবং কডিরির রাজকুমার পদে অভিষিক্ত করেন।

কৃতরাজসের রাজত্বকালে বহু গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। ১২৯৫ খ্রী: রাজ্যে বিদ্রোহ হয়। এই বিদ্রোহের নায়ক ছিল রঙ্গ লয়ি। সে প্রথমে প্রধান মন্ত্রীর পদ পাইবার চেষ্টা করে কিন্তু অভীষ্ট পদ লাভে বিফল হইয়া টুবান নামে জায়গায় বিদ্রোহ করে। তাহার সাথে আরও অনেক লোকও যোগ দেয়, কিন্তু অল্পদিনেই এই বিদ্রোহ দমন করা হয় এবং রঙ্গ ও তাহার বেশীর ভাগ অনুচর নিহত হয়। ইহার পরে আসে বীররাজের পালা। বীররাজ সর্বোচ্চ রাজকর্মচারীরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং পূর্ব জাভায় বহু ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজা নির্বাসন কালে তাহাকে অর্দ্ধেক রাজ্য দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এবং সেই তুলনায় এই পদ ও ভূ-সম্পত্তি ছিল নিতান্তই নগণ্য।

বীররাজ বিজয়কে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন তিনি নিজেই সেইরূপ ছলনার আশ্রয় লইলেন। রাজার অনুগ্রহভাজন হইয়া পরে লুময়ঙ্গ নামে জায়গায় বসবাসের অনুমতি চাহিলেন। সেইখানে নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং আর মজপহিতে ফিরিয়া আসেন নাই—এমন কি বছরের অষ্টম মাসে যখন সরকারী দরবার অনুষ্ঠান হয় তখনও তিনি অনুপস্থিত রহিলেন। রাজা এই অবাধ্যতা সহ্য করিয়া যাওয়াতে তখন কোন যুদ্ধ হইল না। ইহার পর রাজার দুঃসময়ের বন্ধু, বীররাজের পুত্র নাম্বি, অসুস্থ পিতাকে দেখিতে যাইবার অজুহাতে রাজার কাছ হইতে বিদায় নিল, এবং লেম্বা নামে একটি জায়গায় একটি দুর্গ বানাইয়া একদল সেনাবাহিনী গঠন করিয়া বসবাস করিতে লাগিল।

সোরো নামে রাজার পুরানো দিনের আর একজন অনুচর বিদ্রোহ করে এবং দুই বছর যুদ্ধের পর তাহাকে পরাস্ত করা হয় (১২৯৮-১৩০০ খ্রী:)। ১৩০২ খ্রীঃ জুরু দেমুং নামে সোরোর এক সঙ্গী বিদ্রোহ করে এবং ১৩১৩ খ্রীঃ তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করা হয়।

১৩০৯ খ্রীঃ কৃতরাজসের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পুত্র জয়নগর রাজা হন। রাজ্য-অভিষেক কালে তাঁহার নাম হয় সুন্দর পাণ্ড্যদেবাধীশ্বর বিক্রমোত্তুঙ্গদেব। এই নামটি দক্ষিণ ভারতের পাণ্ড্য রাজাদের সহিত কোনরূপ সম্পর্কের ইঙ্গিত করে।

এই নতুন রাজার আমলেও একের পর এক বিদ্রোহের কথা জানা যায়। ১৩১১ খ্রীঃ বীররাজের মৃত্যু হয় এবং নাম্বি যে বিদ্রোহ করে তাহাও ১৩১৬ খ্রীঃ পূর্বে সম্পূর্ণরূপে দমন হয় না। আরও অনেক বিদ্রোহ জয়নগরের সময় হয় কিন্তু ১৩১৯ খ্রীঃ কুটি নামে এক ব্যক্তি যে বিদ্রোহ করে তাহা বেশ বিপজ্জনক হইয়া উঠে। যে সাতজন ধর্মপুত্র রাজ্যের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন কুটি তাহাদের মধ্যে একজন। পররতোনে এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে এক বিচিত্র বর্ণনা পাওয়া যায়। ইহাতে বলা হইয়াছে যে এই বিদ্রোহের সময় একদিন রাত্রে গজমদ নামে এক ব্যক্তির অধীনে মাত্র পনরোজন দেহরক্ষী নিয়া রাজা রাজধানী হইতে পলাইয়া যান। গজমদ রাজাকে নিরাপদ স্থানে রাখিয়া রাজধানীতে প্রচার করিলেন যে কুটির পক্ষের লোকেরা রাজাকে হত্যা করিয়াছে। ইহাতে রাজধানীতে হাহাকার রব উঠিল ও ইহা হইতে গজমদ অনুমান করিলেন যে রাজ্যের লোক এখনও রাজার পক্ষে। তখন তিনি মন্ত্রীদের কাছে সত্য কথা প্রকাশ করিলেন এবং মন্ত্রীরা কুটিকে হত্যা করিয়া রাজাকে পুনরায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

এই সকল সাহায্যের জন্য গজমদ উপযুক্ত রূপে পুরস্কৃত হইলেন। তিনি প্রথমে কহুরিপন ও দুই বছর পরে দহ'র শাসনকর্তা নিযুক্ত

হইলেন। প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি এই শেষোক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৩১৯ খ্রীঃ কুটি যে বিদ্রোহ করিয়াছিল তাহাই কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত শেষ বিদ্রোহ।

ওডোরিক অফ্ পর্ডেনন্ (Odoric of Pordenone) ১৩১১ খ্রীঃ মালয় দ্বীপপুঞ্জে আসেন। তাঁহার লেখায় সেই সময়কার জাভার কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। ইহাতে বলা হইয়াছে যে জাভার রাজার আধিপত্য আরও সাতটি রাজ্যের উপর বিস্তৃত ছিল। এই রাজ্য জনবহুল ছিল এবং এখানে মশলা ইত্যাদি উৎপন্ন হইত। রাজ-প্রাসাদ সোনা, রূপা ও নানারূপ মূল্যবান পাথর দিয়া সুসজ্জিত ছিল।

১৩২৩ খ্রীঃ রচিত একটি লেখ হইতে সেই সময় জাভার রাজ-নৈতিক প্রতিষ্ঠার কিছু আভাস পাওয়া যায়। ইহাতে বলা হইয়াছে যে জাভা রাজ্য সমস্ত জাভা দ্বীপটি লইয়া গঠিত এবং মাদুরা, বোর্ণিও প্রভৃতি রাজ্যগুলি ইহার অধীন। পশ্চিমে জাভা যে সকল রাজ্য জয় করিয়াছিল সেগুলি এই সময় তাহার অধীনে না থাকিলেও পূর্বদিকে জাভার ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। চীনের সহিত ও তাহার সম্পর্ক ভাল ছিল এবং এখান হইতে নিয়মিত চীনে দূত পাঠানো হইত।

পররতোনে বলা হইয়াছে যে জয়নগরের রাজত্বের শেষভাগে আবার নানা অশান্তি সুরু হইয়াছিল এবং ১৩২৮ খ্রীঃ জয়নগর আততায়ীর হাতে নিহত হন। পনতরনে যে মন্দিরগুলি দেখা যায় তাহার কতকগুলি জয়নগরের সময়ে নির্মিত।

জয়নগরের কোন পুরুষ উত্তরাধিকারী না থাকায় তাঁহার সিংহাসনের নিকটতম উত্তরাধিকারিণী হইলেন রাজপত্নী। ইনি কৃতনগরের কন্যা ও কৃতরাজসের পত্নী। কিন্তু তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর জীবন গ্রহণ করায় তাঁহার কন্যা ত্রিভুবনোত্তুঙ্গদেবী জয়বিষ্ণুবর্ধনী মাতার প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন। পরবর্তীকালে ইনি জীবন বা

কহুরিপনের রাজকুমারী (Bhre Kahuripan) এই নামে পরিচিত ছিলেন ; রাজপ্রতিনিধিত্ব শেষ হইবার পরে—বোধহয় আগেও—তাঁহার এই উপাধি ছিল। রাজপ্রতিনিধি থাকাকালে ইনি মজপহিতের রাণী নামে পরিচিত ছিলেন এবং সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী ইঁহার পুত্র 'জীবনের রাজকুমার' নামে পরিচিত ছিল। রাণীর ব্যক্তিগত নাম ছিল গীতার্জা।

১৩৩১ খ্রী: বেস্থুকির কাছে সাদেং ও কেত নামে দুইটি জায়গায় বিদ্রোহ দেখা দিল, কিন্তু রাজপক্ষের সৈন্যদল তাহা দমন করিল। এই বছরই দহর শাসক গজমদ প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হইলেন। এই সময় হইতে গজমদ রাজ্যশাসন ব্যাপারে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিলেন। তিনি দ্বীপপুঞ্জের অনেকগুলি দ্বীপ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ১৩৪৩ খ্রীঃ বলির বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠানো হয় এবং এই দ্বীপটি পরাজিত হয়।

১৩৫০ খ্রীঃ রাজপত্নীর মৃত্যু হয়। ত্রিভুবনোত্তুঙ্গদেবীর পুত্র কুমার হয়ম বুরুক্ (Hayam Wuruk) মাতামহীর মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় তাঁহার মাত্র ষোল বছর বয়স ছিল এবং অভিষেককালে তাঁহার নামকরণ হয় রাজসনগর। অবশ্য তাঁহাকে হয়ম বুরুক্ নামেই উল্লেখ করা হইত।

এই রাজার রাজত্বের প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৩৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সহিত এক সুন্দ রাজকুমারীর বিবাহ। বিবাহের কথা মোটামুটি ঠিক হইয়া গেলে সুন্দ দেশের রাজা—যাঁহাকে মহারাজা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে—তাঁহার মেয়েকে সঙ্গে করিয়া মজপহিতের কাছে বুবত নামে জায়গায় আসিলেন, কিন্তু এই সময় মতবিরোধ দেখা দিল। সুন্দ দেশের রাজা দাবী করিলেন যে তাঁহার কন্যাকে অধীনস্থ রাজার কন্যা হিসাবে ধরা হইবে না এবং বিবাহের অনুষ্ঠানাদি দুই সমপর্যায়ের রাজার মধ্যে যেমন হয় সেই রকম হইবে। মজপহিত রাজ্যের

লোকেরা অধীনস্থ রাজার কন্যাকে তাহাদের রাজা বিবাহ করিতেছেন এই ভাবই উৎসবের মধ্যে প্রচার করিতে চাহিল। সুন্দদেশের লোকেরা এই অপমান সহ্য করিতে রাজী হইল না এবং রাজকুমারীর বিবাহ দিতে অস্বীকার করিল। ইহাতে মজপহিতের সৈন্যরা তাহাদের ঘেরাও করিল কিন্তু সুন্দদেশের রাজপুরুষেরা অপমান সহ্য করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয় মনে করিলেন, এবং অসম সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রতিটি লোক মৃত্যু বরণ করিলেন।

রাজসনগরের রাজ্যকাল তাঁহার দৃঢ় সাম্রাজ্যবাদের জন্য বিখ্যাত এবং ১৩৫৭ খ্রীঃ সুন্দদের বিরুদ্ধে আক্রমণশীল নীতি ইহারই একটি নিদর্শন। এই বছরই ডোম্বো (Dombo) দ্বীপ জয় করার উদ্দেশে সৈন্য পাঠান হয় এবং তাহারা সাফল্য লাভ করে। অন্যান্য সব বিজয়ের কথা বিস্তৃত ভাবে জানা যায় না, তবে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে ইঁহার রাজ্যকালে জাভারাজ্য ক্ষমতায় এই দ্বীপপুঞ্জে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিল এবং সমস্ত প্রধান প্রধান দ্বীপগুলি ও মালয় উপদ্বীপের অনেক অংশ ইহার অধীন ছিল। তবে একথা মনে রাখিতে হইবে যে এই সমস্ত রাজ্যগুলিকে জাভারাজ্যের অন্তর্গত ধরা হইত না এবং ইহাদের শাসনকার্যও জাভারাজ্যদ্বারা পরিচালিত হইত না। কিন্তু মজপহিতের রাজাকে ইহারা প্রধানের সম্মান দিয়াছিল এবং তাঁহার শক্তিশালী নৌবহর এই সমস্ত রাজ্যগুলির উপর তাঁহার প্রভুত্ব বজায় রাখিতে এবং বাহিরের শত্রুদের হাত হইতে ইহাদের রক্ষা করিতে সাহায্য করিত। এই সমস্ত অধীন রাজ্যের রাজারা তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য কর ও অন্যান্য যাহা কিছু দিতে স্বীকৃত ছিলেন সমস্তই ঠিকমত দিতেন, কিন্তু তাঁহাদের নিজেদের রাজ্যের আভ্যন্তরিক শাসন ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন।

রাজসনগরের রাজত্বকালে ১৩৬৫ খ্রীঃ এ রচিত কাব্য 'নাগরকৃতাগমে' এই সব অধীন রাজ্যগুলির একটি বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

এই বৃহৎ তালিকা হইতে দেখা যায় যে একমাত্র ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ছাড়া সমস্ত মালয় উপদ্বীপ ও মালয় দ্বীপপুঞ্জ জাভার মজপহিত সাম্রাজ্যের অধিনায়কত্ব স্বীকার করিয়াছিল। অন্যান্য যে সকল প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতেও জাভার এই সময়কার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। জাভা এই সময় আন্তর্জাতিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। নাগরকৃতাগমে বলা হইয়াছে যে শ্যাম ও তাহার সহিত অযোধ্যাপুর (অয়ুথিয়া),এবং ধর্মনগরী (লিগোর), মার্তাবান, রাজপুর, সিংঘনগরী, কম্বোজ ও যবন (উত্তর ভিয়েৎনাম) প্রভৃতি প্রতিবেশী দেশগুলির সহিত মজপহিত সাম্রাজ্যের বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল।

এই কাব্যের অন্তর্গত যে কয়টি দেশের নাম উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা ছাড়া আরও কয়েকটি দেশের নাম কাব্যে আছে। ইহাদের সাথে মজপহিত রাজ্যের বাণিজ্য উপলক্ষে সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, এবং এইসব দেশগুলি হইতে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ শ্রমণেরা জাভার রাজধানীতে আসিতেন। এই কাব্যের বর্ণনায় দেখা যায়— "জম্বুদ্বীপ, কম্বোজ, চীন, যবন, চম্পা, কর্ণাটক, গৌড় এবং শ্যাম প্রভৃতি দেশ হইতে সর্বদাই অসংখ্য লোক আসিত। তাহারা তাহাদের পণ্যদ্রব্য লইয়া জাহাজে করিয়া আসিত। সাধু ও বিখ্যাত ব্রাহ্মণরাও এইসব দেশ হইতে আসিতেন এবং তাঁহারা যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা পাইতেন"। জম্বুদ্বীপ বলিতে ভারতবর্ষকেই বুঝাইয়াছে, কিন্তু কর্ণাট ও গৌড় এই তুইটি দেশের নাম আলাদা উল্লেখ করার অর্থ বোধ হয় এই যে বাংলা ও কানাড়া প্রদেশের সহিত জাভার বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। জাভাবাসীদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা ছিল এবং নাগর-কৃতাগমে এক জায়গায় বলা হইয়াছে যে জম্বুদ্বীপ ও জাভা এই তুইটি দেশ শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়া সমান। তুই দেশের মধ্যে যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল তাহা বোঝা যায়, কারণ কাঞ্চীদেশের (কাঞ্জিভরম্) সাধু বুধাদিত্য এবং মুতালি সহৃদয় নামে একজন ব্রাহ্মণ (সম্ভবত

তামিল ব্রাহ্মণ) জাভার রাজার প্রশংসা করিয়া কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

সকল দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে রাজসনগরের সময় জাভা ক্ষমতা ও গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। এই ক্ষমতা লাভ করিয়া রাজ্য পরিচালনা করিবার ব্যবস্থাও নিখুত ভাবে করা হইয়াছিল। এইরূপে সুষ্ঠুভাবে রাজ্যপরিচালনার ব্যবস্থা করিবার বেশীর ভাগ কৃতিত্ব গজমদের। একজন সাধারণ লোকের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া নিজের ক্ষমতাবলে তিনি প্রধান মন্ত্রীর আসন লাভ করিয়াছিলেন এবং অসাধারণ অধ্যবসায় ও বুদ্ধিবলে এই গুরুদায়িত্ব শৃঙ্খলার সহিত পালন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ১৩৬৪ খ্রীঃ গজমদের মৃত্যুর পর কোন প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয় নাই। রাজা, তাঁহার পিতা ও মাতা, কাকা ও কাকী, এবং রাজার দুই ভগ্নী ও তাঁহাদের স্বামীদ্বয়কে লইয়া একটি মন্ত্রণাসভা গঠিত হইয়াছিল এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান বিষয়ের ব্যবস্থা এই সভা দ্বারা পরিচালিত হইত।

কিন্তু ১৩৭১ খ্রীঃ এ গজ এঙ্গোম নামে এক ব্যক্তিকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করা হয়। এই ব্যক্তি রজসনগরের রাজত্বের শেষ আঠারো বছর ও তাঁহার পরবর্তী রাজার রাজ্যকালেও ১৩৯৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৩৯৮ খ্রীঃ ইঁহার মৃত্যু হয়।

৭। জাভা সাম্রাজ্যের পতন

রাজসনগর বহুদিন ধরিয়া একটি সমৃদ্ধ রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অধীনে মজপহিত একটি বিশাল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু বহু যত্নে ও অধ্যবসায়ে যে সাম্রাজ্য তিনি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন শেষ বয়সে তাঁহার একটি দুর্বলতা সেই সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হইল। ইহা ভালভাবে বুঝিতে হইলে রাজ পরিবার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। রাজার প্রধান

রাণী পরমেশ্বরী দেবীর কুসুমবর্ধনী নামে একটি মাত্র কন্যা ছিল। রাণীর ভগ্নী পজঙ্গের রাজকুমারী ঈশ্বরীর বীরভূমির রাজকুমারী নাগরবর্ধনী নামে এক কন্যা ও মতরামের রাজকুমার বিক্রমবর্ধন নামে এক পুত্র ছিল। কুসুমবর্ধনীর সহিত বিক্রমবর্ধনের বিবাহ হইল ও তিনি এইরূপে সিংহাসনের পরবর্তী উত্তরাধিকারী হইলেন। রাজসনগরের উপপত্নীর গর্ভে একটি ছেলে হইয়াছিল। রাজা এই ছেলের সাথে নাগরবর্ধনীর বিবাহ দিলেন ও তাহাকে বীরভূমির কুমার রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। আবার 'দহ'র রাজকুমারী ইহাকে পোষ্যপুত্র রূপে গ্রহণ করিলেন। তাহাকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য রাজা তাহাকে পূর্ব জাভার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন।

নামে অধীন থাকিলেও বীরভূমির কুমার প্রায় স্বাধীন ভাবেই শাসনকার্য নির্বাহ করিতেন। এমন কি রাজসনগরের জীবিতকালেই চীনা বিবরণে জাভায় দুইজন রাজা রাজত্ব করে বলিয়া বলা হইয়াছে এবং দুইজনই সম্রাটের দরবারে দূত পাঠাইতেন। এইভাবে অন্তর্যুদ্ধের ব্যবস্থা এই সময় হইতেই হইয়া থাকিল এবং পরবর্তীকালে এই যুদ্ধে যে শুধু মজপহিত রাজ্যের শেষ হইল তাহা নহে এই সাথে জাভায় হিন্দু রাজ্য ও সংস্কৃতিরও অবসান হইল।

১৩৮৯ খ্রীঃ এ রাজসনগরের মৃত্যু হইলে বিক্রমবর্ধন মজপহিতের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইনি হ্যং-বিশেষ (Hyang Visesha) নামেও পরিচিত ছিলেন। রাজসনগরের জীবিতকালেই বীরভূমির কুমার পূর্ব জাভায় স্বাধীন রাজার ন্যায় রাজত্ব করিতেন, কাজেই তাঁহার মৃত্যুর পর এই দুই রাজ্যের সম্পর্কের যে বিশেষ উন্নতি হইল না তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ১৪০১ খ্রীঃ এ বিক্রমবর্ধন ও বীরভূমির রাজকুমারের মধ্যে এক যুদ্ধ হয়, কিন্তু ইহা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। ইহার পর আবার ১৪০৪ খ্রীঃ এ বা ইহার কিছু আগে দুইজনের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং প্রথমে বিক্রমবর্ধনের হার হয় এবং তিনি রাজ্য ত্যাগ করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু এই সময় তাঁহার

পুত্র ভ্রে টুমাপল ও জামাতা ভ্রা পরমেশ্বর, জাভার দুইজন শক্তিশালী অধিনায়ক, তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হন। অবশ্য তাঁহারা এই যুদ্ধের প্রথম দিকে কোনরূপ অংশ লন নাই। ইঁহাদের সাহয্যে রাজা বীরভূমির কুমারকে পরাজিত করেন এবং কুমার রাত্রিবেলা জাহাজে করিয়া পলায়ন করেন। তবে শেষ পর্যন্ত ধৃত ও নিহত হন এবং তাঁহার ছিন্ন মস্তক মজপহিতে লইয়া আসা হয়। ইহা ১৪০৬ খ্রীঃ এর ঘটনা।

বীরভূমির কুমারের পরাজয় ও মৃত্যুতে জাভা রাজ্যের একতা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু প্রায় পচিশ বছর ধরিয়া আভ্যন্তরিক বিক্ষোভ ও শেষে অন্তর্যুদ্ধ, এই সব কারণে জাভা রাজ্যের সৈন্যবল ও অর্থবল উভয়ই হ্রাস হয় এবং রাজ্যটি দুর্বল হইয়া পড়ে। ইহার ফলে জাভা সুবর্ণদ্বীপে যে রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল তাহা শেষ হইল। শ্রেষ্ঠ ক্ষমতার সম্মান এখন হইতে চীন পাইতে লাগিল এবং ক্রমশঃ অন্যান্য নতুন রাজ্য ও বাণিজ্য-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া অল্প-দিনের মধ্যেই জাভার পূর্ব গৌরব আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

পঞ্চদশ খ্রীঃ এর গোড়ার দিকেই আন্তর্জাতিক ক্ষমতা হিসাবে জাভার পতন হয়। চতুর্দশ খ্রীঃ এর মাঝামাঝি হইতে যে রাজ্যগুলি জাভার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইয়াছিল তাহাদের কয়েকটির এই সময়কার অবস্থা পর্যালোচনা করিলে ইহা বেশ পরিস্কারভাবে বোঝা যায়।

(১) পশ্চিম বোর্ণিও (পু-নি, Pu-ni)—১৩৭০ খ্রীঃ এ পু-নির রাজা জাভার রাজার ভয়ে চীনের দরবারে সোজাসুজি কোন দূত পাঠাইতে সাহস পাইতেন না। কিন্তু মিং (Ming) রাজবংশের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে ১৪০৫ খ্রীঃ এ পু-নির রাজা শুধু যে চীনের সম্রাটের অনুমতিক্রমে রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন তাহাই নয়, তিনি সম্রাটকে সম্মান দেখাইবার জন্য সপরিবারে চীনে যাত্রা করিলেন। ইহার পর হইতে পু-নির রাজারা চীনের সম্রাটকে

নিয়মিত কর দিতেন এবং সময়ে সময়ে দরবারে উপস্থিত থাকিতেন।

(২) সান-ফোৎ-সি—এই একই চীনা ইতিহাস হইতে জানা যায় যে যদিও জাভা সান-ফোৎ-সি রাজ্য সম্পূর্ণ জয় করিয়াছিল তথাপি সমস্ত রাজ্যটি তাহার অধীন রাখিতে সক্ষম হয় নাই। এই দেশে দুইজন চীনা দুইটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। জাভার আনুগত্য স্বীকার করিলেও তাহারা নিয়মিত চীনের দরবারে কর ও দূত পাঠাইত। ১৪২৪ খ্রীঃএ এখানকার এক রাজা তাঁহার পিতার সিংহাসনে বসিবার আগে চীন-দরবারের অনুমতি চাহিয়া লইয়াছিলেন। ইহা হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে পঞ্চদশ খ্রীঃ এ জাভা নামে মাত্র এই দেশের অধিকারী ছিল।

এই সময় সুমাত্রা ও মালয় উপদ্বীপেরও অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য জাভার বদলে চীনের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইল। এ'সমস্তই আন্তর্জাতিক ক্ষমতা হিসাবে জাভার যে অবনতি ঘটিয়াছিল তাহার প্রমাণ। সকলের সম্মতিক্রমেই চীন এখন হইতে শ্রেষ্ঠ ক্ষমতার আসন লাভ করিল। জাভা নীরবেই চীনের এই নূতন ভূমিকা মানিয়া নিল এবং নিজেকে এই নতুন পরিস্থিতিতে মানাইয়া লইল।

বিক্রমবর্ধনের রাজ্যকাল নিজ রাজ্যে ও বাহিরে এই উভয় ক্ষেত্রেই অগৌরবের মধ্যে শেষ হইল। অন্তর্যুদ্ধ ছাড়াও ১৪১১ খ্রীঃ এ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে ও ১৪২৬ খ্রীঃ এ দারুণ দুর্ভিক্ষে জাভা রাজ্যের ভীষণ ক্ষতি হইয়াছিল। কনক নামে এক নতুন প্রধান মন্ত্রী ১৪১৩ হইতে ১৪৩০ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজকার্য পরিচালনা করেন। ১৪২৯ খ্রীঃ বা ইহার কিছু আগে রাজার মৃত্যু হয়।

বিক্রমবর্ধনের পরে সম্ভবত তাঁহার কন্যা সুহিতা সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার মাতা উচ্চ বংশীয়া ছিলেন এবং এই অধিকারে তাঁহার দুই ভাই থাকা সত্ত্বেও তিনিই সিংহাসন লাভ করেন।

সুহিতার রাজ্যকালে কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া জানা যায় না এবং ১৪৩৭ খ্রীঃ নিঃসন্তান অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

ভ্রি টু'মাপেল নামে তাঁহার দুই ভাই ছিল, সম্ভবত ইহাদের মধ্যে ছোট-জনই তাঁহার মৃত্যুর পর রাজ্যলাভ করেন। এই রাজার নাম ছিল শ্রীকৃত-বিজয় এবং চার বছর রাজত্ব করিয়া ইনি ১৪৫১ খ্রীঃ মারা যান।

এই রাজার মৃত্যুর ঠিক পরবর্তী অবস্থার যে বিবরণ পররতোনে পাওয়া যায় তাহা হইতে কিছু পরিস্কার বোঝা যায় না। যতদূর অনুমান করা যায় তাহাতে মনে হয় যে ১৪৫১ হইতে ১৪৭৮ খ্রীঃ এর মধ্যে পর পর তিনজন রাজা সিংহাসন লাভ করেন এবং শেষ রাজার সময়ে জাভা বাহিরের শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়। ১৪৮৬ খ্রীঃ দহর রাজা গিরীন্দ্রবর্ধন রণবিজয়ই জাভার শেষ হিন্দু রাজা, যাঁহার সম্বন্ধে কোন প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার পর মুসলমানদের কাছে পরাজিত হওয়া পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ কি চল্লিশ বছর জাভায় হিন্দু-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। জাভা হইতে চীনে ১৪৯৯ খ্রীঃএ শেষবারের মত দূত পাঠানো হয় এবং ১৫১৩-১৫ খ্রীঃ পর্যন্ত যে জাভায় হিন্দু-রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল তাহা নিশ্চিত জানা যায়।

৮। রাজ্যশাসন প্রণালী

রাজনৈতিক মতবাদ ও রাজ্যশাসন সম্বন্ধে প্রাচীন জাভা ভাষায় রচিত তিনটি বই পাওয়া যায়। এইগুলি উচ্চ ও উদার রাজনৈতিক আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত।

(১) কামন্দক—এই প্রাচীন পুস্তকে ভগবান্ কামন্দক তাঁহার শিষ্যদের কাছে রাজার কি কর্তব্য তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই পুস্তক রাজনীতি নামেও পরিচিত ছিল। রাজনীতির আদর্শ বুঝাইবার জন্য মহাভারত ও রামায়ণের চরিত্রগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে। যুধিষ্ঠির একজন আদর্শ রাজা হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছেন।

(২) ইন্দ্রলোক—এই পুস্তকে ভগবান্ ইন্দ্রলোক তাঁহার শিষ্য কুমারযজ্ঞকে রাজনীতি সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছেন।

(৩) নীতিপ্রয়—এই পুস্তকে শত্রুর প্রতি কি কর্তব্য সে সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহা ব্যাস বিষ্ণুর নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন।

রাজ্যশাসন নীতির মূল কথা ছিল রাজার পূর্ণ ক্ষমতা। অন্য কোন রকম শাসননীতি কখনও প্রচারিত হয় নাই এবং রাজার স্বেচ্ছাচারে কোনরকম বাধা দেওয়া সম্ভব বা প্রয়োজন আছে এই ধরণের কোন মতবাদের কোথাও কোন উল্লেখ নাই। সাধারণতঃ রাজাকে ভগবানের অংশ বিশেষ বলিয়া মান্য করা হইত এবং মনু-সংহিতায় রাজাকে যে ভগবানের অংশ বলা হইয়াছে সেই নীতি জাভায় সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল। মৃত্যুর পরে রাজাকে দেবতারূপে কল্পনা করিয়া এই মতবাদকে আরও স্পষ্টভাবে প্রমাণ করা হইয়াছে। মৃত্যুর পরে রাজার আকৃতির অনুরূপ মূর্তি গড়িয়া যেস্থানে রাজাকে সমাহিত করা হইয়াছে এই মূর্তিকে সেই স্থানের দেবতা বলিয়া উল্লেখ করা হইত।

রাজ্য শাসন ব্যবস্থা মোটামুটি ভারতীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত হইত। রাজা রাজ্যের প্রধান ছিলেন। বড় বড় রাজ্যগুলি ছোট ছোট অংশে বিভক্ত ছিল এবং প্রতিটি অংশ শাসনের জন্য রাজা একজন করিয়া শাসক নিযুক্ত করিতেন। এই অংশগুলি কয়েকটি ছোট ছোট গ্রাম লইয়া গঠিত হইত আর গ্রামগুলি গ্রামের প্রধান ব্যক্তির অধীন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন নীতিতে পরিচালিত হইত।

রাজার অধীনে নানা শ্রেণীর বহু কর্মচারী নিযুক্ত হইত। তবে ইহাদের সংজ্ঞা ও সংখ্যা বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখা যায়। পূর্ব জাভার লেখগুলিতে বহু সংখ্যক কর্মচারীর বিবরণ পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে প্রায় সব নামই জাভা ভাষায় দেওয়া আছে। ভারতীয় নামের মধ্যে মন্ত্রী ছাড়া সেনাপতি ও সেনপতি সর্বজল অর্থাৎ নৌ-সেনাপতির নাম দেখা যায়। এই লেখগুলিতে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে যে পদ্ধতি বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা সামান্য পরিবর্তিত বা কখনও একটু রূপান্তরিত করিয়া প্রায় সমস্ত হিন্দু যুগ ধরিয়া অনুসরণ করা

হইয়াছিল। রাজার পরেই উচ্চস্থান অধিকার করিতেন তিনজন প্রধান মন্ত্রী, ইঁহাদের মন্ত্রী হিনো, মন্ত্রী সিরিকন ও মন্ত্রী হলু বলা হইত। মন্ত্রীদের পরে ছিলেন তিনজন প্রধান কার্য-পরিচালক যথা রক্রিয়ন মপতিং, রক্রিয়ন দেমুং ও রক্রিয়ন কনুরুহন্। ক্রমশঃ সমস্ত শাসন ক্ষমতা রক্রিয়নরাই অধিকার করেন এবং পরবর্তীকালে তাঁহাদের সংখ্যা পাঁচ বা কখনও কখনও সাতটিও দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সব উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ছাড়া ধর্মাধিকরণ ও ধর্মাধ্যক্ষ নামে অন্য দুই শ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত করা হইত। ধর্মাধিকরণরা ভারতবর্ষের মতই এখানেও বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। দুইজন ধর্মাধ্যক্ষের মধ্যে একজন শৈব ও আর একজন বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলির তত্ত্বাবধান করিতেন।

মোটের উপর জাভার রাজ্যশাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে এ'কথা বলা যায় যে রাজার অধীনে যথেষ্ট শৃঙ্খলা ও কৃতিত্বের সহিত রাজ্য শাসন কার্য-নির্বাহ হইত।

সাম্রাজ্য পরিচালনা ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এক বলিদ্বীপ ছাড়া আর অন্য কোন অধীন দেশের শাসনকার্য জাভার রাজধানী হইতে সোজা-সুজি পরিচালনা করা হইত না। অধীন রাজ্যগুলি মজপহিতের আনুগত্য স্বীকার করিয়া নিয়মিত রাজস্ব ও অন্যান্য যাহা প্রাপ্য তাহা দিত, কিন্তু নিজেদের আভ্যন্তরিক শাসন ব্যবস্থায় তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। মজপহিত হইতে ভুজঙ্গ ও মন্ত্রীরা কর আদায়ের উদ্দেশে এইসব রাজ্যগুলিতে আসিতেন ও সম্ভবত এই সময়ে ভুজঙ্গরা ধর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে সমস্ত ভূসম্পত্তি দান করা হইত সেগুলিও পরিদর্শন করিয়া যাইতেন।

চতুর্থ অধ্যায়

সুবর্ণদ্বীপে হিন্দু শাসনের অবসান

১। সুমাত্রায় ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব

সুমাত্রা ও মালয় উপদ্বীপের যে সব ছোট ছোট রাজ্যগুলি শৈলেন্দ্র পতাকাতলে মিলিত হইয়াছিল শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের পতনের ফলে সেগুলির বন্ধন আবার ছিন্ন হইয়া গেল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সুমাত্রায় আবার একটি নূতন শক্তির আবির্ভাব হইল এবং ইহা নতুন করিয়া রাজ্য গঠনে উদ্‌যোগী হইল। এই রাজ্যটির নাম মলয়ু। সাধারণতঃ সুমাত্রার পূর্ব উপকূলে আধুনিক জাম্বিতে ইহা অবস্থিত ছিল বলিয়া নির্ধারণ করা হয়। সপ্তম খ্রীঃ এ ইহার অস্তিত্ব ছিল ও শ্রীবিজয় রাজ্যের দ্বারা ইহা জয় করার কথা আগেই বলা হইয়াছে। সেই সময় হইতে একাদশ খ্রীঃর পূর্ব পর্যন্ত মলয়ুতে পৃথক কোন রাজ্য ছিল বলিয়া জানা যায় না, কিন্তু ১০৭৯ ও ১০৮৮ খ্রীঃ এ দুইবার দুইজন দূত এই রাজ্য হইতে চীনে পাঠানো হয়। এয়োদশ খ্রীঃ তে জাভার রাজা কৃতনগরের কাছে এই রাজ্য পরাজিত হয়। কৃতনগরের অপঘাত মৃত্যুর সুযোগে মলয়ু আবার স্বাধীন হয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই এতদূর শক্তিশালী হইয়া উঠিল যে মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত ছোট ছোট রাজ্যগুলির দখল লইয়া শ্যামদেশের সহিত বিবাদের সৃষ্টি করিল।

এয়োদশ খ্রীঃর শেষ দিকে শৈলেন্দ্রদের পতন হইবার পর শৈলেন্দ্ররা এই অঞ্চলে যে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই স্থান অধিকার করিবার জন্য মলয়ুর এই নতুন রাজ্য প্রবৃত্ত হইল। আগেই বলা হইয়াছে যে জাভার আনুকূল্যে এই রাজ্যের পত্তন হয় এবং বহুদিন পর্যন্ত এই দুই রাজ্যের মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল। কৃতনগরের

মৃত্যুর পর যখন জাভার সৈন্যরা মলয়ু হইতে চলিয়া আসে তখন তাহারা তাহাদের সাথে মলয়ুর দুইজন রাজকন্যাকেও নিয়া যায়। ইহাদের মধ্যে ছোট দরপেটকের সাথে জাভার রাজার বিবাহ হয় বড় রাজকন্যা দরজিঙ্গের দেব নামে এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ হয় এবং ইহাদের পুত্র তুহন জনক পরে মলয়ুর রাজা হন। তুহন জনকের অপর নাম ছিল শ্রীমর্মদেব। সম্ভবতঃ কৃতনগরের অধীনে ১২৮৬ খ্রীঃএ মৌলিবর্মদেব নামে যে রাজা মলয়ুতে রাজত্ব করিতেন তাঁহার মৃত্যুর পর শ্রীবর্মদেব মলয়ু রাজ্য লাভ করেন। ১২৯২ খ্রীঃএ মার্কোপোলোর বিবরণ হইতে জানা যায় যে মলয়ু সেই সময়ে একটি বর্দ্ধিষ্ণু রাজ্য ও সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল।

ইহার পরে মলয়ুর যে রাজার কথা জানা যায় তাঁহার নাম আদিত্য বর্মদেব। আদিত্যবর্মণ তান্ত্রিক বৌদ্ধ ছিলেন এবং অন্ততঃ পক্ষে আঠাশ বছর (১৩৪৭-১৩৭৫ খ্রীঃ) রাজত্ব করেন। তাঁহার সময়ে মধ্য সুমাত্রার প্রায় সমস্ত অংশই মলয়ু রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। নাগর-কৃতাগম হইতে জানা যায় যে এই সময়েও মলয়ু জাভার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিত। ইহা সত্য হইলেও মলয়ু তখন নামে মাত্র জাভার অধীন ছিল! এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে নাগরকৃতাগমে সুমাত্রাকে মলয়ু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং ইহা পরোক্ষভাবে সেই সময় মলয়ু যে সুমাত্রার রাজ্যগুলির মধ্যে প্রধান রাজ্য ছিল তাহা প্রমাণ করে।

মলয়ুরাজ্যের প্রভাব উত্তর সুমাত্রায় বিশেষ বিস্তার লাভ করে নাই। এই সময় সুমাত্রার উত্তর অংশ ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল, ইহারা নিজেদের সুবিধামত কখনও জাভা কখনও বা চীনের অধীনতা নামে মাত্র স্বীকার করিত, এবং বেশীর ভাগ সময় নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকিত। এই দ্বন্দ্বের সুযোগে ধীরে ধীরে ইস্‌লাম এখানে রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিল এবং ভবিষ্যতে এই ধর্ম প্রায় সমগ্র সুবর্ণদ্বীপে প্রচারিত হইল।

রাজনীতির ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের প্রথম স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় মার্কোপোলোর বিবরণীতে (১২৯২ খ্রীঃ)। এই বিবরণী হইতে জানা যায় যে এখানে আটজন রাজার অধীনে আটটি রাজ্য অবস্থিত ছিল। ইহাদের মধ্যে মার্কোপোলো নিজে যে ছয়টি রাজ্যে গিয়াছিলেন তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। ছয়টি রাজ্যের মধ্যে ফের্লেক নিঃসন্দেহে উত্তর-পূর্বে অবস্থিত পের্লক (Perlak) রাজ্য, এবং লামব্রি (Lambri) উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত লামুরি (Lamuri) বা অটজে (অচে)। এই দুইয়ের মধ্যে অবস্থিত অন্য দুইটি রাজ্য—বস্‌ম(Basma) ও সমর (Samara)—সম্ভবতঃ পসে (Pase) ও সমুদ্র (Samudra)।

একমাত্র ফের্লেক রাজ্যের রাজা ছাড়া অন্য সকল রাজ্যের রাজগণ নিজেদের চীন সম্রাট কুবলাই খাঁর অধীন বলিয়া স্বীকার করিতেন। অবশ্য নীচে উদ্ধৃত মার্কোপোলোর বর্ণনা হইতে ইহাদের আনুগত্যের রূপ যে কি ছিল তাহার কিছুটা অনুমান করা যায়। মার্কোপোলো লিখিয়াছেন, "যদিও এই সব রাজারা নিজেদের কুবলাই খাঁর অধীন বলেন কিন্তু তাঁহারা কুবলাই খাঁকে কোনরূপ কর দেন না, বস্তুতঃ তাঁহাদের রাজ্যগুলি এতদূরে অবস্থিত যে চীন সরকারের কোন কর্মচারী সেখানে যায় না। তবুও এ'দ্বীপের অধিবাসীরা নিজেদের চীনের অধীন বলিয়া পরিচয় দেয় এবং মাঝে মাঝে এখান হইতে উপহার স্বরূপ কিছু জিনিষপত্র চীন দরবারে পাঠানো হয়।"

ফের্লেক সম্বন্ধে মর্কোপোলো বলিয়াছেন, "এই রাজ্যে এত অধিক সংখ্যায় মুসলমান বণিক সব সময়ে আসিত যে তাহারা এখানকার অনেক বাসিন্দাকে ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছে।"

ইহা হইতে বোঝা যায় যে ১২৯২ খ্রীঃ মার্কোপোলো যখন সুমাত্রায় আসিয়াছিলেন তখন কেবলমাত্র পের্লক রাজ্যই ইস্‌লাম রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। কয়েক বছরের মধ্যেই সমুদ্র রাজ্যও ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করে। যদিও এটি একটি ছোট রাজ্য ছিল তথাপি ইহার নাম অনুসারে পরে সমস্ত দ্বীপটির নামকরণ হইয়াছিল।

১৩৪৬ খ্রীঃএ ইবন্ বতুতা (Ibn Batutah) সমুদ্র রাজ্যে যান। ইহাকে তিনি সুমুদ্ররাজ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ রাজ্যের মুসলমান রাজা সুলতান মালিক অজ-জাহির তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। ইবন্ বতুতা সুলতানকে মহান ও উদারচেতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার রাজ্যের আয়তন সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেন নাই। তবে এই রাজ্যের চারিদিকে যে হিন্দুরাজ্য অবস্থিত ছিল তাহা বোঝা যায়, কারণ তাঁহার বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে সুলতানের সহিত প্রায়ই প্রতিবেশী পৌত্তলিক রাজ্যগুলির যুদ্ধ হইত এবং পরাজিত হইয়া তাহারা শান্তি স্থাপনের জন্য সুলতানকে কর দিত।

ইবন্ বতুতার বিবরণ হইতে বোঝা যায় যে মুসলমানেরা ধীরে ধীরে উত্তর সুমাত্রায় রাজনীতিক শক্তি বিস্তার করিতেছিল। তবে দূর প্রাচ্যে ইস্‌লাম ধর্ম যে আরব নহে, ভারতবর্ষ হইতে প্রচারিত হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সমুদ্র-পসের সুলতানের সমাধি নির্মাণের জন্য যে ধরণের পাথর ব্যবহার করা হইয়াছিল তাহা গুজরাটে পাওয়া যায় এবং নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে ঐগুলি ঐখান হইতে আনা হইয়াছিল। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে গুজরাট ও সুমাত্রার মধ্যে নিয়মিত বাণিজ্য চলিত এবং পরোক্ষ ভাবে ইহাও দূর প্রাচ্যে ইস্‌লাম ধর্ম প্রচারে সাহায্য করিয়াছিল।

সুমাত্রায় ইস্‌লাম ধর্ম প্রতিষ্ঠালাভের কারণ হিসাবে বলা যাইতে পারে যে এই সময়ে কেডার (Kedah) পরে পসে (সুমাত্রার অন্তর্গত) প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। পঞ্চদশ খ্রীঃএ মলাক্কা (Malacca) পসের স্থান অধিকার করে ও প্রধান মুস্‌লিম রাজ্যের ভূমিকা গ্রহণ করে। ষোড়শ খ্রীঃ এর গোড়ার দিকে মলাক্কার পতন হইলে পর উত্তর সুমাত্রায় অবস্থিত অচিন (Acheen) প্রধান বাণিজ্য ও ইস্‌লাম ধর্মের কেন্দ্রস্বরূপ হয়।

২। মলাক্কা

পঞ্চদশ খ্রীঃর গোড়ার দিকে মালয় উপদ্বীপের যে সব রাজ্যগুলি প্রভাবশালী হইয়া উঠে মলাক্কা তাহাদের মধ্য একটি, এবং অল্পদিনের মধ্যেই ইহা ঐদিককার প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। এই রাজ্যের প্রথম দিককার ইতিহাস সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছুই জানা যায় না। নীচে উদ্ধৃত আলবুকার্কের (Albuquerque) বিবরণী মোটামুটি সত্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

"জাভায় 'বতরতমুরেল' (ভটার তুমপেল) ও পালেমবাঙ্গে 'পরিমিস্যুর' (পরমেশ্বর) নামে দুইজন রাজা রাজত্ব করিতেন। উভয়ের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ হইত কিন্তু শেষে দুই রাজার মধ্যে সন্ধি হইল। সন্ধি অনুযায়ী পরেমেশ্বর জাভার রাজকন্যা পরিমিসুরিকে (পরমেশ্বরী) বিবাহ করিলেন ও তাঁহার পিতাকে কর দিতে স্বীকার করিলেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই তিনি এই সর্তভঙ্গ করিলেন এবং কর দিতে অস্বীকার করিলেন। ইহাতে জাভার রাজা পালেমবাঙ্গ আক্রমণ করিলেন এবং পরমেশ্বর পরাজিত হইয়া স্ত্রী, পুত্র, ও কিছু অনুচর সহ সিংঘপুরে (সিঙ্গাপুর) পলাইয়া গেলেন। এই সময় সিঙ্গাপুর শ্যামদেশের অধীনে একটি সমৃদ্ধিশালী শহর ছিল। এখানকার শাসক পলাতক রাজাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন। কিন্তু পরমেশ্বর তাঁহার আশ্রয়দাতাকে হত্যা করিয়া ঐ শহর অধিকার করিলেন। এই খবর পাইয়া পালেমবাঙ্গ হইতে তাঁহার পুরানো প্রজারা এখানে বসবাসের উদ্দেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাদের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার হইবে। পরমেশ্বর ইহাদের আগমনে খুশি হইলেন। এখানে তিনি পাঁচ বছর ছিলেন। এই পাঁচ বছর সিঙ্গাপুর প্রণালী দিয়া যে সব জাহাজ যাতায়াত করিত নিজের নৌবহরের সাহায্যে সেগুলি লুঠ করাই তাঁহার প্রধান কাজ হইয়া উঠিল। ইহার পর সিঙ্গাপুরের নিহত শাসকের ভাই পটনির শাসক পরমেশ্বরকে আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পরমেশ্বর

নিজের লোকজনদের লইয়া মুয়র (Muar) নদীর মোহনার কাছে পলাইয়া গেলেন। এখানে তখন অল্প কয়েকজন জেলেদের বসতি ছিল এবং তাহারা পরমেশ্বরকে তাহাদের গ্রামে বসবাস করিতে আমন্ত্রণ জানাইল। এই স্থানের জমি খুব উর্বরা ছিল এবং জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সব রকম জিনিষ উৎপন্ন হইত। এই পরিবেশে খুসী হইয়া পরমেশ্বর তাঁহার পরিবারবর্গ লইয়া এখানে বাস করিতে লাগিলেন। জলদস্যুরা জল নিবার উদ্দেশে এই বন্দরে আসিত, এই সময় হইতে পরমেশ্বরের সাহায্য পাইয়া ও তাঁহার আগ্রহে তাহাদের লুঠের জিনিষ পত্র বিক্রয়ের জন্য এখানে নিয়া আসিতে লাগিল। এইরূপে এইস্থান একটি ব্যবসায়ের কেন্দ্র হইয়া উঠিল ও দুই বছরের মধ্যে ইহার লোকসংখ্যা দুই হাজার দাঁড়াইল। পরমেশ্বর নূতন বসতির নামকরণ করিলেন মলাক্কা। ক্রমশঃ পসে (সুমাত্রায় অবস্থিত) ও বাংলাদেশ হইতে বণিকরা ব্যবসার জন্য এখানে আসিতে লাগিল এবং এইস্থানের প্রাধান্যও বাড়িয়া উঠিল।

অপর একটি বিবরণ অনুসারে পরমেশ্বর জাভার একজন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন এবং ঐ দেশেরই রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। ১৪০১ খ্রীঃ এ জাভার অন্তর্বিপ্লবের সময় তিনি সিঙ্গাপুরে পলাইয়া যান ও কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁহার আশ্রয়দাতাকে হত্যা করেন। ১৪০২ বা ১৪০৩ খ্রীঃ এ তাঁহাকে ঐ স্থান হইতে বিতাড়িত করা হয়। এই বিবরণ দুইটির কোনটি সত্য তাহা নিরূপিত না হইলেও এই বিষয়ে সকলেই একমত যে ১৪০২ খ্রীঃ এর কাছাকাছি কোন সময়ে তিনি মলক্কায় বসবাস আরম্ভ করেন এবং শ্যাম দেশের রাজাকে কর দিতে স্বীকৃত হন। ১৪০৩ খ্রীঃ এ তাঁহার রাজ্যে চীনদেশ হইতে দূত আসেন এবং দুই বৎসর পরে তিনি চীনে দূত পাঠান। চীন সম্রাট তাঁহাকে মলাক্কার রাজা বলিয়া স্বীকার করেন এবং মূল্যবান উপহার পাঠান। উভয় দেশের মধ্যে আরও কয়েকবার দূত আসা যাওয়ায় পরে ১৪১১ খ্রীঃ এ স্বয়ং পরমেশ্বর সপরিবারে এবং মন্ত্রীদের সহ চীন দেশে যান।

তাঁহার দলে সবশুদ্ধ প্রায় ৪৫০ জন লোক ছিল। ১৪১৪ খ্রীঃএ তিনি আবার চীনে যান। ১৪১৯ খ্রীঃএ তিনি আর একবার সপরিবারে চীনে যান এবং তাঁহার অনুরোধে চীন সম্রাট শ্যামদেশের রাজাকে আদেশ করেন যেন তিনি মলাক্কা বিজয়ের কোনরূপ পরিকল্পনা না করেন।

পরমেশ্বর পসইর রাজার মেয়েকে বিবাহ করেন। এইখানকার রাজা* অল্পদিন আগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং স্ত্রীর অনুরোধ বা শ্বশুরের প্ররোচনায় পরমেশ্বর এই ধর্ম গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে তিনি সেকন্দর শাহ নাম গ্রহণ করেন।

পরমেশ্বর বা সেকন্দর শাহ এর আমলেই মলাক্কার সমৃদ্ধির গোড়াপত্তন হইল। ইনিই প্রথম সিঙ্গাপুর হইতে মলাক্কায় বাণিজ্য কেন্দ্র সরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলেন। এই চেষ্টা কার্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি মলাক্কা প্রণালী ও সমুদ্র পথ নৌবহর নিয়া পাহারা দিতেন এবং যে সব জাহাজ এই পথে যাতায়াত করিত তাহাদের সিঙ্গাপুরের বদলে মলাক্কায় যাইতে বাধ্য করিতেন। ইহাতে সিঙ্গাপুরের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে দেখিয়া শ্যামের রাজা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু সেকন্দর তাঁহার সহিত একটি চুক্তি করিলেন। তিনি শ্যামের আনুগত্য স্বীকার করিলেন এবং সিঙ্গাপুর হইতে কর হিসাবে যে পরিমান অর্থ শ্যামের রাজা পাইতেন তিনি সেই অর্থ রাজাকে দিতে রাজী হইলেন। ইহার বদলে সিঙ্গাপুর হইতে পুলান সেমবিলানের (Pulan Sembilen) মধ্যে যতগুলি দ্বীপ আছে ও ইহাদের সমান্তরাল উপকূলভূমিখণ্ড মলাক্কার অধীনে আসিল। সেকন্দর শাহের এই কূটনৈতিক চালে সিঙ্গাপুরের ধ্বংসের সূচনা হইল ও মলক্কার প্রাধান্যের গোড়াপত্তন হইল। সেকন্দর শাহ ১৪২৪ খ্রীঃ এ মারা যান।

* আলবুকার্কের মতে পরমেশ্বরের পুত্র ও উত্তরাধিকারী—কিন্তু এই মত অনেকেই গ্রহণ করেন নাই।

সেকন্দরের পরে তাঁহার পুত্র শ্রী-মহারাজ রাজা হন এবং ১৪৪৪ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার ছেলে ও উত্তরাধিকারীর জন্মকালীন নাম ছিল ইব্রাহিম, কিন্তু পরে তিনি শ্রীপরমেশ্বরদেব শাহ নাম গ্রহণ করেন। ইহা হইতে মনে হয় যে তিনি হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দুইবছর বাদে রাজপ্রাসাদের এক বিদ্রোহের ফলে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পিতার উপপত্নী এক তামিল মুসলমান বণিকের মেয়ের গর্ভজাত তাঁহার এক বৈমাত্রভ্রাতা সিংহাসন অধিকার করেন। নতুন রাজা মুজফ্‌ফরশাহ নাম গ্রহণ করেন এবং মলয় উপদ্বীপের পহঙ্গ এবং পূর্ব সুমাত্রায় অবস্থিত কম্পুর ও ইন্দ্রগিরি জয় করেন। পরবর্তী রাজার রাজত্বকালে যখন পহঙ্গ ও ইন্দ্রগিরির রাজারা বিদ্রোহ করেন তখন তাঁহারা পরাজিত হন এবং তাঁহাদের দেয় কর দ্বিগুণ ধার্য হয়।

মুজফ্‌ফরের রাজত্বের সময় শ্যামের রাজা জল ও স্থল উভয় দিক দিয়া মলাক্কা আক্রমণ করেন, কিন্তু পরাজিত হন। ১৪৫৬ খ্রীঃ এ তিনি চীন দেশে দূত প্রেরণ করেন এবং তাঁহার আমলেই সর্ব প্রথমে মলাক্কার রাজাকে চীন ও পর্তুগীজরা সুলতান বলিয়া অভিহিত করে। পরবর্তী সুলতান মনসুরের রাজ্যকাল ১৪৫৯ হইতে ১৪৭৭ খ্রীঃ পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল এবং ইঁহার সময় মলাক্কার ক্ষমতা উপদ্বীপে ও সুমাত্রায় আরও বিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু প্রাসাদের আভ্যন্তরিক চক্রান্তে রাজ্যের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল এবং মনসুরের এক ছোটভাই তাঁহার মাতুলের সহায়তায় সিংহাসন লাভ করেন। এই মাতুল বেন্দহরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং এইপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিই রাজ্যের সর্বোচ্চ ক্ষমতা পরিচালনের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু ১৪৮৮ খ্রীঃ এ নতুন সুলতানের রহস্যপূর্ণভাবে মৃত্যু হয় এবং তাঁহার ছোটভাই মামুদ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মামুদের রাজ্যের আরম্ভ ভালভাবেই হয়, কারণ তিনি শ্যামদেশের রণতরীবাহিনী সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন। রাজত্বের এইরূপ

গৌরবময় উদ্বোধনে সকলেই ক্ষমতাশালী ও সমৃদ্ধিশালী রাজত্বের আশা করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালেই মলাক্কার পতন হইল। সুলতান আফিমের নেশায় আসক্ত ছিলেন। রাজকার্য শ্রীমহারাজ তুন মুতহিরের দ্বারা পরিচালিত হইত। ইনি সুলতানের মাতুল ও রাজ্যে বেন্দহরের পদে নিযুক্ত ছিলেন। সম্ভবতঃ সংস্কৃত ভাণ্ডাগারিক হইতে বেন্দহর আখ্যাটির উদ্‌ভব হইয়াছিল এবং ইহা একজন মন্ত্রী বিশেষকে বুঝাইত। সুলতান মামুদের সময় এই মন্ত্রী মলাক্কারাজ্যের সর্বেসর্বা হইয়া উঠিয়াছিলেন।

১৫০৯ খ্রীঃএ কয়েকটি পর্তুগীজ জাহাজ মলাক্কায় আসে। প্রথমে জাহাজের লোকদের সাথে কেহ অসদ্‌ব্যবহার করে নাই, কিন্তু পরে বেন্দহর কুড়িজন পর্তুগীজকে বন্দী করেন ও তাহাদের মুক্তি দিতে রাজী হন না। বেন্দহরের পূর্বপুরুষ তামিল দেশীয় ছিলেন, এই কারণে তিনি বোধ হয় ভারতীয় বণিকদের প্রতিদ্বন্দ্বী পর্তুগীজদের বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। স্থানীয় গুজরাটি মুসলমানরাও "নিজেদের স্বার্থে যে সব বিধর্মী বণিকরা তাহাদের সাথে ব্যবসায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে চাহে তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিল।" পর্তুগীজ জাহাজগুলি ফিরিয়া গেলে রাজার সহিত বেন্দহরের ঝগড়া হয় ও রাজা তাঁহাকে হত্যা করেন। যখন দেশে এইরকম অশান্তি ও বিক্ষোভ চলিতেছিল সেই সময় আলবুকার্ক তাঁহার দেশবাসীর উপর অন্যায় ব্যবহারের প্রতিশোধ নিবার জন্য একটি শক্তিশালী নৌবহর নিয়া মলক্কায় উপস্থিত হইলেন (১৫১১ খ্রীঃ, জুলাই মাস)। আল্‌বুকার্কের প্রায় সব দাবীগুলি সুলতান মানিয়া নিলেন। পর্তুগীজ বন্দীদের ছাড়িয়া দেওয়া হইল এবং আল্‌বুকার্ক ঐ দেশে একটি দুর্গ তৈয়ারীর অনুমতিও পাইলেন। কিন্তু আল্‌বুকার্ক শীঘ্রই রাজ্যের আভ্যন্তরিক গণ্ডগোলের কথা জানিতে পারিলেন এবং এই সময় তাঁহার সহিত মলাক্কায় জাভা ঔপনিবেশিকদের প্রধান তিমুতরাজ বা উতিমুতরাজ যোগ দিলেন। তখন আপোষে মিটমাট করিবার চেষ্টা না

করিয়া আলবুকার্ক নগর আক্রমণ করিলেন ও অগষ্ট মাসে ইহা অধিকার করিলেন। হতভাগ্য সুলতান পলাইয়া গিয়া প্রথমে পহঙ্গ ও পরে বিন্টনে (Bintan) আশ্রয় নিলেন। কয়েকবছর বাদে তিনি মলাক্কা উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

প্রায় এক শতাব্দীকাল গৌরব ও সমৃদ্ধির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার পর একটি বড় রাজ্যের পতন হইল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মলাক্কা হিন্দু সংস্কৃতির কেন্দ্র স্বরূপ ছিল। তামিল ভাষায় প্রচলিত রামায়ণের উপাখ্যান এখানে মালয় ভাষায় অনূদিত হয়, এবং এখানকার রাজারা ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করা সত্বেও এই রাজ্য ভারত-জাভা কৃষ্টির একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। রাজবংশ ও বেন্দহর বংশের একটি শাখার সহিত তামিল দেশের সম্পর্ক থাকাতে ভারতীয় ভাবধারা এখানে আরও দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

মলাক্কা শুধু একটি ক্ষমতাশালী রাজ্য বলিয়াই প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই, এখানে ব্যবসা ও বাণিজ্যের একটি বড় কেন্দ্রও স্থাপিত হইয়াছিল। যে সব পর্তুগীজ লেখকরা মলাক্কার সমৃদ্ধশালী অবস্থা দেখিয়াছিলেন তাঁহারা বাণিজ্যক্ষেত্রে ইহার প্রাধান্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নীচে উদ্ধৃত ব্যবসা ও বাণিজ্যের বিবরণটি ষোড়শ খ্রীঃ এ দুয়ার্তে বার্বোসা (Duarte Barbosa) লিখিয়াছিলেন।

"বহু সংখ্যক মুর (মুসলমান) এবং জেন্টিল (হিন্দু) বণিক এখানে বাস করে। জেন্টিলদের মধ্যে আবার চেটিয়াররা প্রধান; ইহারা করমণ্ডল উপকূলের অধিবাসী। ইহারা সকলেই খুব ধনী এবং ইহাদের অনেক বড় বড় জাহাজ আছে। এই জাহাজগুলিকে ইহারা জাঙ্গো (Junks) বলে। ইহারা বিভিন্ন দেশের সাথে সকল রকম জিনিসের ব্যবসা করে এবং অন্যান্য জায়গা হইতে মুর ও জেন্টিল বণিকরা ব্যবসার উদ্দেশে এখানে আসে। চীন ও অন্যান্য জায়গা হইতে দুই মাস্তুলের জাহাজে করিয়া অনেক বণিক নানারকম বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া এখানে আসে (এখানে বাণিজ্য দ্রব্যগুলির একটি লম্বা

তালিকা দেওয়া হইয়াছে)। জাভা হইতে চার মাস্তুলের জাহাজ এখানে আসে। এখান হইতে নানারকম মাল নিয়া জাহাজগুলি বিভিন্ন দেশে যায়। এই সব দেশগুলির মধ্যে মলক্কা দ্বীপপুঞ্জ, টেনাসেরিম, পেগু, বাংলাদেশ, পুলিকট, করমণ্ডল, মালাবার, কাম্বে, এডেন প্রভৃতি দেশের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। এই বন্দরে বিভিন্ন দেশ হইতে এত জাহাজ আসা যাওয়া করিত যে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই মলাক্কার নাম সুপরিচিত ছিল। ফলে মলাক্কা সহরটি সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্য বন্দরে পরিণত হইয়াছিল এবং এখানে নানারকম মূল্যবান বাণিজ্য দ্রব্যের আমদানি হইত। এখানে এত সোনা আসিয়া জমা হইয়াছিল যে বড় বড় বণিকরা সম্পত্তি প্রভৃতির মূল্য সোনার 'বহরের' মাপে হিসাব করিতেন। এক 'বহরের' ওজন চার 'কুইণ্টলের' সমান। বণিকদের মধ্যে এমন অনেক ধনী আছেন যাঁহারা নিজেদের গুদাম হইতে তিন চার জাহাজ ভর্তি অতি মূল্যবান জিনিসপত্র সরবরাহ করিতে পারেন। মলাক্কার রাজার সম্পত্তির পরিমাণ বিশাল এবং বাণিজ্যের উপর শুল্ক হইত তিনি অনেক অর্থ লাভ করেন।''

আলবুকার্কের বিবরণ হইতেও জানা যায় যে পূর্ব ও পশ্চিমের বাণিজ্য পথের মধ্যে অবস্থিত থাকাতে মলাক্কা বাণিজ্য কেন্দ্র রূপে ব্যবসায় ক্ষেত্রে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। এখানে পূর্বদিক হইতে চীন, জাভা, ফরমোসা ও মালয় দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য দ্বীপগুলির জাহাজ মালপত্র লইয়া আসিত এবং পশ্চিমের উত্তর সুমাত্রা, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা ও আরবের জাহাজগুলির মালের সঙ্গে বিনিময় করিত। এই শহরের লোক সংখ্যা লক্ষাধিক ছিল এবং শহরটি উপকূল ধরিয়া বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

ইস্‌লাম ধর্মের একটি প্রধান ঘাঁটি হিসাবে মলাক্কা বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল এবং ইহা দূর প্রাচ্যে মুস্‌লিম ধর্ম প্রচারের কেন্দ্র স্বরূপ ছিল। আগেই বলা হইয়াছে যে এখানকার দ্বিতীয় রাজা

একজন মুসলমান রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া পরে নিজেও ঐ ধর্ম গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ তঁহোর পরে দুইজন হিন্দু রাজা এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার পৌত্র মুজফ্‌ফর শাহের আমলে কতকটা বলপ্রয়োগ এবং কতকটা প্ররোচনার দ্বারা এই ধর্মের দ্রুত বিস্তার হয়। তিনি যখন পহঙ্গ, কম্পুর ও ইন্দ্রগিরি জয় করিলেন তখন জোর করিয়া ঐ সব রাজ্যের রাজাদের ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং নিজের ভাইর তিন কন্যার সহিত ইঁহাদের বিবাহ দিলেন। গুজরাট ও পারস্য দেশের অনেক মুসলমান বণিক এখানে বসবাস করিত এবং রাজার আনুকূল্যে এই ধর্মান্তর কার্যে তাহারা বিশেষ উৎসাহী ছিল। নীচে উদ্ধৃত জিন্ ডি ব্যারোজের (Jean de Barros) বর্ণনা হইতে বোঝা যায় যে মলাক্কা নতুন ধর্মে লোক দীক্ষিত করার কেন্দ্র স্বরূপ ছিল।

"যে সব মুররা গুজরাট ও পারস্য হইতে বাণিজ্যের উদ্দেশে মলাক্কায় আসিয়া বসবাস করিতেছিল তাহাদের উৎসাহে এখানকার অনেক লোক ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত হইত। নানা জাতির লোককে ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। কাছাকাছি দেশগুলি ছাড়াও সুমাত্রা, জাভা ও ইহাদের চারিদিকে অবস্থিত দ্বীপগুলিতে মলাক্কা হইতে ইস্‌লাম ধর্ম প্রচার করা সুরু হইল।"

মলাক্কার ধন দৌলত ও ব্যবসায়িক প্রাধান্য সুবর্ণদ্বীপে ইস্‌লাম ধর্ম প্রচারে যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এবং এই একই কারণে মালয় উপদ্বীপে এই ধর্ম দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

মলাক্কার শেষ মালয় দেশীয় রাজাই জোহর (Johor) দেশের প্রথম রাজা হইলেন। তিনি নিজে ও তাঁহার বংশধরেরা জোহর, রিয়াউ (Riau) ও লেঙ্গায় (Lengga) ইস্‌লাম ধর্ম প্রচার করেন। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে মলয়ের বর্তমান সুলতানরা প্রায় সকলেই মুসলমান ধর্মাবলম্বী, কিন্তু ইঁহারা নিজেদের পরমেশ্বরের

বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। হিন্দু সংস্কৃতির নিদর্শন ১৫৩৭ খ্রীঃ পর্যন্ত মালাক্কায় দেখা গিয়াছে এবং তখনও লিখিবার সময় ভারতীয় লিপি ব্যবহার করা হইত।

৩। জাভায় হিন্দু শাসনের সমাপ্তি

১৪১৬ খ্রীষ্টাব্দে চৈনিক পর্যটক মাহুয়ানের (Ma Huan) বিবরণ হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে ঐ সময় বিদেশী মুসলমান বণিকেরা জাভায় একটি উপনিবেশ গড়িয়া স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু তখন পর্যন্ত রাজনীতিতে কোন অংশ গ্রহণ করিতে পারে নাই।

কিন্তু পর্তুগীজ বিবরণ হইতে দেখা যায় যে পঞ্চদশ খ্রীঃর শেষভাগে জাভার কতকগুলি বন্দরের ভার মুসলমান অধিনায়কদের (chiefs) উপর দেওয়া হইয়াছিল। সম্ভবতঃ তাঁহারা প্রাচীন জাভাবাসী কিন্তু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য তখনও তাঁহারা হিন্দু রাজার অধীনতা স্বীকার করিতেন এবং রাজার ক্ষমতা ও সম্মান পূর্বের মতই ছিল। ১৫০৯ খ্রীঃ এ মলাক্কার সুলতান জাভার রাজা কর্তৃক তাঁহার রাজ্য আক্রান্ত হইতে পারে এই আশঙ্কায় ভীত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুলতানের এই আশঙ্কা হইতে বোঝা যায় যে তখনও জাভার নৌশক্তি যথেষ্ট ক্ষমতা-সম্পন্ন ছিল। কিন্তু ইসলাম ধর্ম ক্রমশঃ জাভা রাজ্যের অভ্যন্তরেও বিস্তার লাভ করিল। এই নতুন ধর্ম বিস্তারের একটি প্রধান সহায় ছিল বৈবাহিক সম্বন্ধ। যখন পসের মুসলমান অধিপতি জৈন-উল-আবেদিন সিংহাসন-চ্যুত হইলেন তখন আত্মীয় বলিয়া জাভার রাজার কাছে আশ্রয় পাইলেন। রাজ পরিবারের মধ্যেও অনেকে নতুন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে ইসলাম ধর্ম শাসনকর্তা, রাজপরিবার ও রাজপরিষদের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত কর্মচারীদের মধ্যে প্রচারিত হইল এবং ইঁহারা সংখ্যায় অল্প হইলেও যথেষ্ঠ প্রভাবশালী ছিলেন। ইঁহারা যখন যথেষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন হইলেন? তখন হিন্দু রাজাকে

কোনমতেই ধর্মান্তরিত করিতে না পারিয়া সকলে মিলিয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করাই স্থির করিলেন। যতদূর জানা যায় বাহির হইতে কোন মুসলমান রাজার আক্রমণের ফলে নহে, নিজেদের মধ্যে দুই ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা নিয়া দ্বন্দ্বই এখানে হিন্দুরাজত্বের অবসানের কারণ। প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে নতুন মুসলমান রাজবংশের সাথে পুরানো হিন্দু রাজবংশের সম্পর্ক ছিল, কিন্তু সেটা যে কতদূর সত্য তাহা নির্ণয় করা সম্ভব না। গিরীন্দ্র বর্দ্ধন সম্বন্ধে যে ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় তাহাতে এই সময়ে মজপহিতে হিন্দু রাজ্যের প্রধান ঘাঁটি স্থাপিত ছিল কিনা সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ হয়। যদি তখন পর্যন্তও এই স্থানে হিন্দুরাজার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া থাকে তাহা হইলে এখানে যখন হিন্দুদের পরাজয় হইল তখনই যে জাভায় হিন্দু রাজত্ব একরকম শেষ হইল তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। হিন্দু রাজা তাঁহার যে সমস্ত আত্মীয় স্বজন নতুন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাঁহাদের সাথে বীরের ন্যায় যুদ্ধ করেন। মজপহিত হারাইয়াও হিন্দু রাজা কিছুকাল পূর্ব জাভায় রাজত্ব করেন, কিন্তু দ্বিতীয়বার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া জাভা ত্যাগ করিয়া বলিদ্বীপে গিয়া আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। ১৫২২ খ্রীঃএ বা ইহার কাছাকাছি সময়ে এই ঘটনা ঘটে।

মজপহিত জয় করিবার অল্পকালের মধ্যেই মুসলমানরা সুন্দদ্বীপ জয় করে। পর্তুগীজ বিবরণ হইতে জানা যায় যে ১৫২২-১৫২৬ খ্রীঃএর মধ্যে উপকুল ভাগের মুসলমান অধিনায়কেরা সুন্দদ্বীপের হিন্দু রাজ্য জয় করে। তখন মাদুরার রাজা ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় নতুন ধর্ম গ্রহণ করেন।

প্রায় পনেরশ' বছর ধরিয়া যে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি জাভায় বিস্তার লাভ করিয়াছিল, মজপহিত ও সুন্দ রাজ্যের পরাজয়ে তাহা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। অবশ্য এইখান হইতে হিন্দু সভ্যতা বা হিন্দু

অধিকৃত রাজ্য একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল না, পূর্বে ও পশ্চিমে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কঠোর সংগ্রাম করিয়া হিন্দুরা তাহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিল। পূর্বদিকে স্মেরো (সুমেরু) পর্বতের কাছাকাছি ও তাহার অপর দিকে হিন্দুদের নিরাপদ আশ্রয় ছিল। পর্তুগীজ বিবরণ হইতে জানা যায় যে ষোড়শ খ্রীঃ র মধ্যভাগে পসুরুহানের মুসলমান অবরোধকারীরা পিছাইয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিল। ১৬০০ খ্রীঃ এও বলম্বঙ্গান নামে একটি হিন্দু রাজ্য ছিল এবং আরও দুইশ' বছর ইহার অস্তিত্ব বজায় ছিল।

ছোট ছোট কয়েকটি রাজ্য জাভার হিন্দু শাসনের চিহ্ন কোন রকমে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু এই সময় হইতে আসল হিন্দু সংস্কৃতি পূর্বদিকে স্থানান্তরিত হইল ও একমাত্র বলিদ্বীপেই ইহা পরিপূর্ণভাবে বজায় রহিল। জাভার রাজপরিবারের ও সম্ভ্রান্তবংশের অনেকে এখানে আশ্রয় লইয়াছিলেন। জাভার হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি বর্তমান কাল পর্যন্ত কেবল এই দ্বীপটিতেই প্রচলিত আছে—ইহাই এই স্থানের বিশেষত্ব। অপরদিকে জাভার হিন্দু আমলের কীর্তিস্তম্ভগুলি বিগত দিনের গৌরব ও মহিমার সাক্ষী দিতেছে মাত্র।

৪। বলিদ্বীপ

সম্প্রতি গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে বলিদ্বীপের হিন্দু উপনিবেশ সোজা ভারতবর্ষ হইতেই নিজস্ব সংস্কৃতি লইয়া স্থাপিত হইয়াছিল, ইহা কোন ভারত-জাভা উপনিবেশের বা সভ্যতার শাখা নয়। পুরাণো লেখগুলি প্রাচীন বলিভাষাতেই রচিত, প্রাচীন জাভা ভাষায় নয়, কাজেই সাধারণতঃ যে ধারণা আছে যে জাভা হইতে বলিতে হিন্দু সভ্যতার প্রচার হইয়াছিল তাহা ভুল। একথা ধরিয়া লওয়া যায় যে জাভা ও সুবর্ণদ্বীপের অন্যান্য দ্বীপগুলির মতই বলিদ্বীপেও হিন্দু উপনিবেশ স্বাধীনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। অবশ্য বলিদ্বীপের উপর জাভার ক্ষমতা যে একাধিকবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন

সন্দেহ নাই। আগেই বলা হইয়াছে যে অষ্টম খ্রীঃ এ জাভার রাজা সঞ্জয় বলি জয় করেন, এরপরেও বহুবার এইরূপ বিজয়ের কথা জানা যায়, এবং ইহাদ্বারা এই দুইটি প্রতিবেশী দ্বীপের মধ্যে যে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তাহা সহজেই অনুমান করিয়া লওয়া যায়।

বলির প্রথম যে রাজার সম্পর্কে খাঁটি ঐতিহাসিক তথ্য কিছু পাওয়া যায় তাঁহার নাম কেশরীবর্মদেব, এবং ইনি ৯১৪ খ্রীঃ এ রাজ্য-শাসন করিতেন বলিয়া জানা যায়। ইঁহার পরবর্তী রাজার নাম উগ্রসেন (৯১৫-৯৪২ খ্রীঃ)। ইঁহার পরে তবনেন্দ্রবর্মদেব ও চন্দ্রভয়-সিংঘবর্মদেব যথাক্রমে ৯৫৫ ও ৯৬০ খ্রীঃ এ রাজত্ব করেন। এই দুই জনের পরে জনসাধুবর্মদেব ৯৭৫ খ্রীঃ এ এবং রাণী শ্রী বিজয়মহাদেবী ৯৮৪ খ্রীঃ এ রাজত্ব করেন।

ইহার কিছু পরেই জাভার রাজা ধর্মবংশ বলি জয় করেন এবং আগেই বলা হইয়াছে যে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে উদয়ন ও মহেন্দ্রদত্তা বলির শাসক নিযুক্ত হন। এই সময় হইতেই বলির সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের আরম্ভ হয়। বলির সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভারত-জাভা সংস্কৃতি গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ১০২২ খ্রীঃ এর পর হইতে বলির সভ্যতা ও কৃষ্টি প্রাচীন জাভার সমগোত্রীয় বলিয়া মনে করা যাইতে পারেন।

১০০৬ খ্রীঃ এ যে বিপদ জাভা রাজ্যে দেখা দেয় সেই সুযোগে ১০২২ খ্রীঃ এ জাভার অধীনতা হইতে বলিদ্বীপ মুক্ত হইতে সক্ষম হয়। বলির কয়েকজন স্বাধীন রাজার নাম জানা যায়। তাঁহাদের নাম ও তাঁহাদের রাজত্বকালের সময় এ পর্যন্ত যাহা জানা যায় নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :— ধর্মবংশ-বর্ধন মরকত পঙ্ঘজস্থানোত্তুঙ্গদেব (১০২২-২৬), অনক বুঙ্গসু (১০৫০-৭৮) এবং সকলেন্দকিরণ (১০৯৮)। শেষোক্ত রাজা ও ১১১৫ হইতে ১১১৯ খ্রীঃ পর্যন্ত শূরাধিপ নামে যে রাজা রাজত্ব করিতেন বলিয়া জানা যায়, এই দুইজন সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি। জয়শক্তি নামে আর একজন রাজা

অন্ততঃ পক্ষে ১১৪৬ হইতে ১১৫০ খ্রীঃ অবধি রাজত্ব করেন। অন্যান্য যে সব রাজার নাম জানা যায় তাহা জয়পঙ্গুস (১১৭৮–১১৮১), সকলেন্দু (১২০১), অড়িকুন্তিকেতন (১২০৪), ইঁহার পুত্র পরমেশ্বর শ্রীবীরাম এবং পরমেশ্বর শ্রীহাঙ্গ নিংহ্যঙ্গ অদিলঞ্চন (১২৫০)। কিন্তু কৃতনগরের রাজত্বকালে জাভা আবার তাহার এই প্রতিবেশী দ্বীপটিকে জয় করিল। ১২৮৪ খ্রীঃ এ একটি সামরিক অভিযান বলির বিরুদ্ধে পাঠানো হয় এবং বলি দ্বীপের রাজাকে বন্দী করিয়া তাহারা কৃতনগরের কাছে নিয়া যায়।

কৃতনগরের মৃত্যুর পরে প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল বলি স্বাধীন রাজ্য ছিল। মজপহিত সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সময় বলির উপর জাভার আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হয়। যদিও বলির রাজা স্বাধীনতা বজায় রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন তথাপি শেষ পর্যন্ত ১৩৪৩ খ্রীঃ এ পরাজিত হন এবং বলি মজপহিত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

এই সময় হইতে বলিদ্বীপ জাভা সম্রাজ্যের এক অংশ বিশেষ বলিয়া পরিগণিত হইত। একাদশ খ্রীঃ তে বলিদ্বীপে জাভার কৃষ্টির প্রভাব বিস্তারের যে সূচনা হয় মজপহিতের সম্রাটের দ্বারা বিজিত হইবার ফলে তাহা দৃঢ়তর হয়। এই সময় হইতে এই দুই দ্বীপের রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। বলিতে জাভা সাহিত্যের একটি কেন্দ্র গড়িয়া উঠে এবং ক্রমশঃ ইহার প্রাধান্য বাড়িয়া উঠিতে থাকে, আর ঠিক সেই অনুপাতে জাভায় ইহা কমিতে থাকে। প্রথমে মজপহিতের অধীন ও পরে স্বাধীন জাভা-রাজ্য রূপে বলিদ্বীপে জাভার বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রহিল ও পরিপূর্ণতা লাভ করিল।

আগেই বলা হইয়াছে যে মজপহিতের রাজা ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে বাধা দিতে অসমর্থ হওয়ায় অনুচর সহ বলিতে আসিয়া আশ্রয় লন। রাজার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া জাভার অনেক অধিবাসী এখানে চলিয়া আসে, কারণ তখন নিজেদের ধর্ম ও কৃষ্টিকে বাঁচাইয়া রাখিবার ইহাই তাহাদের পক্ষে একমাত্র উপায় ছিল। এই

দ্বীপে বহুলোকের আগমনে বলিতে জাভার প্রভাবও নূতন করিয়া শক্তি সঞ্চার করিল এবং এইখানেই ভারত-জাভা সংস্কৃতি ও সভ্যতার শেষ আশ্রয় স্থল স্থাপিত হইল। এখন পর্যন্তও ইহা পরিপূর্ণ ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। এখানে ভারত-জাভা সংস্কৃতির আরও উন্নতি সাধন হওয়া ছাড়াও ইহার এমন অনেক কিছুই বজায় আছে যাহার চিহ্ন মুসলমান ধর্মের প্রভাবে জাভায় আর দেখা যায় না।

পরবর্তী কালের বলিদ্বীপের ইতিহাস মজপহিতের ইতিহাসের অনুবৃত্তি বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। বস্তুতঃ জনসাধারণের মধ্যে এই সম্বন্ধে মনোভাব এত প্রবল যে বলির বেশীর ভাগ অধিবাসী নিজেদের মজপহিতের লোক বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে। যে সামান্য কয়টি জাতি পার্বত্য অঞ্চলে বাস করে খালি তাহাদিগকেই 'বলিঅগ' অর্থাৎ বলির অধিবাসী বলা হয়।

এই দ্বীপের পরবর্তী কালের ইতিহাস সংক্ষেপে বলা যায়। মজপহিতের এক রাজকুমার বলিদ্বীপের রাজ্যশাসন ভার অধিকার করেন। তিনি দেব-অগুঙ্গ কেতুৎ উপাধি গ্রহণ করেন এবং রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি গেল্‌গেল নামক জায়গায় রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার বংশধরেরা সপ্তদশ খ্রীঃর শেষ পর্যন্ত এই স্থান হইতে রাজকার্য পরিচালনা করেন। এই সময়ে করঙ্গসেমের লোকেদের আক্রমণে এই শহরটি নষ্ট হইয়া যাওয়াতে রাজধানী ক্লুঙ্গকুঙ্গে স্থানান্তরিত হয়।

গেলগেলের রাজাদের মধ্যে বতু রেংগঙ্গ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি ষোড়শ খ্রীঃর তৃতীয় ভাগে রাজত্ব করিতেন। সমস্ত বলিদ্বীপ ছাড়াও সসক, সমবাওয়া ও বলমবঙ্গনের অনেক অংশ ইঁহার অধীনে ছিল।

বতুরেংগঙ্গের মৃত্যুর পর নানাবিধ বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ দেখা দেওয়ার ফলে বিদেশের রাজ্যগুলির উপর বলির অধিকার আর রহিল না। বলমবঙ্গনের অধিকার লইয়া বলি ও মতরাম রাজ্যের

মধ্যে বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয় এবং ১৬৩৯ খ্রীঃএ মতরামের রাজা বলিদ্বীপ আক্রমণ করেন। কিন্তু এই আক্রমণ বিফল হয় এবং বলমবঙ্গনের উপর বলির অধিকারই বজায় থাকে। অবশেষে অষ্টাদশ খ্রীঃর শেষভাগে বলমবঙ্গন দেশটি ওলন্দাজরা অধিকার করে।

বলিরাজ্য প্রথম হইতেই কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক বিভাগে একজন করিয়া শাসক নিযুক্ত ছিলেন। ক্রমশঃ এই শাসকরা ক্ষমতা অর্জন করিয়া এক একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দে এখানে নয়টি স্বাধীন রাজ্যের অবস্থান দেখা যায়। ওলন্দাজরা সব কয়টি রাজ্য জয় করিয়া বলিদ্বীপে তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে, কিন্তু বলিদ্বীপ তাহারা সহজে জয় করিতে পারে নাই। সর্বপ্রথম ১৮৩৯ খ্রীঃএ বলি ওলন্দাজদের অধীনতা স্বীকার করে কিন্তু ইহার পরে অনেকবার ওলন্দাজদের এইদ্বীপ অধিকারে রাখিবার জন্য যুদ্ধ করিতে হয়, কারণ স্বাধীনতাপ্রিয় বলি দ্বীপের লোকেরা বারে বারেই বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ১৯০৮ খ্রীঃএ মজপহিত সম্রাটদের শেষ বংশধর ক্লুঙ্গকুঙ্গের রাজা দেব-অগুঙ্গ বিদেশীদের অধীনতা হইতে মুক্তির জন্য শেষবারের মত চেষ্টা করেন। যুদ্ধে যখন সাফল্য লাভের কোন আশা নাই, এমন কি রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত ওলন্দাজরা ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, তখনও তিনি নিজের জীবন বা পরিবারবর্গকে বাঁচাইবার জন্য বিনাসর্তে শত্রুর কাছে আত্ম সমর্পন করিবার প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন। তাঁহার ক্ষত্রিয় পূর্বপুরুষদের বীর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া পবিত্র তরবারি হাতে স্ত্রীপুত্র ও উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদের নিয়া বাহিরে আসিলেন এবং বীরের ন্যায় মৃত্যু বরণ করিলেন। ক্লুঙ্গকুঙ্গের পতন হইল এবং সেখানকার অবশিষ্ট বিদ্রোহী অধিবাসীদের লোম্বক নামক জায়গায় বন্দী করিয়া রাখা হইল। ১৯১১ খ্রীঃএ আনুষ্ঠানিক ভাবে বলিদ্বীপ ওলন্দাজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল এবং এই সঙ্গে এখানকার হিন্দু রাজত্বের অবসান হইল।

পঞ্চম অধ্যায়

সুবর্ণদ্বীপে হিন্দু সভ্যতা

১। সমাজ

জাতিভেদ প্রথা হিন্দু সমাজের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং ইহাকে অন্যান্য সমাজ হইতে স্বতন্ত্র করিয়াছে। এই প্রথা যে জাভা, মাদুরা ও সুমাত্রায় প্রচলিত হইয়াছিল তাহা চতুর্বর্ণ শব্দের ব্যবহার হইতে এবং সাহিত্য ও লেখগুলিতে সর্বদা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের উল্লেখ হইতে বোঝা যায়। কিন্তু এই শ্রেণী-বিভাগ বর্তমান কালে হিন্দু সমাজে যেমন দেখা যায় সেইরকম ছিল না, অনেকটা আগের যুগে অর্থাৎ মনুসংহিতায় যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায় সেই অনুযায়ী প্রচলিত হইয়াছিল।

উপনিবেশগুলিতে এই শ্রেণী-বিভাগ কি রূপ ধারণ করিয়াছিল তাহা বর্তমানে প্রচলিত বলিদ্বীপ ও লম্বোকের জাতিভেদ হইতে পরিস্কার বোঝা যাইবে।

এখানকার সমাজের লোকেরাও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে প্রথম তিন বর্ণের লোকেরা দ্বিজাতি ও চতুর্থ একজাতি।

অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত আছে। পুরুষেরা সবর্ণ অথবা নীচু বর্ণের মেয়েদের বিবাহ করিতে পারে এবং মেয়েরা সবর্ণ অথবা উচ্চবর্ণে বিবাহ করিতে পারে। নীচু বর্ণে বিবাহ করিলে স্ত্রীলোকের মৃত্যু দণ্ড হয়। অসবর্ণ বিবাহে যে সন্তান জন্মলাভ করে সে তাহার পিতার বর্ণের অধিকারী হয়, কিন্তু তাহার সামাজিক মর্যাদা নির্দিষ্ট হয় তাহার মাতার বর্ণ অনুযায়ী।

শিব বা বুদ্ধের উপাসক হিসাবে ব্রাহ্মণরা শৈব ও বৌদ্ধ এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। অসবর্ণ বিবাহের ফলে শৈব সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণেরা পাঁচ ভাগে বিভক্ত।

ক্ষত্রিয়েরা পাঁচটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। সমস্ত না হইলেও বলিদ্বীপের প্রায় বেশীরভাগ রাজবংশ এই বর্ণের অন্তর্গত। সাধারণতঃ ইহাদের পুরুষদের উপাধি 'দেব' ও মেয়েদের 'দেসক' (সংস্কৃত দাসী ?)।

তৃতীয় বর্ণ অর্থাৎ বৈশ্যদের মধ্যে 'অরিয়' (আর্য ?) শ্রেণী প্রধান ও বলির যে সব রাজবংশ ক্ষত্রিয় নহে তাঁহারা এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

শূদ্ররা সাধারণতঃ কৌল নামে পরিচিত। ইহাদের অপবিত্র বা অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা করা হয় না। বিভিন্ন বর্ণের লোকের জন্য নির্দিষ্ট বৃত্তির প্রথা নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে সকল বর্ণের লোকই কৃষিকাজ করে। শূদ্ররা কৃষিকাজ ছাড়াও অন্যান্য কারিগরি বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে।

বলিদ্বীপে ভারতবর্ষের প্রাচীনকালের বর্ণ বিভাগের আর একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। অপরাধের বিচার কালে উচ্চ বর্ণের লোকদের কতগুলি সুযোগ সুবিধা আছে। একই অপরাধে অপরাধীর বর্ণের উচ্চতা অনুপাতে কম শাস্তি এবং যাহার বিরুদ্ধে অপরাধ সে যত নিম্নবর্ণের হয় দণ্ডও তত কম।

শ্রেণী-বিভাগের মধ্যে বড় ছোটর বিচার ভারতবর্ষের অনুরূপই দেখা যায়। কিন্তু রাজা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য যে কোন বর্ণেরই হউন তিনি ব্রাহ্মণ প্রজা হইতে শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী। রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ—এই মতবাদের জন্যই এই প্রথার প্রচলন। অবশ্য রাজা শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিলেও কোন ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করিতে পারেন না। সময় সময় এইরূপ বিবাহ হইত, কিন্তু সে জন্য আইনের ফাঁকি প্রয়োজন হইত। জোলিঙ্গার (Zollinger) বর্ণিত লোম্বকের

বিবরণীতে এইরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। "বলি দেশীয়-মতরামের যুবক রাজা প্রধান পুরোহিতের (দেব) কন্যার প্রেমে পড়িলেন। তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য কিছু সামাজিক আপোষের আশ্রয় লইতে হইল। ব্রাহ্মণ পাপিষ্ঠা বলিয়া কন্যাকে ত্যাগ করিলেন ও ব্রাহ্মণ কন্যা রাজ অন্তঃপুরে আশ্রয় পাইলেন। এইরূপে বৈশ্যবর্ণের অন্তর্ভূর্তা হইবার পর রাজা তাঁহাকে বিবাহ করিলেন।"

বর্ণ বিভাগের সহিত সংযুক্ত আরও দুইটি সামাজিক নিয়মের প্রচলন বলিতে দেখা যায়। প্রথমটি সতী হইবার প্রথা। কিন্তু শূদ্রদের বেলায় এই নিয়ম নিষিদ্ধ ছিল, এবং শেষের দিকে এই প্রথা কেবলমাত্র রাজপরিবারের মধ্যে প্রচলিত ছিল। দুইরকম ভাবে এই প্রথা পালন করা হইত। কখনও স্ত্রী তরবারির দ্বারা আত্মঘাতী হইতেন ও পরে তাঁহার দেহ চিতায় দেওয়া হইত। অন্যথায় স্ত্রী স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিতেন। সময় সময় উপপত্নী ও ক্রীতদাসেরা মৃতের সাথে আত্মঘাতী হইত।

দ্বিতীয় হইল দাস প্রথা এবং ইহা সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। দাসের ঘরে জন্ম, ঋণ বা অর্থদণ্ড শোধ না করা, যুদ্ধে বন্দী হওয়া এবং দারিদ্র্য—এই চারটির যে কোন একটির জন্য লোক দাস-শ্রেণীভুক্ত হইত। দুষ্কৃতি বা পলায়নের চেষ্টার জন্য কঠিন শাস্তি দেওয়া হইলেও মোটের উপর দাসদের অবস্থা ভালই ছিল।

সাধারণতঃ রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ে জাভায় স্ত্রীলোকদের অবস্থা ভারতবর্ষ হইতে অনেক ভাল ছিল। গুণপ্রিয়া ধর্মপত্নী নিজের অধিকারে রাজ্যশাসনভার পাইয়াছিলেন এবং রাজকীয় দলিলে তাঁহার নাম তাঁহার স্বামীর নামের আগে লেখা হইত। ঐরলংয়ের সময়কার বিবরণীতে দেখা যায় যে সেই সময় শ্রীসংগ্রামবিজয়-ধর্মপ্রাসাদোত্তুঙ্গ দেবী নামে একজন মহিলা "রক্রিয়ণ মহামন্ত্রী ই হিনো" পদের অধি-কারিণী ছিলেন। রাজপরিষদে এই পদের অধিকারী ব্যক্তির স্থান ছিল

ঠিক রাজার পরেই। জয়নগরের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন রাজ-পত্নী এবং ইঁহার দৌহিত্র থাকা সত্ত্বেও কন্যাই তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিতেন। আবার বিক্রমবর্ধনের মৃত্যুর পরে তাঁহার দুই পুত্র বর্তমান থাকিতে তাঁহার কন্যা সুহিতাই সিংহাসন লাভ করেন। আর একটি লক্ষনীয় বিষয় এই যে কোন আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে—যেমন রাজা তাঁহার কোন অনুগত ব্যক্তিকে জমি দান করিলে—দানপত্র এইরূপ ভাবে লেখা হইত যে ঐ ব্যক্তি ও তাহার স্ত্রী উভয়েই রাজার নিকট হইতে দান গ্রহণ করিতেছে।

পর্দা প্রথার প্রচলন ছিল না এবং স্ত্রীলোকরা সহজ ভাবেই পুরুষ-দের সাথে মেলামেশা করিত। প্রাচীন সাহিত্য ও বর্তমান কালের বলিদ্বীপের প্রচলিত রীতি হইতেও ইহা বোঝা যায়। মেয়েরা নিজেদের পছন্দমত স্বামী নির্বাচন করিতে পারিত এবং রাজকুমারী ভ্রেঙ্গ কহুরিপণের বেলায় যথার্থই স্বয়ম্বর সভার আয়োজন হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। একই বংশে বৈবাহিক সম্বন্ধ হওয়ার বিষয়ে কোন বাধা ছিল না। অজি জয়নগরের বিবাহের ব্যাপারে দেখা যায় যে বৈমাত্রেয় ভগ্নীকে বিবাহ করাও নিষিদ্ধ ছিল না।

নীচে উদ্ধৃত বিবরণ হইতে জাভার বিবাহ অনুষ্ঠানের একটি চিত্র পাওয়া যাইবে—

"বিবাহ করিতে ছেলে মেয়ের বাড়ীতে যায় এবং সেখানে তিন দিন থাকার পর বর নববধূকে লইয়া নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া আসে। এই উপলক্ষে বরের আত্মীয় স্বজনরা নানা রকম বাজনা—যথা তামার ঢাক ও ঘণ্টা, বাঁশ হইতে তৈরী ঢাক, নারিকেলের খোল ইত্যাদি—বাজায়, বাজি পোড়ান হয়, আর একদল লোক ছোট ছোট তরোয়াল হাতে বরবধূকে ঘিরিয়া থাকে। বধূর মাথার চুল এলানো থাকে, ফুলের নক্সা করা একটি সবুজ কাপড় বধূকে পরানো হয় কিন্তু কোমর হইতে দেহের উপরের অংশ নগ্ন থাকে। মাথায় সোনার এবং হাতে, গলায় নানারকম সোনারূপার অলঙ্কারে তাহাকে সাজানো হয়।"

কয়েকটি চীনা বিবরনী হইতে গভীর দাম্পত্যপ্রেম ও সতীত্বের কাহিনী জানা যায়। সিং-চা সেং-লান গ্রন্থে (Hsing-cha Sheng-Lan, পঞ্চদশ খ্রীঃ) মা-ই-টুংএর (Ma-yi-tung) অধিবাসীদের নিম্নলিখিত বর্ণনাটি প্যাওয়া যায়। মা-ই-টুংকে বঙ্কাদ্বীপ বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে।

"সতীত্ব ধর্মকে তাহারা খুব বড় বলিয়া মনে করে। স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রী মাথার চুল কাটিয়া ফেলে, মুখ ক্ষতবিক্ষত করে এবং সাতদিন উপবাস করিয়া স্বামীর মৃতদেহের পাশে শুইয়া থাকে। অনেকে এই সময়ের মধ্যে মারা যায় তবে এই সময়ের পর কেহ বাঁচিয়া থাকিলে তাহার আত্মীয়রা আসিয়া তাহাকে তুলিয়া খাওয়ায়; তখন হয়ত সে বাঁচিয়া যায় কিন্তু আর কখনও বিবাহ করে না। যেদিন স্বামীর মৃতদেহ পোড়ান হয় তখন অনেক স্ত্রীরা আগুনে প্রবেশ করিয়া স্বামীর সহিত সহমরণে যায়"।

রাজার আসন অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ছিল, সময়ে সময়ে তাঁহাকে দেবতার অংশ মনে করা হইত। প্রায় প্রথম আমল হইতেই এ'দেশে রাজা ভারতীয় রাজদের অনুকরণে বিলাসিতা ও জাঁক জমকের মধ্যে বাস করিতেন।

রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বাসগৃহ ইঁট, ও কাঠ দিয়া তৈরী করা হইত। সাধারণ লোকরা বাঁশের কুটিরে থাকিত। এই কুটিরগুলিতে খড়ের ছাউনি, বাঁশগুলি বেত দিয়া বান্ধা ও দেয়ালের মধ্যে পাতা পুরিয়া দেওয়া হইত।

প্রায় সব জায়গায়—অন্ততঃ জাভায়—প্রধান খাদ্য ছিল চাউল। আর একটি ভারতীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—তাহা পান খাইবার অভ্যাস। এখানে ফুল, নারিকেল (সম্ভবত তাল), পেনাং (penang) বা মধু হইতে মদ তৈরী করা হইত।

সমাজে অনেক রকমের আমোদ প্রমোদের প্রচলন ছিল। তন্মধ্যে জুয়াখেলা সবচেয়ে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। সান-ফোং-সির

লোকরা পা-কুই (Pa-kui) ও দাবা খেলিত, এবং মোরগের লড়াইয়ের ব্যবস্থা করিত; আর এই সব খেলাতে বাজি রাখিবার প্রথা ছিল। জাভাতেও মোরগের লড়াই খুব জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। অন্যান্য আমোদের মধ্যে ছিল পর্বতারোহণে বা নদীপথে ভ্রমণ। জাভা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"বছরের পঞ্চম মাসে তাহারা নৌকায় ভ্রমণ করিতে ও দশম মাসে পাহাড়ে বেড়াইতে যাইত। পাহাড়ে উঠিবার জন্য ভাল ঘোড়া পাওয়া যাইত, কেহ কেহ আবার চেয়ারে করিয়াও উঠিত।"

জাভায় মেয়েদের জন্যও তাহাদের উপযোগী আমোদের ব্যবস্থা ছিল। "প্রতিমাসের পূর্ণিমার রাত্রে আকাশ পরিস্কার থাকিলে মেয়েদের কুড়ি কি ত্রিশজনের একটি দল পথে বাহির হইত। দলের মধ্যে যে মেয়েটি প্রধান বা দলপতি হইত সে গানের এক লাইন গাহিত ও অন্যান্যরা সেই সাথে যোগ দিত। এইভাবে তাহারা আত্মীয়দের বা বড় লোকদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিত এবং পয়সা ও অন্যান্য জিনিষ পুরস্কার পাইত। ইহাকে 'জ্যোৎস্নার গান' বলা হইত।"

সুবর্ণদ্বীপে সঙ্গীতের চর্চা খুব প্রচলিত ছিল। জাভায় নৃত্যকলাও বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। এমন কি অনেক সময়ে রাজকন্যারাও নৃত্যকলায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

কিন্তু সবচেয়ে প্রধান আমোদ ছিল বাজাং (Wayang) বা ছায়া নাটক (Shadow-play)। ইহার উৎপত্তিস্থল জাভা। ইহা এখনও প্রধান ও অদ্বিতীয় আমোদরূপে জাভা, বলি, লোম্বোক, মালয় উপদ্বীপ ও অন্যান্য স্থানে প্রচলিত আছে।

জাভায় অনেক ধরনের নাটকের অভিনয় দেখা যায়। প্রথমতঃ সাধারণ নাট্যাভিনয়; ইহাতে সমস্ত চরিত্রগুলি পুরুষেরা অভিনয় করে; তবে ইহার একটি বিশেষত্ব এই যে রাজার উপস্থিতিতে অভিনয়

করার সময় ছাড়া অন্য সময়ে অভিনেতারা মুখোশ ব্যবহার করে। দ্বিতীয় হইল প্রকৃত বাজাং (Wayang)। আজকাল সব রকমের নাটককেই বাজাং (wayang) বলা হয়, কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ ছায়া নাটক। এই নাটকের বিশেষত্ব এই যে দর্শকদের সামনে একটি সাদা পর্দার উপরে নাটকের অভিনয়ের ছায়া দেখা যায়। মানুষের বদলে নানারকম পুতুল এই অভিনয়ে ব্যবহার করা হয়। পুতুলগুলি সাধারণতঃ মহিষের চামড়ায় তৈরী এবং এইগুলি অতি নিপুণভাবে রং করা থাকে। বাজাং প্রদর্শক পর্দার আড়ালে বাতির পাশে বসিয়া নাটকের আখ্যান বস্তু বলিতে থাকে ও কথানুযায়ী পুতুলগুলির অঙ্গ সঞ্চালন করে। সাধারণত: এই নাটকগুলির কাহিনী মহাভারত বা রামায়ণ অবলম্বনে রচিত হয়।

মোটের উপর দেখা যায় যে অন্ততঃ পক্ষে জাভায় কবিতা, নাটক সঙ্গীত ও নৃত্যকলা আমোদ প্রমোদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং এই সবেরই প্রেরণা যে ভারতবর্ষ হইতে উদ্ভূত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মৃতদেহ সৎকার করিবার অনেক রকম পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। ইহার মধ্যে শবদেহ পোড়ান, জলে বিসর্জন দেওয়া বা নির্জন প্রান্তরে পশুপক্ষীদের ভোজনের জন্য রাখিবার প্রচলনই বেশী ছিল। দ্বা-পা-টান (এই স্থানকে বলিদ্বীপ বলিয়া সনাক্ত করা হয়) সম্বন্ধে জানা যায় যে „কেহ মারা গেলে মৃতের মুখগহ্বর সোনা দিয়া ভর্তি করিয়া হাতে পায়ে সোনার বালা পরাইয়া মৃত দেহে কর্পূরতেল ও অন্যান্য গন্ধ দ্রব্য মাখাইয়া দেহটি পোড়াইয়া ফেলা হয়।” মালয় উপদ্বীপের কোরা বা কালা নামক জায়গায় মৃতদেহের ভস্মাবশেষ সোনার পাত্রে ভরিয়া সমুদ্রের জলে বিসর্জন দেওয়ার রীতি ছিল।

এই সম্পর্কে এখন বলিদ্বীপে মৃতদেহ সৎকারের যে নিয়ম প্রচলিত তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাতে বহুরকম অনুষ্ঠান পালন

করা হয় ও প্রচুর অর্থ ও সময় লাগে। প্রথমতঃ মৃতদেহটি যথাক্রমে সুগন্ধি মশলা মুদ্রা, কাপড়, মাদুর ও চাঁছাবাঁশের তৈরী আচ্ছাদন দিয়া কিছু দিন ঢাকিয়া রাখা হয়। সৎকার করিবার তিনদিন আগে যে সব জিনিষ দিয়া মৃতদেহটি ঢাকা দেওয়া থাকে সেগুলি সরাইয়া ফেলা হয় এবং মৃতের আত্মীয়রা শেষ বারের মত তাহাকে দেখিবার সুযোগ পায়। পরে মৃতদেহটি শববহন-কারী গাড়ীর উপর রাখা হয়। রথের আকারে তৈরী গাড়ীটির তলটি বাঁশের তৈরী এবং উপরের অংশ বাঁশ বা কাঠ দিয়া তৈরী এবং তিন হইতে এগার তালায় বিভক্ত পিরামিডের মত। অবশ্য এই শববহন-কারী গাড়ীর গঠন ও সাজ সজ্জা অনেক পরিমাণে মৃতের পরিবারের ধনদৌলতের উপরে নির্ভর করে। রাজপরিবারস্থ কাহারও হইলে ইহা খুবই জাঁক জমকপূর্ণ হয়।

শববহন-কারী গাড়ী মিছিল করিয়া শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়। মিছিলের সাথে সঙ্গীতের ব্যবস্থা থাকে আর রাজপরিবারের কেহ হইলে সঙ্গে সশস্ত্র লোক থাকে। দৈনিক ব্যবহারের জিনিসপত্র এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় তীর্থ ক্ষেত্রের জল এই মিছিলের সাথে নিয়া যাওয়া হয়।

শ্মশানে পৌছিলে পর মৃতদেহটি নামাইয়া একটি শবাধারের মধ্যে স্থাপিত হয়। তখন পদণ্ড (পুরোহিত) মন্ত্র পাঠ করিয়া পবিত্র জল ছিটাইয়া দিলে পর শবাধারের নীচে আগুন দেওয়া হয়। দেহটি পুড়িয়া গেলে পর হাড়গুলি সংগ্রহ করিয়া পরদিন অর্থ ও অন্যান্য দ্রব্য সহ অনুষ্ঠানিক ভাবে সমুদ্রের জলে বিসর্জন দেওয়া হয়।

২। সাহিত্য

বহু প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষের সাহিত্য জাভায় প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার প্রকৃতি ও পরিমাণ সম্বন্ধে সঠিক কোন ধারণা করা যায় না। এই সব সাহিত্য অনুশীলনের ফলে ক্রমে এক নতুন

সাহিত্যের উদ্ভব হইল, যাহাকে ভারত-জাভা (Indo-Javanese) সাহিত্য বলা যায়। ইহা এই দ্বীপের ভারতীয় ঔপনিবেশকদের একটি বৈশিষ্ট্য এবং ভারতের বাহিরে ভারতীয় সাহিত্যের এই রকম গভীর অনুশীলন আর কোথাও হয় নাই।

জাভার ভারতীয় উপনিবেশের ইতিহাস মোটামুটি তিন অধ্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রতি অধ্যায়ে জাভা রাজ্যের কেন্দ্র পর পর পশ্চিম হইতে মধ্য ও পূর্ব জাভায় স্থানান্তরিত হইয়াছিল। প্রথম অধ্যায়ের সাহিত্যের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না, তবে পূর্ণবর্মনের লেখগুলি হইতে বোঝা যায় যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা খুব ভালভাবেই এই খানে হইত ও এই ভাষার উপর তাহাদের যথেষ্ট অধিকারও ছিল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই জ্ঞানের পরিধি আরও গভীরতা ও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, কারণ এই সময়ের লেখগুলি ছাড়াও তখন যে সমস্ত হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাদের দেওয়ালে উৎকীর্ণ ভাস্কর্যের বিষয়গুলি সব না হইলেও বেশীর ভাগ ভারতীয় সাহিত্য হইতে গৃহীত। সম্ভবত এই সময়ে ভারত-জাভা সাহিত্যের সূচনা হয়, কিন্তু এ'সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না ; কারণ যে তিন খানি বই এই সময়ে রচিত বলিয়া সাধারণতঃ মনে হয় তাহাদের রচনার তারিখ লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে দেখা যায় যে ভারত-জাভা সাহিত্যের যথার্থ বিকাশ হইয়াছে। প্রায় পাঁচশ' বছর (১০০০-১৫০০ খ্রীঃ) ধরিয়া পূর্ব জাভায় কডিরি বা দহ, সিংঘসারি ও মজপহিতের রাজাদের আনুকূল্যে এই সাহিত্যের প্রভূত চর্চা হইয়াছিল।

মজপহিত রাজ্য মুসলমানদের অধিকারে যাওয়ার পর হইতে যে সাহিত্যকে সাধারণতঃ প্রাচীন জাভা (Old-Javanese) সাহিত্য বলা হয় তাহার শেষ হইল। ইহার পরে জাভা-সাহিত্যের চর্চা বিভিন্ন জায়গায় হইয়াছে। জাভার যে সব অধিবাসী বলিদ্বীপে আশ্রয় লইয়াছিল তাহারাও সাহিত্য চর্চা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল এবং

তাহাদের রচনাগুলি মধ্যবর্তীকালীন-জাভা (Middle-Iavanese) সাহিত্য নামে পরিচিত। মধ্য জাভার মতরামের নতুন মুসলমান রাজত্বে যে সাহিত্য চর্চার শুরু হয় তাহাকে নব-জাভা (New-Javanese) সাহিত্য আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

নব-জাভা সাহিত্যে যে কৃত্রিম প্রাচীন ভাষার প্রচলন দেখা যায় তাহাকে 'কবি' নাম দেওয়া হইয়াছে। আগে 'কবি' বলিতে প্রাচীন আমলে প্রচলিত সকল ভাষাকেই বুঝাইত, কিন্তু এখন মজপহিতের পতনকাল পর্যন্ত যে ভাষা প্রচলিত ছিল তাহাকে প্রাচীন-জাভা ভাষা ও জাভা অধিবাসীরা বলি দ্বীপে যে ভাষা প্রচলিত করিয়াছিল তাহাকে মধ্যবর্তী কালীন জাভ ভাষা বলা হয়। সুতরাং ভারত-জাভা সাহিত্যকে তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত করা যায় যথা— (১) প্রাচীন-জাভা, (২) মধ্যবর্তীকালীন-জাভা (৩) নব-জাভা।

এই তিনটি বিভাগের মধ্যে মাত্র প্রথম দুইটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হইতেছে। কারণ তৃতীয়টি জাভায় হিন্দু রাজত্বের অবসানের পরে প্রবর্তিত হইয়াছিল।

প্রাচীন-জাভা সাহিত্যে কতগুলি বিশেষত্ব দেখা যায়। ইহার কাব্যে সংস্কৃত ছন্দের নিয়ম অনুসরণ করা হইত, রচনার বিষয় প্রধানতঃ ভারতীয় সাহিত্য হইতে উদ্ভূত, এবং ইহাতে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার ও সংস্কৃত কবিতার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিবার নিদর্শন প্রচুর পাওয়া যায়। অবশ্য রচনার বিষয়গুলি সংস্কৃত সাহিত্য হইতে নির্বাচিত হইলেও ইহা ঠিক মূল সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ ছিল না; ঘটনা বিন্যাসে যথেষ্ট ব্যতিক্রম দেখা যায়।

আগেই বলা হইয়াছে যে যখন রাজ্যের কেন্দ্র মধ্যজাভায় ছিল তখন এই সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। এই যুগে রচিত বলিয়া যে পুস্তকটি সঠিকভাবে নির্দেশ করা যায় তাহার নাম অমর মালা। ইহা একটি অংস্কৃত গ্রন্থের প্রাচীন জাভা ভাষায় পরিবর্তিত রূপ। ইহাতে সংস্কৃত অমরকোষ ও অন্যান্য ভারতীয়

অভিধানের মতই বিভিন্ন দেব, দেবী এবং চেতন, ও অচেতন পদার্থ ইত্যাদির নামের প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে।

প্রাচীন-জাভা ভাষায় যে রামায়ণ পাওয়া যায় তাহাও সম্ভবত এই সময়ে রচিত। ইহা ভারত-জাভা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহা সংস্কৃত রামায়ণের অনুবাদ নহে; এই মহাকাব্যের বিষয়বস্তু অবলম্বনে একটি স্বাধীন রচনা। সংস্কৃত রামায়ণের সাথে ইহার মিল যথেষ্ট আছে, তবে ইহা সীতার অগ্নি-পরীক্ষার পরে রাম ও সীতার মিলনেই শেষ হইয়াছে, পুনর্বার সীতার নির্বাসন ও মৃত্যুকাহিনী ইহাতে নাই।

প্রাচীন-জাভা সাহিত্যের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য অবদান মহাভারতের গদ্য অনুবাদ; ধর্মবংশের রাজ্যকালে ইহা সম্পন্ন হয়। এই রাজার আনুকূল্যে ও উৎসাহে যে এই মহাকাব্যের আদিপর্ব, বিরাটপর্ব ও ভীষ্মপর্বের অনুবাদ হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত রূপে বলা যায়। আশ্রম-পর্ব, মুসলপর্ব, প্রস্থানিক পর্ব ও স্বর্গারোহণ পর্বের অনুবাদ পরবর্তী কালে হইয়াছিল। অশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় রচিত উদ্যোগ পর্বের এক অনুবাদ পাওয়া যায়; ইহাতে মূলকাব্যের বহু অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। বিরাটপর্ব ৯৯৬ খ্রীঃ এ লেখা হয়, আর তার ঠিক দশবছর পরেই একটি দারুণ দুর্যোগে ধর্মবংশ ও তাঁহার রাজত্বের পতন হয়।

মহাকাব্যের এই অনুবাদগুলি সংক্ষিপ্ত হইলেও মূলকাব্যের বিষয় প্রায় ঠিকভাবে অনুসরণ করা হইয়াছে এবং কোন বিকৃতি দেখা যায় না; কিন্তু লিখিবার পদ্ধতি অনেকটা আদিম কালের এবং ইহাকে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যসৃষ্টি বলিয়া গণনা করা যায় না। তবে ইহার সার্থকতা সম্বন্ধে কোন মতবিরোধ হইতে পারে না, কারণ ইহা মহাভারতকে জাভায় জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে সাহায্য করিয়াছিল এবং পরবর্তীকালে বহু উচ্চাঙ্গের সাহিত্য এই মহাকাব্যের বিষয়বস্তু লইয়া সৃষ্টি হয়াছিল।

এই জাতীয় রচনার মধ্যে প্রথম অর্জুন-বিবাহ। ইহা ঐর্লঙ্গের (১০১৯-১০৪২ খ্রীঃ) পৃষ্ঠপোষকতায় ম্পু (Mpu) কন্ব রচনা করিয়াছিলেন। মহাভারতে বর্ণিত একটি ঘটনা অবলম্বনে ইহা রচিত—ইহার বিষয়বস্তু 'নিবাত কবচের' বিরুদ্ধে দেবতাদের যুদ্ধে অর্জুনের দেবতাদিগকে সাহায্যদান।

আরও দুইখানি কাব্য সম্ভবতঃ কডিরি রাজ্যের প্রথম যুগে রচিত। প্রথমটি ত্রিগুন রচিত কৃষ্ণায়ণ। ইহার বিষয়বস্তু কৃষ্ণ কর্তৃক রুক্মিণী হরণ ও পরে তাঁহার সহিত জরাসন্ধের যুদ্ধ। অন্যটি সুমনসান্তক। ইহার বিষয়বস্তু রাজা অজের পত্নী ও দশরথের মাতা ইন্দুমতীর ফুলের আঘাতে মৃত্যু। এই ঘটনাটি মাহকাব কালিদাস তাঁহার অমরকাব্য রঘুবংশে অপূর্ব কবিত্বের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন।

জয়ভয়ের রাজ্যকালকে (১১৩৫-১১৫৭ খ্রীঃ) প্রাচীন-জাভা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ বলা যাইতে পারে। বিখ্যাত-গ্রন্থ ভারতযুদ্ধ এই সময় রচিত হয় এবং ইহার জনপ্রিয়তা বহুকাল ধরিয়া অক্ষুণ্ণ ছিল। সংস্কৃত মহাভারতের উদ্যোগপর্ব, ভীষ্মপর্ব, দ্রোণপর্ব, কর্ণপর্ব ও শল্যপর্ব—অর্থাৎ মহাকাব্যের যে পর্বগুলিতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বর্ণনা আছে সেইগুলি হইতে ভারত-যুদ্ধ গ্রন্থের বিষয়বস্তু গৃহীত হইয়াছে। ইহা সহজ ভাষায় কিন্তু মহাকাব্যের পদ্ধতিতে রচিত এবং সমালোচকদের মতে ইহার উচ্চভাব গ্রীক মহাকাব্যের সহিত তুলনা করা যায়। কডিরির রাজা জয়ভয়ের আজ্ঞায় ম্পু (Mpu) সেডঃ ১১৫৭ খ্রীঃ এ এই গ্রন্থ রচনা করেন। একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে কবির উপর রাজা অসন্তুষ্ট হওয়ায় এই গ্রন্থ ম্পু পনুলু শেষ করেন।

পনুলু নামে যে ব্যক্তি জয়ভয়ের রাজ্যকালে ভারতযুদ্ধ গ্রন্থের শেষ অংশ রচনা করিয়াছিলেন তিনিই এই রাজার আমলে হরিবংশ নামে আর একটি কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যের ভারতীয়

সংস্করণের মতই জাভার এই কাব্যে কৃষ্ণ কর্তৃক রুক্মিণী হরণ ও ফলে জরাসন্ধের সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ ইত্যাদির বর্ণনা আছে। জাভার কাব্যে দেখা যায় যে পাণ্ডবেরা জরাসন্ধকে যুদ্ধের সময় সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু এই ঘটনা ভারতীয় কাব্যে নাই।

দ্বিতীয় কামেশ্বরের আমলেও (১১৮৫ খ্রীঃ) কডিরি রাজ্যের সাহিত্যিক খ্যাতি বজায় ছিল। এই রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ স্মরদহন। এই কাব্যের বিষয়বস্তু শিবের ক্রোধাগ্নিতে স্মর বা কামদেবের দগ্ধ হওয়ার সর্বজনবিদিত কাহিনী, যাহা কবি কালিদাস তাঁহার কুমারসম্ভব কাব্যে অপূর্ব কবিত্ব সহকারে বর্ণনা করিয়াছেন। বিখ্যাত ভোমকাব্যও দ্বিতীয় কামেশ্বরের রাজ্যকালে রচিত বলিয়া মনে করা হয়। ইহার বিষয় ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাদের পৃথিবী-পুত্র ভোম অথবা নরকের নিকট পরাজয় ও অবশেষে কৃষ্ণের হাতে তাঁহার মৃত্যু।

চতুর্দশ খ্রীঃ এ মজপহিত রাজ্যের সমৃদ্ধির সময়ে নাগর-কৃতাগম নামে একখানি স্বতন্ত্র ধরণের কাব্য রচিত হয়। ১৩৬৫ খ্রীঃ এ প্রপঞ্চ নামে এক ব্যক্তি এই কাব্য রচনা করেন। অন্যান্য সব কাব্যের মত এই কাব্যের বিষয়বস্তু ভারতীয় মহাকাব্য হইতে লওয়া হয় নাই। মজপহিতের বিখ্যাত রাজা হয়ম বুরুকের (HayamWuruk, রাজসনগর) জীবন কাহিনী ও রাজ্যের সেই সময়কার অন্যান্য ঘটনাবলী লইয়া এই কাব্য রচিত হয়। ইহাতে রাজা, তাঁহার সাম্রাজ্য, রাজধানী ও রাজসভার বহু চিত্তাকর্ষক বিবরণ পাওয়া যায়।

এ পর্যন্ত যে সব কাব্যগ্রন্থের কথা বলা হইয়াছে তাহাদিগকে 'ককবিন' (Kakawin) বলা হয়। ইহার অর্থ কাব্য—কবি শব্দ হইতে উদ্ভুত। ইহাদের সবগুলিই প্রাচীন-জাভা ভাষায় লিখিত এবং এইগুলির প্রায় বেশীর ভাগের বিষয়বস্তু ভারতীয় মহাকাব্য বা পুরাণ হইতে গৃহীত। উপরে যেগুলির বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে

সেগুলি ছাড়াও আরও অনেক ককবিন পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের রচনার তারিখ সঠিক নির্ণয় করা সম্ভব নহে।

এইরূপ একটি ককবিন গ্রন্থ জাভায় নীতিশাস্ত্র কবিন (Kawin) নামে, ও এখন বলিদ্বীপে নীতিসার নামে পরিচিত। সম্ভবত ইহা মজপহিত রাজ্যের শেষদিকে রচিত হইয়াছিল। ইহা প্রচলিত প্রবাদ বাক্য, নৈতিক উপদেশ, ধর্মসংক্রান্ত বাণী, জ্ঞানী লোকদের উক্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত শ্লোকের একটি সংকলন। এই ধরণের শ্লোকের সংকলন ভারতবর্ষের সংস্কৃত গ্রন্থেও দেখা যায়—যথা নীতিশাস্ত্র, পঞ্চতন্ত্র, চাণক্যশতক ইত্যাদি। জাভা ভাষায় রচিত এই শ্লোকগুলির বেশীর ভাগের মূল ভারতীয় শ্লোকগুলি অতি সহজেই বাহির করা যায়।

প্রাচীন-জাভা সাহিত্যকে যে প্রধান তিন বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে ককবিন গ্রন্থগুলি তাহাদের মধ্যে প্রথম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় বিভাগে ধর্ম সম্বন্ধীয় পুস্তকগুলি,—যথা সূর্য-সেবন, গারুড়েয় মন্ত্র ইত্যাদি। তৃতীয় বিভাগে গদ্য রচনা সমূহ—এইগুলিকে আবার বিষয়বস্তু অনুসারে চারি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। ইহাদের দুই শ্রেণীর বিষয় আইন ও ধর্ম এবং তৃতীয় শ্রেণীর গদ্য গ্রন্থগুলি ভারতীয় মহাকাব্য ও পুরাণগুলির বিষয়বস্তু লইয়া রচিত।

মহাভারতের বিষয় লইয়া রচিত গদ্য গ্রন্থগুলি প্রাচীন-জাভা ভাষায় মহাভারতের বিভিন্ন পর্বগুলি অনুবাদের সময় হইতে আরম্ভ হয়। পরবর্তীকালের এই শ্রেণীর একটি গ্রন্থের নাম কোরবাশ্রম; ইহাতে মহাভারতের রূপান্তর বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই একই শ্রেণীর অন্তর্ভূত সার-সমুচ্চয় গ্রন্থটি। ইহা কতকগুলি নৈতিক উপদেশের প্রাচীন-জাভা ভাষায় অনুবাদ এবং এই উপদেশের বেশীর ভাগ মহাভারতের অনুশাসনপর্ব হইতে সংকলিত। মহাকাব্য-গুলি ও পঞ্চতন্ত্র ইত্যাদি ভারতীয় গ্রন্থের বহু সংস্কৃত শ্লোক এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে।

নবরুচি নামে বলিদ্বীপে আর একটি জনপ্রিয় গ্রন্থ আছে, ইহাতে ভীমের বহুবিধ দুঃসাহসিক কাজের বিবরণ পাওয়া যায়। প্রাচীন-জাভা ভাষায় রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের গদ্য অনুবাদ পাওয়া যায়। ইহা সংস্কৃত শ্লোকে ভর্তি এবং রামপ্রস্থানিকম ও স্বর্গারোহণম, ইহার শেষ অধ্যায় দুইটির নাম। এই দুই বিষয়ে ইহা জাভায় প্রচলিত মহাভারতের অনুরূপ। পূর্বোক্ত প্রাচীন-জাভা ভাষার রামায়ণের মত ইহাতেও মূল সংস্কৃত রামায়ণ হইতে অনেক পার্থক্য আছে।

পুরাণ শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ প্রধান। ইহাতে দু'এক জায়গায় ছাড়া প্রায় ঠিক ভাবেই ভারতে প্রচলিত পুরাণের পদ্ধতি অনুসরণ করা হইয়াছে।

এই শ্রেণীর আর একটি গ্রন্থ অগস্ত্যপর্ব। ইহাতে অগস্ত্য তাঁহার পুত্র দৃদ্দস্যুর কাছে পৃথিবীর উৎপত্তির বিবরণ দিয়াছেন এবং ইহা যথার্থ পৌরানিক পদ্ধতিতেই রচিত।

চতুর্থ শ্রেণীর প্রাচীন-জাভা গদ্য সাহিত্য বিভিন্ন ঐহিক (secular) বিষয় লইয়া রচিত। ইহার মধ্যে ইতিহাস, ভাষাবিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি আছে।

প্রাচীন-জাভা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণের পর এখন মধ্যবর্তী-কালীন জাভা সাহিত্যের কিছু পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

নানা বিষয়ের বহু সংখ্যক পুস্তক এই সাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত। ইহাদের মধ্যে ঐতিহাসিক বিষয় লইয়া রচনাগুলি প্রধান এবং এগুলি গদ্যে ও পদ্যে লিখিত। মধ্যবর্তীকালীন জাভা সাহিত্যের কাব্যে একটি নতুন ছন্দ প্রচলিত হইয়াছিল। এই কাব্যগুলি কিডুং (Kidung) নামে পরিচিত।

গদ্য রচনাগুলির মধ্যে পররতোনই সর্বপ্রধান এবং জাভার ঐতিহাসিক বিবরণ দিবার সময় ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে। কেন অংরোকের (অরোক) সময় হইতে আরম্ভ করিয়া সিংঘসারি ও মজপহিত সাম্রাজ্যের, অর্থাৎ প্রায় তিন শতাব্দীর জাভার রাজনৈতিক

ইতিহাস ইহাতে পাওয়া যায়। ১৬১৩ খ্রীঃ ইহা রচিত হয়।

উসন যব নামে আর একটি গ্রন্থে বলিদ্বীপের ইতিহাস সম্পর্কে কিম্বদন্তীগুলি পাওয়া যায়।

পমঞ্চঙ্গ নামে এক শ্রেণীর ঐতিহাসিক কাহিনীর সংকলন আছে। সাধারণ ইতিহাস ছাড়া স্থানীয় ইতিহাস এই শ্রেণীর রচনায় স্থান পাইয়াছে এবং এইগুলি গদ্য ও পদ্য এই দুই ধরণেই লেখা হইয়াছে। কিডুং নামে অভিহিত অন্যান্য কাব্যগুলির মধ্যে পঞ্জি বিষয়ক রচনাগুলি প্রধান। ইহাতে পঞ্জি নামে বিখ্যাত নায়কের বিচিত্র কার্যকলাপ বর্ণিত হইয়াছে।

পঞ্জি বিষয়ক ছাড়া তন্ত্রি নামে পরিচিত আর এক শ্রেণীর লোক-গাথা ও উপকথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এইগুলি হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলি কেন্দ্র করিয়া রচিত, তবে অনেক নতুন গল্পও ইহাতে স্থান পাইয়াছে। এই ধরণের সাহিত্য জাভা ভাষা ছাড়া বলি, শ্যাম ও লাওস দেশীয় ভাষাতেও পাওয়া যায় এবং ইহা হইতে এই ধরণের সাহিত্যের জনপ্রিয়তা অনুমান করা যায়। তবে ইহাদের ভূমিকা একটু অন্য ধরণের। সাধারণতঃ দেখা যায় যে বিষ্ণুশর্মন শিক্ষা দিবার উদ্দেশে গল্পগুলি তাঁহার শিষ্যদের বলিতেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যায় যে এক দেশের রাণী এই গল্পগুলি বলিতেছেন। এই দেশের রাজা প্রতিদিন একজন নতুন রাণী লাভ করিবার জন্য দৈনিক একজন করিয়া রাণীকে হত্যা করিয়া অপর একজনকে বিবাহ করিতেন। যে রাণী এই গল্পগুলি বলিতেছেন তিনি রাজার শেষ রাণী। এইসব দেশে যে আরব্যোপন্যাসের সহস্র ও এক রজনীর কাহিনী প্রচলিত ছিল তাহা ভূমিকার এই নতুন রূপ হইতে বোঝা যায়।

অনেক কিডুং শ্রেণীর কাব্যের উপাদানরূপে মহাভারত ও পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি ব্যবহার করা হইয়াছে। সংসত্যবান নামে জাভা ভাষায় বিখ্যাত সাবিত্রী উপাখ্যান পাওয়া যায়।

মহাকাব্য ও পৌরাণিক উপখ্যান ছাড়াও লেখকদের নিজস্ব কল্পনাপ্রসূত বিষয় লইয়া কিছু কিডুং শ্রেণীর কাব্য দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। ধর্ম

হিন্দু উপনিবেশের প্রথম আমলেই ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ এই দুই সম্প্রদায়ের ধর্মমত সুবর্ণদ্বীপে প্রচারিত হইয়াছিল এবং এই সম্বন্ধে মোটামুটি বর্ণনা আগেই দেওয়া হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে ভারতীয় ধর্ম এদেশবাসীদের হৃদয়ে গভীর ভাবে প্রবেশ করিয়াছিল এবং ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে দূর প্রাচ্যের ধর্ম-বিশ্বাস, ভক্তি ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে ভারতীয় চিত্রেরই সম্পূর্ণ প্রতিফলন দেখা যায়। অবশ্য স্থানীয় বিশ্বাস ও আচার নিয়ম যে একেবারে লোপ পাইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু উচ্চধরণের সুপরিকল্পিত নিয়মানুষ্ঠানের সংস্পর্শে আসিয়া উহাদের কতগুলি লোপ পাইয়াছিল এবং কিছু ইহার সহিত মিশিয়া গিয়া ইহাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল।

এই মন্তব্য জাভা ও কম্বোজ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য এবং কেবল এই দুইটি উপনিবেশ হইতেই বিভিন্ন সময়কার ধর্মের বিবর্তনের বিস্তৃত প্রমাণ পাওয়া যায়।

•

(ক) জাভার ব্রাহ্মণ্য ধর্ম

অষ্টম খ্রীঃ এর প্রথম দিকেই জাভায় পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সুদৃঢ় ভাবেপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এক কথায় বলিতে গেলে এখানে হিন্দু ধর্মের প্রধান উপাস্য তিন দেবতা, অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, ইঁহাদের প্রত্যেকের শক্তিগণ ও এই সকলের সম্পর্কিত বিভিন্ন দেব দেবীগণ ইত্যাদির পূজা হইত।

এই তিন দেবতাদের মধ্যে শিব শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিলেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ইহা যে শুধু ব্যক্তিগত বা স্থানীয় বিশেষত্ব মাত্র ছিল না, মধ্য ও পূর্ব জাভার সমস্ত সাহিত্য, লেখ, মন্দির ও কীর্তিস্তম্ভগুলি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এখানে শিব শুধু প্রলয়ের দেবতা ছিলেন না, তিনি সৃষ্টিকর্তারূপেও উপাস্য ছিলেন। তাঁহার কোমল ও কঠোর এই দুই রূপের বিকাশই এখানে দেখা যায়। জাভার মূর্তিগুলিতে দেবতার এই দুই রূপ যথা-ক্রমে মহাদেব ও মহাকাল বা ভৈরবের মূর্তিতে প্রতিভাত হইয়াছে।

শিবের এই দুই রূপের উপযোগী তাঁহার শক্তিরও দুই রূপ এখানে প্রচলিত ছিল। মহাদেবের শক্তি ছিলেন দেবী, মহাদেবী, পার্বতী বা গিরিরাজ-কন্যা উমা। এই দেবীরই আর একটি বিশিষ্ট রূপ দুর্গা বা মহিষাসুরমর্দিনী। মহাকাল বা ভৈরবের শক্তি ছিলেন মহাকালী বা ভৈরবী।

শিব ও পার্বতীর পুত্র গণেশের মূর্তি জাভায় খুব দেখা যায়। এই মূর্তিগুলির সহিত ভারতীয় মূর্তির বিশেষ পার্থক্য নাই। শিবের অপর পুত্র কার্তিকেয় জাভায় সুপরিচিত ছিলেন। শিবলিঙ্গ পূজার প্রথাও এখানে প্রচলিত ছিল।

ত্রিমূর্তির দ্বিতীয় দেবতা বিষ্ণু কোন কোন রাজ্যের আরাধ্য দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু শিব পূজার ন্যায় বিষ্ণু পূজা জাভায় কখনও প্রাধান্য লাভ করে নাই। তাঁহার শক্তি শ্রী বা লক্ষ্মীর যে মূর্তিগুলি পাওয়া যায় সেগুলি চতুর্ভুজা—পদ্ম, ধানের শীষ, চামর ও জপমালা-ধারিণী। বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের মূর্তিও জাভায় দেখা যায়। বিষ্ণুর অবতারদের মধ্যে প্রায় সকলেরই, বিশেষতঃ কৃষ্ণ, রাম, বরাহ, মৎস্য ও নরসিংহের, মূর্তি দেখা যায়। শৈব ও বৌদ্ধদের তুলনায় বৈষ্ণবদের সংখ্যা কম থাকাতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের স্থান এই দুই সম্প্রদায়ের পরে ছিল।

ত্রিমূর্তির অপর দেবতা ব্রহ্মার মূর্তি সংখ্যায় খুবই কম।

একসাথে ত্রিমূর্তি অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের একত্রিত মূর্তিও জাভায় পাওয়া যায়।

ভটার-গুরু মূর্তি জাভার একটি জনপ্রিয় মূর্তি। ইহা একটি দুই হস্ত বিশিষ্ট, গুম্ফ-শ্মশ্রু-মণ্ডিত স্ফীতোদর বৃদ্ধের মূর্তি। ইঁহার হাতে ত্রিশূল, কমণ্ডলু, জপমালা ও চামর আছে। সাধারণতঃ এই মূর্তিকে শিবের মহাযোগীরূপের প্রতিকৃতি মনে করা হয় এবং এই মূর্তির এত জনপ্রিয়তা লাভ করিবার কারণ বোধ হয় এই যে জাভার স্থানীয় কোন দেবতা ইঁহার সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন। আবার কাহারও মতে এটি অগস্ত্য মুনির মূর্তি। এই মতও গ্রহণযোগ্য—কারণ জাভায় অগস্ত্য মুনির প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁহার পূজার যে যথেষ্ট প্রচলন ছিল সে কথা লেখ হইতে প্রমাণিত হয়।

যে সকল প্রধান দেবদেবীগণের কথা উল্লেখ করা হইল তাঁহাদের ছাড়াও অন্যান্য অনেক দেবতাদের মূর্তি জাভায় পাওয়া যায়। এক কথায় বলিতে গেলে হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত প্রায় সব দেবতাদের মূর্তিই জাভাতে পাওয়া যায়। প্রায় এক শতাব্দী আগে ক্রফুর্ড (Crawfurd) যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহা কোন রকম অত্যুক্তি বলিয়া মনে হয় না। তিনি বলিয়াছেন—"পিতল ও পাথরে নির্মিত যে সব বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি জাভায় পাওয়া যায় তাহাতে আমার মনে হয় যে পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত এমন একটি দেবদেবী নাই যাহার মূর্তি এই সকলের মধ্যে দেখা যায় না।"

ভারতীয় ধর্মগ্রন্থগুলিকে কেন্দ্র করিয়া জাভায় এক বিশাল ধর্ম সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। এইগুলি হইতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে ভারতীয় ধর্মতত্ত্ব, ধর্মমত, দেবদেবীর উপাখ্যান, ও পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের দর্শন জাভায় কিরূপ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

(খ) বৌদ্ধ ধর্ম

আগেই বলা হইয়াছে যে সপ্তম খ্রীঃর শেষ ভাগে সমস্ত সুবর্ণদ্বীপে বৌদ্ধ ধর্মের হীনযান মতবাদ প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী শতাব্দীতে, অন্ততঃ জাভা ও সুমাত্রায় হীনযান মতবাদের স্থান মহাযান মতবাদ অধিকার করে এবং শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের সময় জাভা ও সুমাত্রায় ইহা দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

জাভায় এই মতাবলম্বীদের দ্বারা বিখ্যাত বরবুদুর ও অন্যান্য অনেক সুন্দর সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। জাভা ও সুমাত্রায় জনসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের মহাযান মতবাদ বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল। মোটের উপর একথা নিশ্চিত রূপে বলা যায় যে আগের মতই সুবর্ণদ্বীপ বৌদ্ধ ধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। বৌদ্ধধর্মের অন্তর্নিহিত আন্তর্জাতিক মনোভাব সুবর্ণদ্বীপকে এমন একটি বিশেষ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল যাহার ফলে এই দেশ সেই সময়ে যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল এবং এই একই কারণে ইহার সহিত ভারতবর্ষ ও অন্যান্য বৌদ্ধধর্মাবলম্বী দেশগুলির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। আগেই বলা হইয়াছে যে শৈলেন্দ্র রাজাদের সাথে ভারতের প্রধান প্রধান রাজাদের যোগাযোগ ছিল এবং বাংলাদেশের বৌদ্ধ প্রচারকেরা জাভার বৌদ্ধধর্মের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। লিখিত বিবরণী হইতে জানা যায় যে বাংলা দেশের অতীশ দীপঙ্কর (১১শ খ্রীঃ) এবং সপ্তম খ্রী: এ কাঞ্চীর অধিবাসী নালন্দার অধ্যাপক ধর্মপালের ন্যায় বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা সুবর্ণদ্বীপে অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন, কারণ তখন এখানে বৌদ্ধ-ধর্ম অনুশীলনের একটি প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। জাভায় বৌদ্ধ সাহিত্যের যে বহুল প্রচার হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় এখানকার বৌদ্ধ পুঁথিগুলি ও বড়বুদুর ও অন্যান্য মন্দিরগুলির ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু হইতে।

বৌদ্ধ ধর্মের অন্তর্নিহিত আন্তর্জাতিক মতবাদের জন্যই বোধ হয়

এখানে ইহার প্রধান প্রধান বিধিগুলিতে কোন রকম পরিবর্তন দেখা যায় না। ইহার সত্যতা জাভায় প্রাপ্ত বৌদ্ধ মূর্তিগুলি হইতে আরও স্পষ্ট বোঝা যায়। এখানে মহাযান মতবাদের সহিত সংশ্লিষ্ট সমস্ত দেবতাদের মূর্তিই দেখিতে পাওয়া যায়।

শেষের দিকে ভারতবর্ষে মহাযান মতাবলম্বীদের মধ্যে যে সব প্রথার প্রচলন হইয়াছিল সেগুলির চিহ্নও জাভায় দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলির মধ্যে প্রধান চারিটির উল্লেখ করা যায় যথা, (১) বৌদ্ধ ধর্মের সংশ্লিষ্ট দেবতাদের মধ্যে হিন্দু দেবতাদের স্থান, (২) প্রধান দেবতাগণ ছাড়াও অন্যান্য অনেক দেবতার পূজার প্রচলন, ইহাদের মধ্যে কয়েকটি ছিল ভীষণাকৃতির; (৩) তান্ত্রিক মতবাদের প্রতিষ্ঠা; এবং (৪) ক্রমে ক্রমে মহাযান মতবাদ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মিলন।

শিব ও বুদ্ধদেবের মধ্যে নিকট সম্বন্ধ স্থাপনা জাভার ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য। কুঞ্জরকর্ণ ও সুতসোম নামক দুইটি গ্রন্থে এই দুই দেবতাকে এক বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। বলিদ্বীপের আধুনিক কালের ধর্মতত্ত্বে বুদ্ধদেবকে শিবের ছোট ভাই বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং এই দুই সম্প্রদায়ের মতবাদে যথেষ্ট মিল দেখা যায়। এই ধরণের শিব-বুদ্ধ ধর্মমত জাভাতেও প্রচলিত ছিল। আবার অনেক সময় শিব, বিষ্ণু ও বুদ্ধ ও তাঁহাদের শক্তিদিগকে অভিন্ন বলিয়া গণ্য করা হইত।

(গ) বলিদ্বীপের ধর্ম

ভাস্কর্য ও সাহিত্য হইতে জাভায় ধর্মমতের যে চিত্র পাওয়া যায় বর্তমানে বলিদ্বীপে প্রচলিত ধর্ম হইতে তাহার কোন প্রভেদ নাই। বলিতে এখনও হিন্দু ধর্ম প্রচলিত আছে, কাজেই এ'সম্বন্ধে খুটিনাটি বিস্তৃত বিবরণ জাভা হইতে এখানে পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। বলিতে প্রচলিত ধর্মসংক্রান্ত নিম্নোক্ত বিবরণ এখানকার বৈশিষ্ট্য মনে না করিয়া

এতক্ষণ জাভা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহার পরিশিষ্ট বলা যাইতে পারে।

বলির অধিবাসীদের মনে ধর্মের প্রতি গভীর ভক্তি, বিশ্বাস ছিল, কারণ তাহারা মানুষের ভাগ্যের উপরে দেবতা ও বুত অর্থাৎ উপদেবতার প্রভাব বিশ্বাস করিত। এক হিসাবে বলা যায় যে তাহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এই উভয়ের তুষ্টি সাধন করা। এইজন্য দেখা যায় যে বলির অধিবাসীদের জীবনে ধর্মের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান পালন করাই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে দেবতা ও পূর্বপুরুষদের পূজা এবং অশরীরী দুষ্ট উপদেবতাকে সন্তুষ্ট করা। সার্বজনীন ও গার্হস্থ্য এই দুই ভাগে এখানকার পূজা-পদ্ধতি ভাগ করা যায়। গার্হস্থ্য পূজার মধ্যে প্রধান সূর্য-সেবন, বা শিবকে সূর্য রূপে পূজা করা। একজন প্রত্যক্ষদর্শী ইহার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"বলি-ভারতীয় রীতি অনুযায়ী পদণ্ড (পুরোহিত) সাদা কাপড় পরেন এবং দেহের উপরের অংশ নগ্ন থাকে। তিনি পূর্বমুখী হইয়া আসন গ্রহণ করেন আর তাঁহার সম্মুখে একটি পিড়ির উপরে ছোট ছোট পাত্রে ফল, ফুল, কিছু চাউল, একটি ধূপদানি ও ঘণ্টা রাখা হয়। তিনি খুব নিম্নস্বরে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন ও সেই সময়ে জলে ডুবাইয়া লওয়া কিছু ফুল ও চাউল ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীতে ধরিয়া তাঁহার সামনের দিকে (অর্থাৎ পূর্বদিকে) ঘুরাইতে থাকেন। এই সময়ে ধূপদানিটিও তাঁর হাতে থাকে। এই ভাবে কিছুক্ষণ মন্ত্র-পাঠ ও হাতে নানারূপ মুদ্রাভঙ্গী ও জপমালা সহযোগে জপ করার পরে তিনি ধ্যানস্থ হন। এই সময় তাঁহার দেহ কাঁপিতে থাকে, তাঁহার দেহে দেবতার আবির্ভাব হওয়ার দরুণ এই কম্পন হয় বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। কিছুক্ষণ বাদে আস্তে আস্তে শরীরের এই কম্পন আবার কমিয়া যায়। যখন তাঁহার দেহে দেবতার ভর হয় তখন তিনি পূজার ফুল ও চাউল খালি পূর্ব দিকে নিবেদন না করিয়া কিছু নিজেকে নিবেদন

করেন, কারণ এই সময় দেবতা তাঁহার শরীরকেও আশ্রয় করিয়া থাকেন। সাধারণ দৈনিক পূজায় ঘণ্টা ব্যবহার করা হয় না, খালি পূর্ণিমা, ও অমাবস্যায় এবং শবদাহ করার সময় ইহা ব্যবহৃত হয়।"

সূর্য-সেবন ছাড়া গৃহ্য-সূত্রে যে সব গার্হস্থ্য পূজার উল্লেখ আছে সেগুলি জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার সময় পালন করা হয়—যেমন জন্মকালে, নবজাতকের নাড়ি কাটা ও নামকরণ উপলক্ষে, কর্ণভেদের সময়, মৃত্যুতে, শ্রাদ্ধে, পরিবারস্থ সকলের জন্মদিনে, এবং ইহা ছাড়া অসুখ বিসুখে, ধান কাটার আরম্ভে, ইত্যাদিতে।

প্রত্যেক বাড়ীতে আলাদা পূজার ঘর আছে ও এখানে রোজ ফুল ও নানা খাদ্যদ্রব্য দ্বারা গৃহ দেবতার পূজা করা হয়। এই সব খাদ্যদ্রব্য বাড়ীর মেয়েরা নিজের হাতে তৈরী করে এবং ভক্তিভরে দেবতাকে নিবেদন করে। সাধারণতঃ পূজার ঘরের চারিদিক দেয়াল দিয়া ঘেরা থাকে ও দেয়ালের মধ্যে মধ্যে কাঠের অথবা পাথরের কুলুঙ্গি (niche) থাকে। এই কুলুঙ্গিগুলির মধ্যে বিশিষ্ট সব দেবতাদের মূর্তি রক্ষিত থাকে ও সময় সময় ইঁহাদের পূজা করা হয়।

সার্বজনীন পূজার জন্য প্রতি জেলায় তিন বা চারিটি মন্দির আছে। রোজকার পূজা ছাড়াও এই সব মন্দিরগুলিতে বছরের নির্দিষ্ট দিনে কতগুলি বিশেষ পূজার আয়োজন হয়, যথা (১) মেক্লেপি—অমাবস্যায় দুষ্ট উপদেবতা তাড়ানোর জন্য, (২) উসব (উৎসব ?)—কৃষি অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীর পূজা উপলক্ষে, (৩) সর-সেবতি (সরস্বতী)—বই বা পুঁথি উৎসর্গকরণ উপলক্ষে, এবং (৪) টুমপেক-লান্ডেপ—অস্ত্র শস্ত্র উৎসর্গকরণ উপলক্ষে। ইহা ছাড়া প্রধান প্রধান দেবতাদের ও রাজন্যবর্গের জন্মতিথিতে, প্রতি মন্দির স্থাপনার বার্ষিক দিনে, রাজার অভিষেকের সময়, কোন রাজ্য জয় করিলে, মহামারীর সময়, ও গৃহপালিত জন্তুদের কল্যাণের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়।

পূর্বপুরুষদের পূজা করা বলিদ্বীপের অধিবাসীদের একটি প্রধান কর্তব্য। এই উদ্দেশে এক বা একাধিক ছোট ছোট মন্দির প্রতি গৃহস্থ

বাড়ীতে থাকে। শাস্ত্রোক্ত মন্ত্র পাঠ ও অর্ঘ্যদানই পূজার অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান দেবতা ও উপলক্ষ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ধরণের হয়। সাধারণতঃ খাদ্য, শস্য, ফল, মাংস, পানীয়, কাপড় ও অর্থ অর্ঘ্যরূপে নিবেদিত হয়। কাল, দূর্গা, বুত, (ভূত ?), রাক্ষস ও অন্যান্য উপদেবতার পূজার সময় পশুবলি দেওয়া হয়। সাধারণতঃ মুরগী, হাঁস, বাচ্চাশূকর, মহিষ, ছাগল, হরিণ ও কুকুর বলি দেওয়া হয়। তবে সময়ে সময়ে নরবলির কথাও শোনা যায়।

ভারতবর্ষের মত বলি দ্বীপেও পূজার সময় ঘৃত, কুশ, তিল, মধু প্রভৃতির ব্যবহারের প্রচলন আছে। পবিত্র জল আর একটি প্রধান উপকরণ। ভারতবর্ষের নদীর নাম অনুসারে বলিদেশের নদীগুলির নামকরণ হইয়াছে গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, কাবেরী, সরযূ এবং নর্মদা, কিন্তু বলির অধিবাসীরা একথা জানে যে আসল নদীগুলি ক্লিঙ্গএ (ভারতবর্ষে) অবস্থিত এবং এই জন্য তাহারা তাহাদের দেশের নদীর জল পবিত্র বলিয়া গণ্য করে না। সেই জন্য পুরোহিত পূজার পূর্বে মন্ত্র পাঠ করিয়া জলশুদ্ধ করিয়া লন।

পদণ্ড বা পূরোহিত জাতিতে ব্রাহ্মণ। এই পদের অভিলাষী ব্যক্তিকে সংস্কৃত ও কবি ভাষায় রচিত ধর্ম সংক্রান্ত পুঁথি অধ্যয়ন করিতে হয় ও একজন গুরুর কাছে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া শিক্ষা করিতে হয়। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে পর গুরু আনুষ্ঠানিক ভাবে শিষ্যকে পূজারীর পদে অভিষিক্ত করেন। অর্ঘ্যের এক অংশ পদণ্ডের দক্ষিনারূপে দেওয়া হয়। পূজার শেষে তিনি যে খাদ্য গ্রহণ করেন তাহার অবশিষ্টাংশ পবিত্র প্রসাদ রূপে সাধারণ লোক ভক্তি ভাবে গ্রহণ করে। পূজা অনুষ্ঠানে যে তোয়তির্ত (তোয়তীর্থ) বা পবিত্র জল ব্যবহার করা হয় তাহা সংগ্রহ করিতে সাধারণ লোক খুব আগ্রহান্বিত, অনেকে অর্থ দিয়াও ইহা ক্রয় করে। গৃহের বা সার্বজনীন পূজা ছাড়াও শবদাহের সময় কিছু অনুষ্ঠান পালনের জন্য পুরোহিতের প্রয়োজন হয়। ধর্মসংক্রান্ত অনুষ্ঠান করা ছাড়াও সাধারণ লোকদের শিক্ষক, জ্যোতিষ ও

দৈবজ্ঞের কাজও তাঁহাকে করিতে হয়। নবনির্মিত অস্ত্রগুলি মন্ত্রপূত করিয়া দেওয়া তাঁহার একটি প্রধান কাজ, কারণ মন্ত্রপূত না হইলে এইগুলি যথেষ্ট কার্যকরী হইবে না বলিয়া লোকের বিশ্বাস।

৪। শিল্প

ভারতবর্ষের ন্যায় সুবর্ণদ্বীপের শিল্পকলা প্রধানতঃ ধর্মসংক্রান্ত বিষয়েই নিয়োজিত হইয়াছে। এ'পর্যন্ত যতগুলি স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের সবগুলিই ধর্মসৌধ। যদিও এক সময়ে মালয় উপদ্বীপ ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বহু মন্দির নির্মিত হইয়াছিল, এখন ইহাদের অবস্থা অতি শোচনীয়; প্রায় সবগুলিই ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে। তবে জাভায় কয়েকটি মন্দির ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। এইগুলি দ্বারা ভারতবর্ষ হইতে উদ্ভূত সুবর্ণদ্বীপের শিল্পবিদ্যার প্রকৃতি ও ঐশ্বর্য সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা সম্ভব হইয়াছে। সত্য সত্যই যে এক সময়ে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা এই সমস্ত দূর দেশে প্রচারিত হইয়াছিল ভারত-জাভা শিল্প ও সাহিত্যই তাহার বিশিষ্ট ও চিরন্তন নিদর্শন।

ভারত-জাভা শিল্পকলা স্থাপত্য ও ভাস্কর্য এই উভয় ক্ষেত্রেই বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। শিল্পকলার এই দুই বিভাগের মধ্যে সম্বন্ধ অতি নিকট, কারণ ধর্মসৌধগুলির শোভাবর্ধনে বা ইহাদের অভ্যন্তরে যে মূর্তিগুলি অবস্থিত তাহা হইতে ভাস্কর্যের বিশিষ্ট নমুনাগুলি পাওয়া যায়। সমস্ত জাভাদ্বীপে যে অসংখ্য মন্দির দেখা যায় তাহাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত কয়েকটির বিবরণ এখানে দেওয়া হইতেছে। ইহা হইতে এখানকার শিল্প সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা করা সম্ভব হইবে।

জাভার ধর্মসৌধগুলিকে সাধারণতঃ চণ্ডি বলিয়া উল্লেখ করা হয় এবং দুই একটি বিশেষ সৌধ ছাড়া এইগুলির সবই মন্দির। মন্দির গুলির সাধারণ পরিকল্পনা (plan) মোটামুটি একই ধরনের, তবে প্রত্যেকটির খুটিনাটি বিষয়ে প্রভেদ আছে। মন্দিরগুলি তিন অংশে বিভক্ত—(১) উচু ও কারুকার্যমণ্ডিত ভিত, (২) মন্দিরের চতুষ্কোণ গাত্র; ইহার সামনের দিকে একটি দরদালান (vestibule) ও অন্য তিন দিকের দেয়ালের সামান্য একটু অংশ বাড়ানো; এবং (৩) ছাদ। মন্দিরের ছাদ ধাপে ধাপে ছোট হইয়া চূড়ার আকার ধারণ করিয়াছে; প্রতিটি ধাপ মন্দিরের সাধারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী গঠিত অর্থাৎ চতুষ্কোণ ও চারিদিকে একটি করিয়া চারটি কুলুঙ্গি (niche)। মন্দিরের চারকোণে চারটি ছোট চূড়া; এই চূড়াগুলি আসল মন্দিরের অনুকরণে ছোট করিয়া নির্মিত। বড় বড় সৌধগুলির ছাদের উপরের অংশে একই নক্শার পুনরাবৃত্তি না করিয়া চারকোণের বদলে আটকোণ করা হইয়াছে।

মন্দিরের অভ্যন্তর একটি চতুষ্কোণ ঘর। ইহার দেয়াল চারটি কিছুদূর পর্যন্ত সোজা উঠিয়া তারপর ধাপে ধাপে চূড়ার আকার ধারণ করিয়াছে। ভিতরের এই ধাপগুলি বাহিরের ছাদের ক্রমশ সঙ্কুচিত ধাপগুলির বিপরীত রূপ, অর্থাৎ এইগুলির প্রত্যেকটি তাহার নিম্নবর্তীটি হইতে ভিতরের দিকে সামান্য বাড়ানো এবং এইভাবে ক্রমশ সরু হইয়া চূড়ার সৃষ্টি হইয়াছে। এইগুলির শোভাবর্ধনের জন্য যে সব নক্শা খোদিত আছে—যথা গোলাপ (rosette), মালা, ফুলের সুদীর্ঘ স্তবক (floral scroll), কাল্পনিক লতা (arabesque), নানারকম প্রাকৃত অবস্থার নক্শা (naturalistic design), ফুলের নকশা বা জ্যামিতিক রেখাবিশিষ্ট নক্শা ইত্যাদি—এসবই ভারতবর্ষের পরিচিত ও বহু ব্যবহৃত' নক্শা। এখানকার স্থানীয় কোন বিশেষ লতা বা। জন্তুর চিহ্ন ইহাদের মধ্যে দেখা যায় না। একটি বহু-ব্যবহৃত নক্শা বিশেষ লক্ষণীয়। ওলন্দাজ পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা ইহাকে 'কাল-মকর' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

আদতে ইহা কাল ও মকর এই দুইটি ভিন্ন মূর্তি লইয়া গঠিত একটি নক্‌শা, তবে কখন কখন এই দুইটি একত্র সন্নিবেশিত রূপেও দেখা যায়। ভীষণ-দর্শন কালের মুখটি রাক্ষসের মুখের আদর্শে রচিত এবং ইহা কালের প্রতিকৃতি বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে ভারতীয় নক্‌শা সিংহ হইতে এবং কুমারস্বামী যে ইহাকে বিকৃত কীর্তিমুখ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই যথার্থ বলিয়া মনে হয়। ইহা একটি প্রথামাফিক সিংহের মস্তক। ইহার দুই চোখ প্রায় বহিরাগত, চওড়া নাক, উপরের ওষ্ঠটি পুরু এবং ওষ্ঠের দুই পাশ দিয়া দুইটি দাঁত বাহির হইয়া আছে।

কাল-মুখ সাধারণতঃ দরজার ঠিক উপরে বা বাহিরের কুলুঙ্গির উপরে খিলানের (arch) ঠিক মধ্যস্থলে দেখা যায়। ইহার দুই প্রান্তে দুইটি মকর-মুখ থাকে। মকর-মুখ দরজার চৌকাঠের নীচের দুই পাশেও দেখা যায়। এই নক্‌শা সিঁড়ির উপরে এবং দালানের অন্যান্য অংশেও দেখা যায়। এক কথায় বলিতে গেলে কাল-মকর মূর্তি আলাদা আলাদা অথবা একত্রে সৌধগুলির সর্বত্রই দেখা যায় এবং ভারত-জাভা শিল্পকলার শোভাবর্ধক নক্‌শাগুলির মধ্যে ইহা একটি জনপ্রিয় আদর্শ ছিল।

এইখানে জাভার মন্দিরগুলির দুইটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ এইগুলিতে কোন স্তম্ভ বা থামের ব্যবহার দেখা যায় না। দ্বিতীয়তঃ যে সব খিলান আছে সেগুলি সব প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে সমান্তরাল (Horizontal) ভাবে তৈরী, মুসলমান আমলের কেন্দ্রাত্মক খিলান (Radiating arch)-এর নমুনা এখানে নাই।

একই পরিকল্পনা অনুসারে তৈরী জাভার প্রত্যেকটি মন্দিরের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই একই জায়গায় পাশাপাশি অনেকগুলি করিয়া মন্দির অবস্থিত। সাধারণতঃ বড় মন্দিরটি মাঝখানে ও চারিপাশে অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দির দেখা যায়। এইজন্য দু'একটি ছাড়া জাভায় কোথাও খুব বড়

মন্দির নাই, একটি ঘেরা চত্বরের মধ্যে অবস্থিত অসংখ্য ছোট ছোট মন্দির একত্রে একটি বিরাট সৌধের আভাষ দেয়।

মধ্য-জাভায় প্রাচীন আমলের অর্থাৎ অষ্টম হইতে একাদশ খ্রীষ্টাব্দের সৌধগুলি অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ এই দুই সম্প্রদায়েরই এই শ্রেণীর মন্দির-সমষ্টি আছে।

সাড়ে ছয় হাজার ফিট উঁচু ও চতুর্দিকে পাহাড়ে ঘেরা ডিয়েং (Dieng) মালভূমিতে বহু মন্দির আছে এবং এইগুলি মহাভারতের প্রধান প্রধান পুরুষ ও নারী চরিত্রের নামে অভিহিত। এইগুলি জাভার সবচেয়ে পুরানো মন্দির বলিয়া মনে করা হয় ও সম্ভবত অষ্টম খ্রীষ্টাব্দে তৈরী। এই মন্দিরগুলি আকারে খুব বড় নহে কিন্তু বাহুল্য-বর্জিত গঠন প্রণালী এবং সুপরিকল্পিত ও পরিমিত অলঙ্করণ (decoration) ইহাদের একটি বৈশিষ্ট্য। এই মন্দিরগুলির মধ্যে যে ভাস্কর্যের নমুনা পাওয়া যায় তাহাও মন্দিরের উপযুক্ত, অর্থাৎ সরল, স্বাভাবিক ও মাধুর্যমণ্ডিত। মোটের উপর বলা যায় যে এই শিল্প রীতির বিশেষত্ব—ইহার গাম্ভীর্য, মহিমা ও সৌন্দর্য—ভারতের গুপ্ত যুগের মন্দিরগুলিকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

ডিয়েং-এ যে সব মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের সবগুলিই ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের অন্তর্গত দেবতাসমূহ, যথা শিব, দুর্গা, গণেশ, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু। কাজেই বোঝা যায় যে মন্দিরগুলি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পোষকতায় নির্মিত হইয়াছিল এবং যে ভগ্নাবশেষ এখন পাওয়া যায় তাহাতে অনুমান হয় যে এইগুলি প্রধানতঃ শৈব সম্প্রদায়ের ছিল।

প্রাম্বানান উপত্যকায় কতকগুলি বৌদ্ধমন্দির আছে এবং এইগুলিকে মধ্য-জাভার শিল্পের উৎকৃষ্ট নমুনা বলা যাইতে পারে। এই ভূখণ্ডটি আধুনিক যোগিয়কার্তা (Jogyakerta) ও সুরকার্তা (Surakerta) জেলার সীমানায় অবস্থিত। এই জায়গায় এক সময়ে একাধিক নগর বা রাজধানী অবস্থিত ছিল, কাজেই এখানে ডিয়েং-এর মত শুধু মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য শহর নির্মিত হয় নাই। চণ্ডি কলসন চাণ্ড

সারি ও চণ্ডি সেবু এই তিনটি এখানকার উল্লেখযোগ্য মন্দির। বৌদ্ধ মন্দিরগুলির মধ্যে এক বড়বুদুর বাদে চণ্ডি সেবুই সবচেয়ে বড়। দুইশ' গজ লম্বা ও ১৮০ গজ চওড়া একটি চতুষ্কোণ প্রাঙ্গনের (rectangular courtyard) প্রতিদিকে দুইসারি করিয়া মোট ১৬৮ টি মন্দির অবস্থিত। প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে প্রধান মন্দিরটি ও ইহার চারিদিকে প্রথম সারিতে আটটি ও দ্বিতীয় সারিতে বারটি করিয়া অর্থাৎ সবশুদ্ধ ৭২টি মন্দির অবস্থিত। কাজেই দেখা যায় যে প্রধান মন্দিরটির চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া ২৪০টি মন্দির অবস্থিত। ইহা ছাড়া প্রাঙ্গনের প্রথম দুই সারি ও প্রধান মন্দির ঘিরিয়া যে দুই সারি মন্দির তাহাদের মধ্যবর্তী জায়গায় যে আরও পাঁচটি মন্দির ছিল সেইরূপ চিহ্ন পাওয়া যায়। এই মন্দির সমষ্টি ছাড়া ইহাদের প্রায় ৩৩০ গজ দূরে প্রতিদিকে একটি করিয়া আরও চারিটি মন্দির আছে। কাজেই প্রধান মন্দিরটি লইয়া এই মন্দির-সমষ্টির সংখ্যা ২৫০টি।

প্রধান মন্দিরটি ঠিক প্রাঙ্গণের মধ্যখানে একটু উচু জমিতে অবস্থিত; আবার ইহার চারিপাশের প্রত্যেক সারির মন্দিরগুলি তাহাদের পরবর্তী সারির মন্দিরগুলি হইতে একটু উচু জমিতে নির্মিত। প্রথম ও শেষ সারির মন্দিরগুলির দরদালানের (vestibule) ছাদগুলি সামনের দিকে ঢালু করিয়া নির্মিত হওয়াতে ধাপে ধাপে নীচু হইয়া আসা মন্দির সারিগুলিকে দূর হইতে একটি পিরামিডের ন্যায় দেখায়। এইগুলি সম্ভবত নবম খ্রীঃ এ নির্মিত।

কেডুর সমতল ভূমির উত্তর-পশ্চিমে ডিয়েং মালভূমি এবং দক্ষিণ-পূর্বে প্রাম্বানান্ উপত্যকা। এই সমতল ভূমিতে ভারত-জাভা স্থাপত্য শিল্পের কয়েকটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন দেখা যায় এবং এই গুলি পূর্বোল্লিখিত মন্দিরগুলির সমসাময়িক। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য এই দুই সম্প্রদায়ের অনেক সুন্দর সুন্দর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখানে আছে। চণ্ডি মেন্দুত ও চণ্ডি পবন এই মন্দির দুইটি বেশ ভালভাবেই সংরক্ষিত আছে এবং এই দুইটিকে ভারত-জাভা শিল্পের চমৎকার উদাহরণ বলা যায়।

কিন্তু বিখ্যাত বড়বুদুরের সৌন্দর্যের তুলনায় আর সবগুলি সাধারণ বলিয়া মনে হয়। এই বিশাল সৌধটিকে যথার্থই পৃথিবীর মধ্যে একটি আশ্চর্য সৃষ্টি বলিয়া গণ্য করা যায়। ইহার গঠন প্রণালী, বৃহৎ আয়তন ও অপূর্ব ভাস্কর্য ইহাকে এমন একটি বৈশিষ্ট্য ও মহিমা দান করিয়াছে যাহার তুলনা সারা পৃথিবীতে একমাত্র কাম্বোজে অবস্থিত আংকোর ভাট ছাড়া আর বোধহয় কোথাও দেখা যায় না।

বড়বুদুরের নির্ম্মান-কাল ৭৫০-৮৫০ খ্রীঃ বলা যায়। এই সময়ে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, কাজেই তাহাদের আনুকূল্যেই যে এই সৌধ নির্মিত হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

বড়বুদুর একটি ছোট পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। ইহার চতুর্দিকে নয়নাভিরাম কেডুর শ্যামল সমতল ভূমি দূরপ্রান্তে অবস্থিত পর্বত-শ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বিশাল সৌধটি নির্মাণের জন্য এই মনোরম স্থান নির্বাচন সত্যই প্রশংসনীয়। এই সৌধটি ভারত-জাভা শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এবং যে জাতি দ্বারা ইহা পরিকল্পিত হইয়াছিল তাহাদের বিত্ত, বৈভব, মার্জিত রুচি, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়।

এইস্থান নির্বাচনের আরও একটি বিশেষ কারণ ছিল, তবে তাহা সাধারণ দর্শকের দৃষ্টি-বহির্ভূত। ছোট পাহাড়টির উপরে একটি পাথরের ঢিপি ছিল এবং ইহাকেই বিশাল সৌধটির আভ্যন্তরিক অবলম্বন (core) হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। যে মহিমান্বিত বিশাল সৌধটি এখন লোকচক্ষুর গোচর তাহা আদতে ঐ আদিম পাথরের ঢিপিটির বাহিরের আচ্ছাদন, অর্থাৎ ঢিপিটি এখন সৌধের দ্বারা ঢাকা রহিয়াছে।

সমস্ত সৌধটি নয়টি ধাপে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি ধাপ নীচেরটি হইতে সামান্য ছোট এবং কেন্দ্রের দিকে ঈষৎ সরানো। সর্বোচ্চ ধাপের কেন্দ্রে একটি ঘণ্টাকৃতি স্তূপ অবস্থিত। নয়টি ধাপের মধ্যে নীচের ছয়টি চতুষ্কোণ এবং উপরের তিনটি গোলাকৃতি। চতুষ্কোণ প্রত্যেকটি ধাপের মাঝ খানে একাধিক বহিঃ-প্রসারিত অংশ (proje-

ction) আছে। এই অংশ সহ সর্বনিম্ন ধাপের দৈর্ঘ্য ১৩১ গজ। সর্ব্বোচ্চ বৃত্তাকার ধাপের ব্যাস ৩০ গজ। নীচের দিক হইতে প্রথম পাঁচটি ধাপের ভিতরের দিকে একটি করিয়া দেয়াল আছে, এবং এই দেয়ালের উর্ধভাগ ঠিক উপরের ধাপটির বাহিরের দিকের প্রাচীর (balustrade) রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ভাবে তাহাদের মধ্যে পরপর চারটি সংকীর্ণ চাতালের (gallery) সৃষ্টি হইয়াছে। উপরের তিনটি ধাপ চক্রাকারে ছোট ছোট অনেকগুলি স্তূপ দিয়া ঘেরা। এই স্তূপগুলির ছিদ্রযুক্ত আবেষ্টনীর অভ্যন্তরে একটি করিয়া বুদ্ধ মূর্তি অবস্থিত। নবম ধাপ হইতে গোলাকৃতি,সোপান শ্রেণী উঠিয়া প্রধান স্তূপের পাদদেশে পৌঁছিয়াছে। প্রথম পাঁচটি ধাপের চাতালের প্রাচীর বা আবেষ্টনীগুলিতে (balustrade) পর্যায়ক্রমে একটি খোদিত খিলান-যুক্ত কুলুঙ্গি (niche) ও মূর্তি-শোভিত দীর্ঘ ফলক (panel) আছে। প্রতি কুলুঙ্গির উপরের অংশটি মন্দিরের থাক থাক করা ছাদের অনুকরণে তৈরী; ইহার প্রতিকোণে ও মধ্যস্থলে একটি করিয়া ঘণ্টাকৃতি স্তূপ অবস্থিত। কুলুঙ্গির প্রত্যেকটির মধ্যে একটি করিয়া ধ্যানী-বুদ্ধের মুর্তি আছে। সমস্ত সৌধটিতে তাহাদের সংখ্যা ৪৩২ টির কম নহে।

প্রতি ধাপের চাতাল হইতে উপরের চাতালে উঠিবার জন্য প্রতি দিকে একটি করিয়া সোপান-শ্রেণী এবং ইহার সম্মুখে একটি করিয়া দরজা। দরজাগুলির উপরিভাগ ক্ষুদ্রাকৃতি মন্দিরের ছাদের মত করিয়া তৈরী। দরজাগুলি এমন ভাবে তৈরী করা হইয়াছে যে ইহার যে কোনটির সম্মুখে দাঁড়াইলে সর্বনিম্ন ধাপ হইতে সর্বোচ্চ ধাপের সোপান-শ্রেণী ও দরজাগুলি এক সাথে দেখা যায়। ইহার সঙ্গে দরজাগুলির অপুর্ব কারুকার্য সব মিলিয়া একটি চমৎকার দৃশ্যের সৃষ্টি হইয়াছে ও সমস্ত সৌধটিকে মহিমা-মণ্ডিত করিয়াছে।

সারিবদ্ধ ভাবে প্রাচীর গাত্রে কারুকার্য-খচিত ফলকগুলি (panel) বড়বুদুরের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। সব শুদ্ধ এইরকম এগারটি ফলকের সারি আছে এবং পৃথক ফলকের সংখ্যা হইবে প্রায় পনের শত।

ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে বিভিন্ন চাতালের ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু সেই সময়কার প্রচলিত পুঁথি হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে, এবং এইগুলি উক্ত পুঁথির সাহায্য ছাড়া সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে। সৌভাগ্যক্রমে এইরূপ কয়েকখানা পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং কতকগুলি ফলকের ব্যাখ্যা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছে। এইগুলি গৌতম বুদ্ধের জীবন এবং বৌদ্ধ জাতক ও অবদান হইতে গৃহীত তাঁহার পূর্বজন্মের কাহিনী ও চরিত্র বর্ণনা। ইহাদের মধ্যে সুধন-কুমারের গল্পও আছে। ইনি চৌষট্টি জন গুরু বরণ করিয়াছিলেন এবং বহু কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া অবশেষে মঞ্জুশ্রীর নিকট হইতে পূর্ণজ্ঞান লাভ করেন। অন্যান্যগুলির বিষয়বস্তুর সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। কিন্তু শিল্পের দিক দিয়া ইহাদের সমস্তগুলিই উৎকৃষ্ট সৃষ্টি।

বড়বুদুরে অবস্থিত বুদ্ধদেবের পৃথক পৃথক মূর্তিগুলি এবং মেন্দুতের বোধিসত্ত্ব মূর্তিগুলি ভারত-জাভা শিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা যাইতে পারে। মূর্তিগুলির গঠন-নৈপুণ্য ইহাদিগকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। দেহের সৌষ্ঠব, সুচারু ভঙ্গী, গাত্র-সংলগ্ন মসৃন বস্ত্র এবং সর্বোপরি মুখের দিব্যভাবব্যঞ্জনা সব মিলিয়া ইহাদিগকে অপূর্ব মাধুর্য দান করিয়াছে। এই সব দেখিয়া মনে হয় যে এই শিল্প ভারতের গুপ্তযুগের শিল্প হইতেই উদ্ভুত।

বড়বুদুরের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে এমন কোন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মন্দির জাভায় নাই। ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাম্বানান উপত্যকায় অবস্থিত লরা-জোংরং মন্দিরগুলি। এই মন্দিরগুলির মধ্যে প্রধান মন্দিরের সংখ্যা আটটি,—দুই সারিতে তিনটি করিয়া ছয়টি ও এই দুই সারির মধ্যে আর দুইটি অবস্থিত। এই আটটি মন্দির একটি দেয়াল দিয়া ঘেরা। এই দেয়ালের বাহিরে প্রতিদিকে তিন সারি করিয়া চারিদিকে ছোট ছোট মন্দির। এই মন্দিরগুলির সংখ্যা ১৫৬।

পশ্চিমদিকের প্রধান মন্দিরগুলির মধ্যস্থলে যেটি, সেটি সবচেয়ে বড় ও প্রসিদ্ধ, এবং এইটিতে একটি শিবমূর্তি আছে। ইহার উত্তর দিকের-

টিতে একটি বিষ্ণুমূর্তি ও দক্ষিণ দিকেরটিতে একটি ব্রহ্মার মূর্তি আছে।

মধ্যস্থলে অবস্থিত শিবের মন্দিরটি সবচেয়ে সুন্দর। ১০ ফিট উচ্চ ও ৯০ ফিট লম্বা ভিত্তির ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত বেদীর (platform) উপর মন্দিরটি অবস্থিত। এই বেদীর উপর মন্দিরের চারিপাশে ৭ ফিট চওড়া জায়গা খালি রাখা হইয়াছে এবং ইহা প্রদক্ষিণ-পথ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। বেদীর চারিদিক উৎকীর্ণ ভাস্কর্যে শোভিত আবেষ্টনী দিয়া ঘেরা।

আবেষ্টনীর ভিতরের দিকে সারিবদ্ধভাবে অবস্থিত বিয়াল্লিশটি ফলকে (panels) রামায়ণের কাহিনী প্রথম হইতে লঙ্কার বিরুদ্ধে অভিযান পর্যন্ত খোদিত করা হইয়াছে। অনুমান হয় যে রামায়ণের পরবর্তী ঘটনাগুলি ব্রহ্মার মন্দিরের আবেষ্টনীতে খোদিত ছিল। এই খোদিত ফলকগুলির মধ্যেই লরা-জোংরং এর মন্দিরগুলির সৌন্দর্য নিহিত আছে এবং এইগুলি এইখানকার প্রধান বৈশিষ্ট্য। বড়বুদূরে বৌদ্ধগাথা অবলম্বনে যে খোদিত ফলকগুলি আছে এইখানকার ফলক-গুলি হিন্দুধর্মের দিক হইতে তাহাদের অনুরূপ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, এবং শিল্পের দিক দিয়া বিচার করিলে এইগুলিকে নিকৃষ্ট ধরনের মনে করিবার কোন কারণ নাই।

লরা-জোংরং ও বড়বুদুরের শিল্পকলার মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। প্রথমোক্ত স্থানের মূর্তিগুলি দ্বিতীয়টির হইতে যেন আরও সজীব, ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও মানবধর্মী। এখানে আদর্শভাব ব্যঞ্জনার সঙ্গে সৌন্দর্যকে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। অপরপক্ষে বড়বুদুরের মূর্তি-গুলির মহিমা ও সৌন্দর্য প্রাকৃতিক জগতের ঊর্ধে যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের। ধীর, স্থির, গাম্ভীর্যপূর্ণ এই মূর্তিগুলি স্বর্গীয় মাধুর্যে পরিপূর্ণ। বস্তুতপক্ষে বড়বুদুর ও লরা-জোংরঙ্গে যথাক্রমে ভারত-জাভা শিল্পের ক্লাসিক ও রোমান্টিক এই দুই পর্বের বিকাশ দেখা যায়।

নিছক আঙ্গিকের দিক দিয়া দেখিতে গেলে লরা-জোংরং-এর মূর্ত্তিগুলি বাড়বুদুরের তুলনায় হয়ত নিকৃষ্ট, কিন্তু এখানে শিল্পী মানুষ,

বাঁদর, জলজ প্রাণী বা গাছ পালা প্রত্যেকটির গঠন-শৈলীতে অপূর্ব দক্ষতা ও উচ্চমানের শিল্পের পরিচয় দিয়াছে।

চণ্ডি মেন্দুতে অবস্থিত বুদ্ধ ও অবলোকিতেশ্বর এই মূর্তি দুইটির গঠন-শৈলী খুব সুন্দর এবং ইহাদেরও বড়বুদুরের মত মধ্য-জাভার ক্লাসিক শৈলীর (style) অন্তর্গত বলা যাইতে পারে।

চণ্ডি বেননের মূর্তিগুলি হিন্দু দেবতাদের, কিন্তু ইঁহাদের শিল্প রীতিতে লরা-জোংরং হইতে বড়বুদুরের সাদৃশ্য বেশী দেখা যায়। ইহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গগুলিও অনির্বচনীয় মাধুর্যে পূর্ণ এবং মূর্তিগুলি সোজা দণ্ডায়মান ভঙ্গীতে অবস্থিত হইলেও ইহাদের সুন্দর কমনীয় ভঙ্গীর তুলনায় লরা জোংরং-এর মহাদেবের মূর্তির ভঙ্গী আড়ষ্ট বলিয়া মনে হইবে।

মধ্য-জাভার পর পূর্ব-জাভার প্রধান সৌধগুলির বর্ণনা করা যাউক।

চণ্ডি কিদলের ভগ্নাবশেষ হইতে ইহার স্থাপত্যের বিশেষত্ব সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণা করা যায়। ইহা রাজা অনূষপতির শ্মশানে প্রতিষ্ঠিত মন্দির। এই রাজার ১২৪৮ খ্রীঃ এ মৃত্যু হয়, কাজেই মন্দিরটি ইহার অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই তৈরী।

সিংঘসারি সহরের উত্তর-পশ্চিমে চণ্ডি সিংঘসারি নামে পরিচিত একটি বিরাট মন্দির আছে। এই মন্দিরের দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ, ভিতের চারি পাশের বর্ধিত অংশ অতিশয় প্রশস্ত এবং ইহা প্রায় ছাদ সমান উচু, অথচ মূল মন্দিরে ইহাদের অনুরূপ কোন অগ্রে বর্ধিত অংশ নাই। ইহার ফলে মূল মন্দিরের চারি পাশে চারিটি ছোট মন্দিরের সৃষ্টি হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, এখানে গর্ভগৃহটি ভিতের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত এবং পশ্চিমের ছোট মন্দিরটি ইহার দরদালান রূপে ব্যবহৃত হয়। কাজেই বাহির হইতে যাহা মূল মন্দির বলিয়া মনে হয় সেটি আসলে গর্ভগৃহের উপরে অবস্থিত এবং ইহাকে গর্ভগৃহের ছাদ বলা চলে।

সিংঘসারি যুগের মন্দিরগুলির মধ্যে চণ্ডি জাগো প্রধান। ইহা রাজা বিষ্ণুবর্ধনের শ্মশানের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহাকে বৌদ্ধ দেবতার মূর্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। ১২৬৮ খ্রীঃ এ বিষ্ণুবর্ধনের মৃত্যু হইয়াছিল কাজেই এই সময়ের কিছু আগে বা পরে মন্দিরটি তৈরী।

তিনটি পরপর উচ্চ এবং ক্রমশঃ ক্ষুদ্রতর ও পশ্চাৎদিকে অপসৃত বেদীর উপর এই ভগ্নপ্রায় মন্দিরটি অবস্থিত। সুতরাং ইহা একটি উচু বেদীর পশ্চাদ্‌ ভাগে অবস্থিত দুর্গের মত দেখায়।

পূর্ব-জাভার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও বড় মন্দির-সমষ্টি ব্লিটারের উত্তর-পূর্বে পনতরনে (প্রাচীন নাম পলা) অবস্থিত। চণ্ডি সেবুর মন্দির-গুলির মত পনতরনের মন্দিরগুলি একটি নিদিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত হয় নাই। এই স্থানটি বহু প্রাচীনকাল হইতে পূণ্যভূমি বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল এবং এখানে বিক্ষিপ্ত ভাবে বিভিন্ন কালে বহু মন্দির গড়িয়া উঠিয়াছে—একটির সহিত অপরটির সম্বন্ধ নাই। ইহা-দের নির্মাণকাল ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ খ্রীঃ। ইহাদের মধ্যে যেটি সবচেয়ে বড় ও সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি খুব সম্ভবত চতুর্দশ খ্রীঃ-র মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত।

যে ভূখণ্ডটির উপর মন্দিরটি অবস্থিত তাহার মাপ দৈর্ঘ্যে ১৯৬ গজ ও প্রস্থে ৬৫ গজ; এবং সমস্ত জায়গাটি একটি দেয়াল দিয়া ঘেরা ও দেয়ালের পশ্চিম দিকে মন্দিরে ঢুকিবার দরজা। এই ঘেরা জায়গাটি আবার তুইটি সমান্তরাল দেয়াল দিয়া তিন ভাগে বিভক্ত। একদম পিছনের অংশে অর্থাৎ পূর্বদিকে প্রধান মন্দিরটি অবস্থিত ছিল। মাটি হইতে প্রথমে তিনটি ক্রমোচ্চ ধাপ (terrace) উঠিয়াছে এবং সর্বোচ্চ ধাপের উপর মন্দিরটি অবস্থিত ছিল। এই ধাপগুলি প্রত্যেকটি নিম্নবর্তীটি হইতে ছোট এবং ইহাদের নক্‌শাও (ground plan) ভিন্ন প্রকৃতির। আসল মন্দিরটির কোন চিহ্ন এখন নাই, খালি ধাপগুলি অবশিষ্ট আছে।

ইহাদের প্রধান বিশেষত্ব কোণে কোণে অবস্থিত কারুকার্য-খচিত চতুষ্কোণ স্তম্ভরাজি। ধাপের কোণায় অংশগুলি সামনের দিকে বাড়ানো এবং এইখানে ছোট ছোট মন্দির অবস্থিত। চতুষ্কোণ স্তম্ভগুলি এই মন্দিরের অবলম্বন হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। এই ধাপগুলির মধ্যস্থলে খোদিত ফলক (relief) দ্বারা রামায়ণের নানা ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় ধাপের মধ্যভাগে অবিচ্ছিন্নভাবে কৃষ্ণায়ণের ঘটনাবলী খোদিত হইয়াছে।

পূর্ব-জাভার মন্দিরগুলির পরিকল্পনা ও নির্মাণ-প্রণালী মধ্য-জাভার তুলনায় নিকৃষ্ট। সাধারণ দর্শকের চক্ষেও পনতরনের মন্দিরগুলির সমগ্র পরিকল্পনায় (general plan) সামঞ্জস্যের অভাব নজরে পড়ে। মধ্য-জাভার মত এখানে প্রধান মন্দিরটি কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া চারিদিকে ছোট মন্দিরগুলি শৃঙ্খলার সহিত নির্মাণ করা হয় নাই। এখানে মন্দিরগুলি যেখানে সেখানে খুসীমত তৈরী করা হইয়াছে, কোন পূর্ব পরিকল্পনার দ্বারা সুবিন্যস্ত নহে। আবার ছোট মন্দিরগুলির নক্শা বড় মন্দিরের অনুরূপ নহে, ভিন্ন ভিন্ন মন্দিরের নক্শা ভিন্ন ভিন্ন রকমের। চণ্ডি পনতরন ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

দ্বিতীয়তঃ, এই মন্দিরের বিভিন্ন অংশের পরিমাণ মধ্য-জাভার মন্দিরগুলি হইতে অন্য ধরনের। মন্দিরের ভিতের উপর অনুচিত গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে এবং পিড়ামিডের অনুরূপ ছাদটি অন্যান্য সমস্ত অংশের উপর অতিরিক্ত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

তৃতীয়তঃ, স্থাপত্যকলার রীতিতেও কতগুলি ব্যতিক্রম দেখা যায়, যেমন কাল-মকরের পরিবর্তে বেশীর ভাগ জায়গায় নাগমূর্তি। তাছাড়া বিভিন্ন অংশের অলঙ্কারগুলি ঠিক সেই অংশগুলির উপযুক্তও নহে। এখানে অলঙ্কারের বিন্যাস যে শুধু অপরিমিত তাহা নহে, এইগুলি মন্দিরের বিশেষ বিশেষ অংশগুলিকে প্রাধান্য দিবার পরিবর্তে নিজেদেরই প্রধান করিয়া তুলিয়াছে। এখানে এগুলি স্থাপত্য পরিকল্পনার-অংশ বিশেষ না হইয়া স্বাধীন সৃষ্টি বলিয়া মনে হয়।

বিভিন্ন মন্দিরগুলির ভাস্কর্যের শৈলীতে তাহাদের একটি নিজস্ব ভঙ্গী লক্ষ্য হয়, এবং এইগুলিই পূর্ব-জাভার শিল্পের বৈশিষ্ট্য। প্রধান বিশেষত্বগুলি এইঃ—

(ক) মানুষের মূর্তিগুলি কদাকার। এইগুলির ভঙ্গী অশিষ্ট ও কুৎসিত এবং সময় সময় এইগুলি বাজাং এর (Wayang) পুতুলগুলির মত অদ্ভুত ও বিকৃত।

(খ) বিষয়বস্তুর বিন্যাসে সামঞ্জস্যের অভাব। সারিবদ্ধ মূর্তিগুলির মাঝে গাছ বা অন্য কিছু খোদিত করা হইয়াছে।

(গ) ভাব ও অভিব্যক্তিহীন মূর্তিগুলি সাধারণতঃ কতগুলি রেখার সমষ্টি (silhouette) মাত্র বলিয়া মনে হয়।

(ঘ) অলঙ্কারের (decoration) বাহুল্য,—যথা গাছ, ফুল, লতা-পাতা ইত্যাদি।

(ঙ) দেহের মধ্য অংশ সব সময়ে সামনের দিক (frontal aspect) হইতে দেখান হইয়াছে, যদিও অনেক সময়ে দেখা যায় হাত বা মাথা বা উভয়ই পাশের দিকে ফেরানো।

(চ) খোদিত মূর্তিগুলির খুব সামান্য অংশই উচু (low relief)।

এই বিশেষত্বগুলির উদাহরণ চণ্ডী জাগো ও চণ্ডি পনতরনের ভাস্কর্য হইতে পাওয়া যায়।

লরা-জোংরং ও পনতরনে রামায়ণের খোদিত ফলকের তুলনা করিলেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে এই দুই স্থানের শিল্প প্রণালীর মধ্যে কতখানি প্রভেদ ছিল। শিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের এই রকম নিকৃষ্ট অবনতি যে শুধু কালের ব্যবধানে হইয়াছিল ইহা ধারণা করা কঠিন। ইহার প্রকৃত কারণ স্থানীয় প্রভাবের আতিশয্য। অর্থাৎ মধ্য-জাভায় ভারতীয় পদ্ধতি অনুসরণে যে শিল্প প্রচলিত ছিল নবম-দশম খ্রীষ্টাব্দে তাহার প্রাধান্য কমিয়া যায় ও তাহার পরিবর্তে পূর্ব-জাভায় শিল্পের মধ্যে এখানকার নিজস্ব স্থানীয় উপকরণের প্রভাব খুব বেশী পড়ে।

অবশ্য পূর্ব-জাভায় অবস্থিত দেবদেবীর মূর্তিগুলিতে পুরানো শিল্প-রীতির চিহ্নও দেখা যায়। খোদিত ফলকগুলির ভিতর যে নিকৃষ্ট ধরনের মানুষের ও মাঝে মাঝে দেবতাদের মূর্তিগুলি দেখা যায় তাহাদের তুলনায় এখানে যে সব দেবদেবীর পৃথক মূর্তি পাওয়া যায় সেগুলি প্রাচীন শিল্পকলার অনুগামী।

সিংঘসারিতে প্রাপ্ত প্রজ্ঞাপারমিতা মুর্তিটি পূর্ব-জাভার ভাস্কর্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বহু-প্রশংসিত এই মূর্তিটির মুখের স্বর্গীয় ভাব ও স্থির সৌন্দর্য প্রাচীন জাভার শিল্পকলার কথা স্মরণ করায়।

সাধারণ দেবমূর্তি ব্যতীত এখানে আর এক শ্রেণীর দেবমূর্তি উল্লেখযোগ্য। এইগুলি প্রকৃত পক্ষে মানুষের প্রতিকৃতি। বেলহনে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তি এই শ্রেণীর মূর্তিগুলির একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কিন্তু শান্ত সমাহিত ভাবব্যঞ্জক বিষ্ণুমূর্তিটি একজন প্রকৃত মানুষের আকৃতি, দেবতার কল্পিত রূপ নহে। এই মূর্তিটি যে বিখ্যাত রাজা ঐর্লঙ্গের (১১শ খ্রীঃ) সে কথা মনে করিবার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে। মূর্তিটির গঠন-শৈলী সুন্দর এবং কলাবিন্যাসে উচ্চ মানের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। উপরোক্ত প্রজ্ঞাপারমিতা মূর্তিটি রাণী ডেডেসের প্রতিকৃতি হওয়া অসম্ভব নহে। আমষ্টার্ডামের কলোনিয়াল মিউজিয়ামে রক্ষিত শিবমূর্তিটি অনুষপতির প্রতিকৃতি বলিয়া মনে করা হয়। ইহাকে ত্রয়োদশ খ্রীঃ-র মূর্তি-ভাস্কর্যের (figure sculpture) শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা যাইতে পারে। কারণ ইহার মধ্যে গাম্ভীর্যের সহিত আদর্শ সৌন্দর্যের অপূর্ব সমাবেশ দেখা যায়। সিম্‌পিং-এর হরিহর মূর্তিটি খুব সুন্দর, ইহা কৃতরাজসের আকৃতির অনুরূপ।

মন্দিরগুলির ভগ্নাবশেষের মধ্যে অনেক পৃথক বা একত্রিত ভাবে স্বাভাবিক আদর্শে (naturalistic) গঠিত মূর্তি দেখা যায়। তাহাদের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য পরিষ্কার বোধগম্য না হইলেও বেশ বোঝা যায় যে পূর্ব-জাভার শিল্পে সৌন্দর্য-জ্ঞানের একেবারে অভাব ছিল না।

ফলকের মূর্তিগুলির গঠন-শৈলী নিকৃষ্ট ধরনের হইলেও অলঙ্কারের দিক দিয়া পূর্ব-জাভার ভাস্কর্য মাঝে মাঝে যথেষ্ট উচ্চ মানের পরিচয় দেয়।

পূর্ব ও মধ্য-জাভার শিল্পের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ইহা মোটামুটি নিশ্চিত ভাবে ধরিয়া লওয়া যায় যে পূর্ব-জাভার শিল্পের উৎপত্তি মধ্য-জাভা হইতেই হইয়াছে ; ইহা স্বাধীন ভাবে গড়িয়া উঠে নাই। অনেকের মতে ক্রমশঃ অধঃপতন এই পার্থক্যের কারণ। কিন্তু এই সঙ্গে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন— ইন্দোনেশিয়ার নিজস্ব সত্তা পূর্ব-জাভায় মধ্য-জাভা হইতে ভারতীয় কৃষ্টির দ্বারা অপেক্ষাকৃত কম প্রভাবান্বিত হইয়াছিল, সুতরাং কালক্রমে তাহাই আবার প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

বলির প্রাচীন মন্দিরগুলি কিরূপ ছিল ইহার আধুনিক কয়েকটি মন্দিরের চিত্র হইতে তাহার কতকটা ধারণা করা যাইবে। (গ্রন্থশেষে চিত্র দ্রষ্টব্য)

তৃতীয় ভাগ

চম্পা

প্রথম অধ্যায়

চম্পায় হিন্দু রাজত্বের পত্তন

চম্পার প্রাচীন হিন্দু রাজ্য আধুনিক আনাম (বর্তমান ভিয়েৎনাম) প্রদেশে (টনকিন ও কোচিন-চীন বাদে) অবস্থিত ছিল, কেবল এখানকার উত্তরাংশে অবস্থিত থানহোয়া, ভেঘ-আন ও হা-টিন এই তিনটি জেলা ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এইরূপে ইহা ১৮° হইতে ১০° উত্তর অক্ষরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পশ্চিমে পর্বতমালা ও পূর্বে সমুদ্র মধ্যে অবস্থিত এই সরু ভূখণ্ডটি বহু পর্বতশাখা দ্বারা বিভক্ত।

বহুসংখ্যক নদী-উপত্যকার উর্বরা ভূমিকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন উপনিবেশগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল। এক উপত্যকা হইতে অন্যটিতে স্থল-পথে যাতায়াত করার বিশেষ সুবিধা না থাকাতে ইহাদের মধ্যে সমুদ্রপথই সংযোগস্থাপনের একমাত্র উপায় ছিল, এবং মনে হয় এই কারণেই এই রাজ্যে স্বাধীনভাবে ও পরস্পরের সহিত সম্বন্ধবিহীন অনেকগুলি উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। বস্তুতঃ এই ধারণা যে একেবারে ভিত্তিহীন নহে, এখানে বিভিন্ন উপত্যকায় অবস্থিত প্রাচীন কীর্তি-সৌধগুলির একত্র সমাবেশ হইতে তাহা বোঝা যায়। কারণ এইগুলির বিন্যাসে একটির সহিত অপরটির কোনো মিল দেখা যায় না; আর রাজ্যের বিভিন্ন অংশে সর্বদা স্বাধীনতা লাভের চেষ্টাও এই ধারণার সমর্থন করে।

এখানকার আদিম অধিবাসী দুই শ্রেণীর ছিল। জাতি হিসাবে (ethnographically) তাহারা অবশ্য অষ্ট্রোনেশিয়ান (Austronesian) জাতির অন্তর্গত, কিন্তু এক শ্রেণী ছিল অসভ্য, বর্বর

ও অন্যদল ছিল সভ্য। এই শেষ শ্রেণীর লোকদের চাম নামে অভিহিত করা হইত এবং এই নাম হিন্দুরাজ্য চম্পা হইতে উদ্ভূত। হিন্দু উপনিবেশের আগে ইহাদের কি নাম ছিল তাহা জানা যায় না। চামরা অসভ্য অধিবাসীদের ঘৃণার চক্ষে দেখিত এবং তাহাদের স্থানীয় অন্যান্য নাম ছাড়াও ম্লেচ্ছ বা কিরাত বলিয়াও উল্লেখ করিত (শেষোক্ত আখ্যা তুইটি ভারতের বর্বর অধিবাসীদিগকে দেওয়া হয়)।

খ্রীষ্টপূর্ব ২১৪ অব্দেও সমস্ত টনকিন রাজ্য ও আনামের উত্তরাংশ চীনের অধীনে ছিল। এই স্থানের অধিবাসীরাই পরবর্তীকালের আনামাইট জাতি, যাহারা বহুবর্ষ চীনের অধীনে থাকার পর এক যথেষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন জাতিতে পরিণত হয়। ইহাদের সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে। অবশ্য এই সময় পর্যন্ত আনামাইট জাতি কুয়াঙ্গ-নাম প্রদেশের কোল ডি নুয়াজে-এর (Col de Nuages) উত্তরেই অবস্থান করিতেছিল। এই স্থানের দক্ষিণে স্থানীয় অসভ্য জাতির বাস ছিল কিন্তু প্রথম খ্রীষ্টাব্দেই দেখা যায় যে যথেষ্ট সংখ্যক চাম জাতীয় লোকেরা উত্তরে কুয়াঙ্গ-নাম পর্যন্ত নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। চীনের অধীন এই অংশের দক্ষিণ সীমানায় চামদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া চীনারা উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। খুব সম্ভব এই আক্রমণের ব্যাপারে চামরা চীনের অধীনস্থ তাহাদের স্বজাতীয় লোকদের সাহায্য পাইত।

সময়ে সময়ে এই আক্রমণ বেশ গুরুতর রূপ ধারণ করিত। ১৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় দশহাজার চাম চীনের অধীন সর্বদক্ষিণে অবস্থিত প্রদেশটি আক্রমণ করে এবং এখানে অবস্থিত তুর্গটি ভাঙিয়া ফেলিয়া সমস্ত প্রদেশটি লুঠপাট করে।

কিন্তু আভ্যন্তরিক কারণেই এ দেশে চীনের আধিপত্য নষ্ট হয়। কারণ সিয়াং-লিন-এর তুর্দান্ত চাম অধিবাসীরা প্রায়ই বিদ্রোহ করিত। ১০০ খ্রীষ্টাব্দে ইহাদের প্রায় তুই হাজার অধিবাসী চীন

অধিকৃত উত্তরাংশ আক্রমণ করে। তাহারা বহু চীনা কর্মচারী হত্যা করে ও অনেক গ্রাম নষ্ট করে; কিন্তু চীনা সৈন্যদলের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই পলায়ন করে। ক্রমশঃ তাহাদের সাহস বাড়িয়া উঠে এবং ১৯২ খ্রীষ্টাব্দে সিয়াং-লিন-এর কিউ লিয়েন নামে এক ব্যক্তি শহরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে হত্যা করিয়া নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করে।

কুয়াংনামের দক্ষিণে অবস্থিত আধুনিক ট্রা-কিউ শহরটি চীনাদের কাছে সিয়াং-লিন্ নামে পরিচিত ছিল এবং চামরা ইহাকে চম্পা নগরী, চম্পাপুর বা শুধু চম্পা নামে অভিহিত করিত। কাজেই দেখা যায় যে কুয়াংনামে প্রথম চাম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বোধ হয় এই কারণেই ইহার নিকটবর্তী মাইসোন এবং ডোঙ্গ-ডুওঙ্গ নামক স্থানে সুন্দর কতকগুলি মন্দির নির্মিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম যুগের হিন্দু রাজত্ব

১। চম্পাপুরের রাজন্য-বৃন্দ

সফলতার সহিত চীন-অধিকৃত রাজ্য আক্রমণ ও একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা হইতেই বুঝা যায় যে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে চামদের ভিতর এক নূতন জাগরণ হইয়াছিল এবং জাগরণের মূলে ছিল ভারতীয় উপনিবেশকারীরা।

এই রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় হইতে পঞ্চদশ খ্রীঃ শতকে আনামাইট-দিগের নিকট পরাজিত হওয়ার সময় পর্যন্ত চামরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আর কোনও বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে নাই। তাহারা সম্পূর্ণরূপে বিদেশী ভারতীয়দের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল এবং তাহাদের রীতি, নীতি, ভাষা, ধর্ম সমস্তই এই বিদেশীদের

অনুরূপ হইয়া পড়িয়াছিল। কালক্রমে রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতীয়দের সাথে ইহাদের মিলন হইয়াছিল, আবার সংস্কৃতির দিক দিয়াও এই দুই জাতি সম্পূর্ণ এক হইয়াছিল।

এই দেশে প্রথম যে হিন্দু রাজার সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানা যায় তাঁহার নাম শ্রীমার এবং তিনি খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। খুব সম্ভব চীনা ইতিহাসে উল্লিখিত কিউ-লিয়েন ও শ্রীমার একই ব্যক্তি।

চম্পার প্রথম দিকের হিন্দু রাজাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে চীনের আভ্যন্তরিক গোলযোগ ও ২২০ খ্রীঃ হান সাম্রাজ্যের পতনের সুযোগে ইঁহারা নিজেদের রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিস্তৃত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ২২০ হইতে ২৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কিয়াচের (টনকিন) শাসকের আমন্ত্রণে চম্পার রাজা ঐ স্থানে দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও দেখা যায় যে ২৪৮ খ্রীষ্টাব্দে চাম নৌবাহিনী ঐ প্রদেশের রাজধানী আক্রমণ করিয়া কয়েকটি শহর লুটপাট করে এবং যে নৌবাহিনী তাহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিল তাহাও পরাজিত করে। অবশেষে এক সন্ধি হইল ও ইহার শর্ত অনুসারে কিউ-সু (আধুনিক থুয়া-থিয়েন প্রদেশ) চম্পা রাজ্যের হস্তগত হইল।

চীনা ইতিহাসে এই সময়কার চম্পা দেশের অনেক রাজার নাম পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি নামের আরম্ভে 'ফান' শব্দটি দেখা যায়। খুব সম্ভব ইহা ভারতীয় 'বর্মনের' প্রতিশব্দ, কারণ এই উপাধিটি পরবর্তী কালে প্রত্যেক চাম রাজা গ্রহণ করিতেন ২৭০ হইতে ২৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রাজা ফান হিয়োঙ্গ চম্পার সিংহাসন লাভ করেন; সম্ভবতঃ তিনি মাতৃকুলের দিক দিয়া শ্রীমারের উত্তরাধিকারী ছিলেন। এই রাজাও উত্তর দিকে রাজ্য বিস্তারের নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশে তিনি ফু-নানের (কাম্বোডিয়ায় অবস্থিত) রাজার সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ

হইয়াছিলেন এবং অবিরত টনকিনে অবস্থিত চীনা রাজ্য লুঠতরাজ করিতে লাগিলেন। দশ বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত সংগ্রামের ফলে চীনাদের অবস্থা সংকটাপন্ন হইল। অবশেষে ২৮০ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধি হইল। খুব সম্ভব ইহার শর্তগুলি চীনাদের অনুকূলে ছিল না।

ফান হিয়োঙের পরে তাঁহার পুত্র ফান-য়ি রাজা হইলেন। তিনি অনেক দিন শান্তিতে রাজত্ব করিয়াছিলেন, এবং এই দীর্ঘকাল সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ও রাজ্য রক্ষার ব্যবস্থাগুলি দৃঢ়তর করিতে নিয়োগ করিয়াছিলেন। চাম রাজাদের মধ্যে এই রাজা প্রথম চীন সম্রাটের দরবারে দূত প্রেরণ করেন (২৮৪ খ্রীষ্টাব্দে)।

ফান-য়ি ৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতি ফান ওয়েন সিংহাসন অধিকার করেন। ওয়েন একজন দক্ষ শাসক ছিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই রাজ্যের মধ্যে যে সব অসভ্য জাতিরা স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল তাহাদের পরাজিত করিয়া নিজেকে সমস্ত রাজ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজা রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। যাহাতে হোয়ান সোন (Hoan Sonh) পর্বত চীন ও চাম রাজ্যের সীমানা বলিয়া গণ্য করা হয় সেই অনুরোধ করিয়া তিনি ৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে চীনের সম্রাটের নিকট দূত পাঠাইলেন। এই অনুরোধের অর্থ হুট নাম (Nhut Nam)-এর (আধুনিক থুয়া থিয়েন, কুয়াঙ্গ-ত্রি ও কুয়াঙ্গ বিন) উর্বরা ভূমি চম্পাকে দান করা এবং ইহা খুব স্বাভাবিক যে চীন সম্রাট এই অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। যখন এই দিক দিয়া সুবিধা হইল না তখন ওয়েন বলপূর্বক এই জায়গাগুলি অধিকার করা স্থির করিলেন। আগে হইতেই হুট নাম (Nhut Nam)-এর অধিবাসীরা চীনা শাসকের অন্যায় দাবিতে অসন্তুষ্ট ছিল এবং এই অবস্থার সুযোগে ফান ওয়েন ৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দে হুটনাম আক্রমন করিলেন ও ইহা অধিকার করিলেন। ৩৪৯ খ্রীষ্টাব্দে আর একটি বিরাট চীনা বাহিনীকে ফান ওয়েন পরাজিত করেন কিন্তু এই যুদ্ধে

নিজেও আহত হন এবং ঐ বৎসরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ফান ওয়েন পোর্তে দে আনাম (Porte de Annam) পর্যন্ত জয় করেন এবং চম্পা রাজ্য এই সময়েই উত্তরদিকে দূরতম সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

পরবর্তী দুই রাজা ওয়েনের পুত্র ফান ফো (৩৪৯-৮০ খ্রী) ও ফান-হু-টা-এর (৩৮০-৪১৩ খ্রীঃ) সময়ে প্রায় অবিচ্ছিন্ন ভাবে চীনাদের সঙ্গে যুদ্ধ চলিয়াছিল। ফান ফো-এর সময়ে ৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দে চীনারা চামদের যুদ্ধে হারাইয়া প্রায় চম্পা শহরের প্রাচীর সীমানা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। ৩৫৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি সন্ধি হয় ও ইহার শর্ত অনুযায়ী ন্হুট নাম (Nhut Nam) প্রদেশটি চীনাদের ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

প্রথম দিকে ফান-হু-টা চীনাদের বিরুদ্ধে কিছুটা সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি শুধু যে পুনরায় ন্হুট নাম জয় করেন তাহা নয়, আরও উত্তরে থান হোয়া পর্যন্ত অগ্রসর হন। কিন্তু ৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে কিয়াও চে (Kiao-Che)-এর চীনা শাসক এক বিরাট যুদ্ধে ফান-হু-টাকে পরাজিত করে এবং থান হোয়া অবরোধ করে। শহরের নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের চূড়া দখল করিয়া সে বড় বড় গাছ ফেলিয়া নদীপথ বন্ধ করিয়া দেয়। প্রায় শহরের প্রাচীরের নীচেই আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ চলিতে থাকে। চীনা শাসক শত্রুপক্ষের বহু লোক আহত ও নিহত করিয়া পিছাইয়া আসে, কিন্তু শহরটি দখল করিতে পারে নাই।

ফান-হু-টার রাজত্বের শেষ ভাগে কি হইয়াছিল সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে এই রাজা যে একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন এবং প্রথমে বিপর্যস্ত হইলেও শেষ পর্যন্ত রাজ্যের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার জীবনের সর্বপ্রধান কার্য কিউ সু শহরটি দেওয়াল দিয়া ঘিরিয়া সুরক্ষিত করা; ইহার ভগ্নাবশেষ এখনও হুয়ে (Hue) শহরের দক্ষিণ-পূর্বে দেখা যায়।

যাঁহাকে চীনারা ফান-হু-টা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে তিনি ও চম্পার লেখ-তে উল্লিখিত রাজা ভদ্রবর্মন খুব সম্ভব একই ব্যক্তি। এই মত হয়তো ঠিক নাও হইতে পারে কিন্তু ভদ্রবর্মন চম্পার প্রাচীন রাজাদের মধ্যে যে একজন শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার পুরা নাম ছিল ধর্ম-মহারাজ শ্রীভদ্রবর্মন। উত্তর ও মধ্যভাগে অমরাবতী ও বিজয় এই দুই প্রদেশ এবং সম্ভবতঃ দক্ষিণের পাণ্ডুরঙ্গ প্রদেশও তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। মাই-সোনে ভদ্রেশ্বরস্বামী-মন্দির নামে একটি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্যই তাঁহার নাম অমর হইয়া আছে। এই মন্দির কালে চামদের জাতীয় দেবালয়ে পরিণত হইয়াছিল, এবং রাজার নাম অনুসারে ইষ্ট দেবতার নামকরণের যে প্রথা তিনি আরম্ভ করেন তাহা পরবর্তী কালে প্রায় সর্ববাদীসম্মতরূপে গৃহীত হইয়াছিল। ভদ্রবর্মনকে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়া মনে হয় এবং একটি লেখতে পরিষ্কার বলা হইয়াছে যে তিনি চারিটি বেদই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

চীনা বিবরণ হইতে জানা যে ফান-হু-টার পরে ৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র টি-চেন সিংহাসন আরোহণ করেন। এই রাজার ভাই টি-কাই তাহার মাকে লইয়া রাজ্য হইতে চলিয়া যায় এবং রাজা তাহাদের ফিরাইয়া আনিতে ব্যর্থকাম হন। মনের দুঃখে রাজা ভ্রাতুষ্পুত্রকে রাজ্য দান করিয়া ভারতবর্ষে চলিয়া যান। রাজার রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার পরেই চম্পা রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়। ইহার ফলে হত্যাকাণ্ড ও দ্রুত গতিতে রাজ-পরিবর্তন ঘটে। এবং আশি বৎসরের বেশি (৩৩৬—৪২০ খ্রীঃ) রাজত্ব করার পর চম্পা রাজ্যে এই রাজবংশের অবসান হয়। চম্পার একটি লেখ হইতে জানা যায় যে জীবনের অবশিষ্ট কয়দিন গঙ্গাতীরে কাটাইবার জন্য গঙ্গারাজ নামক এক রাজা সিংহাসন ত্যাগ করেন। টি-চেন ও গঙ্গারাজ খুব সম্ভব একই ব্যক্তি।

ফান ইয়াং-মাই-এর সিংহাসন আরোহণের (৪২০খ্রীঃ) সময় হইতে গৃহ-যুদ্ধের অবসান হয়, কিন্তু ইঁহার রাজা হইবার আগেকার জীবনের বৃত্তান্ত কিছুই জানা যায় না। চামরা চীনাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ সমান ভাবেই চালাইতে লাগিল এবং ইহাতে লুটতরাজ, খুন, অমানুষিক নিষ্ঠুরতা কিছুই বাদ ছিল না। অবশেষে ৪২০ খ্রীষ্টাব্দে চীনারা চামদের দারুণ ভাবে পরাজিত করিল। ইয়াং-মাই কয়েক বৎসরের মধ্যেই মারা যান ও তাঁহার পুত্র রাজ্যলাভ করেন; ইহারও নাম ছিল ইয়াং-মাই। চীনাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চলিতে থাকিল এবং ৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় ইয়াং-মাই হুট-নাম-এর উপকূল লুঠ করার উদ্দেশ্যে শতাধিক রণতরী প্রেরণ করেন। এই ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া চীনা শাসনকর্তা স্থল ও জল-পথে চম্পা আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। দ্বিতীয় ইয়াং-মাই তখন বিবাহ করিতে অন্যত্র গিয়াছিলেন। এই খবরে তাড়াতাড়ি জল পথে ফিরিবার সময় চীনা নৌবহরের কবলে পড়েন। একটি তীরের আঘাতে তাঁহার প্রধান জাহাজ পরিচালকের মৃত্যু হয় এবং নৌবাহিনীও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার জন্য চীনা নৌবাহিনী আর অগ্রসর হইতে পারিল না এবং স্থল-পথে যে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিল তাহাও ফিরাইয়া আনিল (৪৩১ খ্রীঃ)।

এই যুদ্ধের ফলাফলে দ্বিতীয় ইয়াং-মাই খুবই উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষার কোনো সীমা রহিল না। প্রতি বৎসর তাঁহার সৈন্যরা টন্‌কিন্ আক্রমণ করিতে লাগিল যদিও তিনি চীনা সম্রাটকে নিয়মিত কর দিতেন তথাপি অবশেষে সম্রাট এই অধীনস্থ উদ্ধত রাজাকে শায়েস্তা করিবার জন্য একদল সৈন্য পাঠানো ঠিক করিলেন। তিন বৎসর ধরিয়া এই অভিযানের আয়োজন চলিল এবং ৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দে চীনা সৈন্য চম্পা আক্রমণ করিল। চীনা সেনাপতি অগ্রসর হইয়া চম্পার প্রধান সুরক্ষিত ঘাঁটি কিউ-সু অবরোধ করিল। ফান-ফু-লঙ্গ-এর উপর এই শহরটির

রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল এবং ইহাকে সাহায্য করিবার জন্য দ্বিতীয় ইয়াং-মাই একদল সৈন্য পাঠাইলেন। প্রথম দিকে চামরা কিছুটা সাফল্য লাভ করিলেও শেষ পর্যন্ত চীনারা এই ঘাঁটিটি দখল করে। চীনারা পরাজিত সেনাপতি ফান-ফু-লঙ্গ-এর শিরশ্ছেদ করিল এবং পনর বৎসরের অধিক বয়স্ক সমস্ত চাম অধিবাসীকে হত্যা করিল। প্রাসাদের ঘরগুলি রক্তে ও প্রাঙ্গন মৃতদেহে ভরিয়া গেল। বহু সোনা, রূপা ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিস বিজয়ী সৈন্যরা লাভ করিল।

চীনা সৈন্যেরা রাজ্যের ভিতরে অগ্রসর হইল এবং ইয়াং-মাই স্বয়ং একদল সৈন্য লইয়া তাহাদের বাধা দিলেন। ইয়াং-মাইর সৈন্যদের সম্মুখে একদল হাতি ছিল এবং ইহাদের দেখিয়া চীনা সৈন্যরা ভয় পাইল। কিন্তু একজন চীনা সৈন্যাধ্যক্ষের কৌশলে এই বিপদের মীমাংসা হইল। সে কাগজ ও বাঁশ দিয়া কতগুলি সিংহের মূর্তি বানাইয়া হাতিগুলির দিকে ছুড়িয়া মারিল ভয় পাইয়া হাতির দল পলাইতে আরম্ভ করিল ও ইহাতে চম্পার সৈন্যদের মধ্যে ভয় ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। ইয়াং-মাই ভীষণভাবে পরাজিত হইয়া পুত্রকে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইয়া গেলেন। জয়ী চীনা সেনাপতি রাজধানী চম্পাপুরে প্রবেশ করিল ও মূল্যবান জিনিসপত্র লুঠ করিল। সমস্ত দেশ অধিকৃত হইল, মন্দিরগুলি লুণ্ঠিত হইল ও মূর্তিগুলি গলাইয়া চীনারা প্রায় সোয়া হাজার মণ খাঁটি সোনা পাইল। এইরূপে চীনারা সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইল।

চীনা সৈন্য চলিয়া গেলে পর ইয়াং-মাই রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু শহরের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া ভগ্ন-হৃদয়ে ৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণ ত্যাগ করেন।

দ্বিতীয় ইয়াং-মাইর পর যথাক্রমে তাঁহার পুত্র ও পৌত্র রাজা হন। তাঁহার পৌত্র ফান চেন-চেং শান্তিপুর্ণ নীতি অবলম্বন করিলেন এবং অন্তত পক্ষে তিনবার (৪৫৬, ৪৫৮ ও ৪৭২ খ্রীঃ) চীন সম্রাটের

দরবারে দূত প্রেরণ করেন। দূতের হাতে মূল্যবান উপঢৌকন পাইয়া সম্রাট খুব খুশি হ'ন এবং দূতকে নানা রকম উচ্চ সম্মান ও উপাধিতে ভূষিত করেন।

ফান চেন-চেং এর মৃত্যুতে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই সুযোগে ফান ত্যাং-কেন-চুয়েন অথবা কিউ-চেউ-লো নামে এক ব্যক্তি সিংহাসন আরোহণ করেন। এই ব্যক্তি ফুনানের রাজা জয়বর্মনের পুত্র। তিনি নিজের দেশে কতগুলি অন্যায় কাজ করিয়া পিতার রাজ্য হইতে পলাইয়া চম্পায় আশ্রয় নিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় ফান ইয়াং-মাইর প্রপৌত্র ফান চু-নঙ্গ এই ব্যক্তিকে পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত করিলেন। ফান চু-নঙ্গ ও তাঁহার পরবর্তী তিন জন রাজার রাজ্যকালে বিশেষ কিছু ঘটে নাই। এই বংশের সর্ব-শেষ রাজা বিজয়বর্মন ৫২৬ ও ৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে দুইবার চীনে দূত পাঠাইয়াছিলেন। বিজয়বর্মনের পর রুদ্রবর্মন রাজা হন। তিনি নিজেকে গঙ্গারাজের বংশধর বলিয়া দাবি করিতেন। এই গঙ্গারাজ শেষ জীবনে ভারতে গঙ্গাতীরে অতিবাহিত করিবার জন্য রাজ্য ত্যাগ করিয়াছিলেন। রুদ্রবর্মন ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় বংশীয় ছিলেন এবং রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার উদ্দেশ্যে ৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে চীন সম্রাটের অনুমতির জন্য কর-সহ দূত পাঠান। তিনি ৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আবার কর পাঠান।

রুদ্রবর্মনের পরে তাঁহার পুত্র প্রশস্তধর্ম রাজা হন এবং অভিষেক কালে শম্ভুবর্মন নাম গ্রহণ করেন। চেন বংশের অধীনে চীন সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে শম্ভুবর্মন নিয়মিত কর দেওয়া বন্ধ করেন, কিন্তু ৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সুই রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইলে পর আবার কর দিতে শুরু করেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি চীনা আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইলেন না। সেনাপতি লিউ ফাঙ্গ জল ও স্থল-পথে দুই দিক দিয়াই তাঁহার রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং ৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে লিন গিয়াং নদীর খাড়িমুখে পৌঁছিলেন। যে গিরিসংকটগুলি

লিন গিয়াং ও দোলে (Do-le) উপত্যকা দুইটি বিভক্ত করিয়াছে শম্ভুবর্মন সেই পথগুলিতে সৈন্য মোতায়েন করিলেন। লিউ ফাঙ্গ ইহাদের পরাজিত করিয়া দোলে উপত্যকায় শিবির স্থাপন করিলেন। এইবার সহজেই নদী পার হইয়া কয়েক মাইল দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া চীনা সেনাপতি শত্রু পক্ষের সৈন্যদের নাগাল পাইলেন এবং এই সময় ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হস্তী-বাহিনীর উপর চামদের বিশেষ আস্থা ছিল, কিন্তু চীনা সৈন্যদের তীরে আহত হইয়া তাহারা বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে এবং চাম সৈন্যদেরই পদদলিত করিতে থাকে। শম্ভুবর্মন যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন। চীনারা প্রায় ১০,০০০ লোক বন্দী করে এবং তাহাদের বাম কানটি কাটিয়া দেয়। লিউ ফাঙ্গ বিজয়ে উল্লসিত হইয়া আরও অগ্রসর হন এবং কিউ সু (Kiu Su) দখল করেন। এই জায়গার নিকটে আরও কয়েকটি যুদ্ধে শম্ভুবর্মনকে পরাজিত করিয়া তিনি রাজধানী চম্পাতে পৌঁছেন (৬০৫ খ্রীঃ)। শম্ভুবর্মন সমুদ্রপথে পলায়ন করেন। লিউ ফাঙ্গ রাজধানী লুঠতরাজ করিলেন ও এখানে যতগুলি অধিবাসীকে ধরিতে পারিলেন সবাইকে বন্দী করিলেন। ইহা ছাড়া তিনি ১৩৫০ খানি বৌদ্ধগ্রন্থ ও শম্ভুবর্মনের পূর্ববর্তী আঠার জন রাজার স্বর্ণফলকগুলি সংগ্রহ করিলেন। তাঁহার বন্দীদের মধ্যে কয়েকজন ফু-নানের বাদ্যকর ছিল এবং ইহারা চীনে ভারতীয় সংগীত-কলা প্রচার করিল।

আক্রমণকারীরা চলিয়া যাইবার পরেই শম্ভুবর্মন রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং আর যাহাতে কোনো বিরোধ না হয় এই জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া চীন সম্রাটের দরবারে দূত পাঠাইলেন। কিন্তু পরে আবার তিনি রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করেন, তবে টাং (T'ang) রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত (৬১৮ খ্রীঃ) হইবার পর ৬২৩, ৬২৫ ও ৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে চীন দরবারে দূত পাঠান। শম্ভুবর্মনের পরে ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র কন্দর্পধর্ম (চীনা নাম ফান তেউ লি, Fan

T'eu Li) রাজা হন। ইঁহার রাজ্যকালে রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। তিনি নিয়মিত কর দিয়া চীনের সহিত শান্তি বজায় রাখিলেন। কন্দর্পধর্মের পুত্র ও উত্তরাধিকারী প্রভাসধর্মের (চীনা নাম ফান চেন লং, Fan Chen-Long) পরিণাম অত্যন্ত শোচনীয়।

চীনাদের কাছে পরাজয়ের ফলে শম্ভুবর্মনের ক্ষমতা যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছিল। সকল সময়েই এই ধরণের বিপর্যয় উচ্চাভিলাষীদের পক্ষে সুযোগ, এবং এই ক্ষেত্রে চম্পার সিংহাসন লাভ করিবার জন্য রাজবংশের মেয়েদের দিক দিয়া উত্তরাধিকারীরা উপায় খুজিতে লাগিল। শম্ভুবর্মনের রাজত্বের সময় রুদ্রবর্মনের দৌহিত্র সত্যকৌশিকস্বামীর সহিত কন্দর্পবর্মের কন্যার বিবাহ হওয়ায় স্ত্রী শাখার দিক দিয়া দুই দল উত্তরাধিকারীর মিলন হইল। কন্দর্পধর্মের মৃত্যুর পরই সম্ভবত ইহারা সিংহাসন লাভের চেষ্টা করে কিন্তু বিফল হইয়া কাম্বোজ রাজ্যে আশ্রয় লয়। কিন্তু কয়েক বৎসর পরেই আবার নূতন করিয়া চেষ্টা করা হয় ও প্রভাসধর্ম এবং রাজ বংশের সমস্ত পুরুষদের হত্যা করা হয় (৬৮৫ খ্রীঃ)। সত্যকৌশিকস্বামী প্রথমে সিংহাসন অরোহণ করেন কিন্তু রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলে তাঁহার স্ত্রী রাজ্যভার গ্রহণ করেন। রাজ্যের এই বিশৃঙ্খল অবস্থায় একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করা মোটেই সম্ভবপর ছিল না, কাজেই সত্যকৌশিকস্বামী আবার চম্পায় ফিরিয়া আসেন। খুব সম্ভব পর পর এই সমস্ত ঘটনার মধ্যে কাম্বোজের রাজার যথেষ্ট হাত ছিল। নূতন রাজার দল অনেকদিন হইতে ঘনিষ্ঠভাবে কাম্বোজ দরবারের সহিত পরিচিত ছিল। কারণ সত্যকৌশিকস্বামীর পিতা কতকগুলি অন্যায় কাজ করিয়া চম্পা হইতে কাম্বোজে পলাইয়া যান এবং সত্যকৌশিকস্বামীর পৌত্র জগদ্ধর্মের সহিত কাম্বোজ-রাজ ঈশানবর্মনের কন্যা শর্বাণীর বিবাহ হইয়াছিল।

মধ্যে কিছুদিন বাদ দিয়া সত্যকৌশিকস্বামী ৬৪৫ হইতে ৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আট বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র ও পৌত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন কিনা ঠিক বলা বায় না, তবে করিয়া থাকিলেও খুব অল্প দিনের জন্য। কারণ, দেখা যায় যে ৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে জগদ্ধর্ম ও শর্বাণীর পুত্র প্রকাশধর্ম—বিক্রান্তবর্মন নামে সিংহাসন আরোহন করিয়াছিলেন। তিনি ৬৫৩, ৬৫৭, ৬৬৯, ও ৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে চীনে দূত পাঠান। প্রথম প্রকাশধর্ম-বিক্রান্তবর্মনের পরবর্তী রাজার নাম ঠিকভাবে জানা যায় না, তবে নিম্নবর্তী রাজবংশ-তালিকা সম্ভবপর বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

প্রথম প্রকাশধর্ম-বিক্রান্তবর্মন
|
নরবাহনবর্মন
|
দ্বিতীয় বিক্রান্তবর্মন

প্রকাশধর্মের সর্বশেষ যে তারিখ জানা যায় তাহা ৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দ, এবং দ্বিতীয় বিক্রান্তবর্মনের সর্বপ্রথম তারিখ ৭১৩ খ্রীষ্টাব্দ। কাজেই নরবাহনবর্মনের রাজ্যকাল এই দুই তারিখের মধ্যেই ছিল।

সম্ভবত দ্বিতীয় বিক্রান্তবর্মনের পরে দ্বিতীয় রুদ্রবর্মন সিংহাসন লাভ করেন। তিনি ৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে চীন দরবারে কর পাঠান। ইহা ছাড়া ইঁহার সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। ৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বা ইহার কাছাকাছি সময়ে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং সম্ভবত ইহার সঙ্গে সঙ্গেই ৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম রুদ্রবর্মন যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহার সমাপ্তি হয়।

এই রাজবংশের লেখগুলি সবই মাইসোনের নিকটবর্তী অঞ্চলে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের ক্ষমতা প্রায় সমস্ত রাজ্যেই বিস্তৃত ছিল। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এই রাজবংশের কেন্দ্র ছিল কুয়াংনাম প্রদেশে এবং মাইসোন এই প্রদেশের অন্তর্গত।

পাণ্ডুরঙ্গ রাজবংশ

দ্বিতীয় রুদ্রবর্মনের পরে চম্পা রাজ্য এক নূতন রাজবংশের অধীনে গেল। এই বংশের রাজগণ প্রথমে দক্ষিণ দিকে কৌঠার নামক রাজ্যের রাজা ছিলেন, কিন্তু পরে সমস্ত চম্পা রাজ্যে ইঁহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম পৃথিবীন্দ্র-বর্মন। অনেকদিন রাজত্ব করার পর ৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্বে ইঁহার মৃত্যু হয়। তাহার পর তাঁহার ভাগিনেয় সত্যবর্মন রাজা হন।

এই নূতন রাজার সময়ে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা জাভার নৌবাহিনী কর্তৃক চম্পা রাজ্য আক্রমণ। এই আক্রমণে চম্পা রাজ্যের প্রভূত ক্ষতি হয়; বিশেষ করিয়া একটি শিবমুখলিঙ্গের মন্দির একেবারে বিনষ্ট হয়। প্রচলিত প্রবাদ ছিল যে দ্বাপর যুগের ৫৯১১ বৎসরে রাজা বিচিত্রসগর এই মন্দিরটি তৈয়ারী করিয়াছিলেন এবং এই জন্য ইহা একটি বিশিষ্ট পবিত্রস্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। ৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে যবদ্বীপ হইতে "জাহাজে করিয়া নরখাদকের দল আসিয়া এই মন্দিরটি পোড়াইয়া ফেলে" এবং মূর্তি ও অন্যান্য সম্পত্তি লইয়া যায়। সত্যবর্মন নিজের রণতরী লইয়া আক্রমণকারীদের পিছু ধাওয়া করেন ও পরাজিত করেন। কিন্তু তখন দেখা গেল যে শত্রুরা শিবমুখ ও মন্দিরের সমস্ত সম্পত্তি জলে ফেলিয়া দিয়াছে। বিজয়ী সত্যবর্মন পুরাতন মূর্তিটি উদ্ধারে সমর্থ না হওয়ায় ৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি নূতন শিবমুখলিঙ্গ ও অন্যান্য কয়েকটি দেবতার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং মন্দিরের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচুর ধনসম্পত্তি দান করেন। এই কারণে তাঁহাকে দ্বিতীয় বিচিত্রসগর অথবা উক্ত নামধারী প্রথম রাজার অবতার বলিয়া মনে করা হইত।

সত্যবর্মনের পরে তাঁহার ছোট ভাই ইন্দ্রবর্মন রাজা হন। তাঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে সমস্ত চম্পা রাজ্য তাঁহার অধীনে ছিল এবং বহু শত্রুর সহিত তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার

পূর্ববর্তীর ন্যায় তাঁহার রাজ্যকালেও জাভা নৌবাহিনী চম্পা আক্রমণ করে। ৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যের বিখ্যাত দেবতা ভদ্রাধিপতীশ্বরের মন্দির তাহারা পোড়াইয়া দেয়। সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে কয়েক হাজার বৎসর ধরিয়া এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজা ইন্দ্রবর্মন ৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে এই মূর্তি ইন্দ্রভদ্রেশ্বর নামে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বহু মূল্যবান ধনসম্পত্তি দান করেন। ইহা ছাড়া আরও অনেক পুণ্য প্রতিষ্ঠানে ইন্দ্রবর্মন সম্পত্তি দান করেন। প্রথমতঃ তিনি বীরপুরে ইন্দ্রভোগেশ্বর মূর্তি স্থাপন করেন। ইহার পর ৮০১ খ্রীষ্টাব্দে সত্যবর্মন-নির্মিত একটি মন্দিরে ইন্দ্রপরমেশ্বর মূর্তি স্থাপন করেন ও নানাবিধ মূল্যবান জিনিস এখানে দান করেন। সর্বশেষে ইন্দ্রবর্মন শংকর-নারায়ণ (হরিহর) মূর্তিকে বহু মূল্যবান জিনিষপত্র দান করেন।

ইন্দ্রবর্মনের পর তাঁহায় ভগ্নীপতি হরিবর্মন রাজা হন। তাঁহার সম্পূর্ণ নাম ছিল বীরজয়শ্রী হরিবর্মদেব এবং তিনি রাজাধিরাজ শ্রীচম্পাপুরপরমেশ্বর এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে তিনি হোয়ান (Hoan) এবং অই (Ai) নামে দুইটি চীনা প্রদেশ জয় করেন এবং ৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করেন কিন্তু চীনা শাসনকর্তা তাঁহাকে দারুণ ভাবে পরাজিত করিয়া হঠিয়া যাইতে বাধ্য করে, এবং এই দুই প্রদেশের যে সমস্ত লোক চম্পার রাজাকে সাহায্য করিয়াছিল তাহাদের উপর ভীষণ ভাবে প্রতিশোধ নেয়।

হরিবর্মন তাঁহার পুত্র বিক্রান্তবর্মনের উপর পাণ্ডুরঙ্গ (অধুনা ফানরং) প্রদেশের শাসনভার দেন কিন্তু এই দায়িত্বপূর্ণ কাজের পক্ষে তাহার বয়স নিতান্ত কম থাকাতে পার নামে এক জন সেনাপতিকে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত করা হয়। এই সেনাপতি তাহার কিশোর প্রভুর পক্ষ হইয়া কাম্বোজ দেশ আক্রমন করে ও কাম্বোজের শহরগুলি লুঠতরাজ করে।

হরিবর্মন প্রায় ৮০০ হইতে ৮২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার পর তাঁহার পুত্র ও রাজা সত্যবর্মন এবং ইন্দ্রবর্মনের ভাগিনেয় তৃতীয় বিক্রান্তবর্মন রাজা হন। অপুত্রক তৃতীয় বিক্রান্তবর্মনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীন্দ্রবর্মন-প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের শেষ হয়। এই রাজবংশ অষ্টম খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি হইতে নবম খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি প্রায় এক শতাব্দীকাল প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই রাজ্যের প্রধান কেন্দ্র দক্ষিণে অবস্থিত ছিল এবং ইহা পাণ্ডুরঙ্গ রাজবংশ নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু তখন পর্যন্তও চম্পাপুরে প্রধান রাজধানী অবস্থিত ছিল।

ভৃগু রাজবংশ

ইহার পর যে নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা খুব সম্ভব দ্বিতীয় ইন্দ্রবর্মন প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা যায় না। ৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এই রাজার ডঙ্গ ডুওঙ্গ (Dong Duong) লেখতে যে বংশ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহা নিম্নরূপ ঃ

"পরমেশ্বরের পুত্রের ঔরসে (বা বংশে) পৃথিবীর রাজা উরোজ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র সৌভাগ্যবান ও বুদ্ধিমান ধর্মরাজ। তাঁহার পুত্র বুদ্ধিমান রাজা শ্রীরুদ্রবর্মন। ইঁহারই পুত্র বহুবিখ্যাত শ্রীভদ্রবর্মন। ভদ্রবর্মনের পুত্র শ্রীইন্দ্রবর্মন মহেশ্বরের কৃপায় চম্পা রাজ্য লাভ করেন।"

এইরূপে ভগবান হইতেই এই রাজবংশের উৎপত্তি (Divine Origin) এরূপ বলা হইয়াছে। অন্যত্র এই বংশ ভৃগু-বংশ নামে পরিচিত। কারণ এই লেখতেই বলা হইয়াছে যে মহাদেব নিজে ভৃগুকে চম্পায় পাঠান।

প্রথমে রাজার নাম ছিল 'শ্রীলক্ষ্মীন্দ্র ভূমীশ্বর গ্রামস্বামিন' কিন্তু চম্পা রাজ্য লাভ করার পরে তাঁহার নাম হইল শ্রীজয় ইন্দ্রবর্মা

মহারাজাধিরাজ। ডঙ্গ ডুওঙ্গ (Dong Duong) লেখতে রাজার ভূয়সী প্রশংসা করা হইয়াছে এবং এই লেখটি একটি মঠ ও স্বভয়দ অর্থাৎ বুদ্ধের মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় উৎকীর্ণ হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে রাজা বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ছিলেন। অবশ্য চির প্রথামত শৈবধর্মেও রাজার আস্থা ছিল। কারণ এই লেখতে রাজার একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করার উল্লেখ ছাড়া শম্ভুভদ্রেশ্বরের স্তুতিও দেখা যায়।

তৃতীয় বিক্রান্তবর্মনের একটি জানা তারিখ ৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ ও দ্বিতীয় ইন্দ্রবর্মনের পরবর্তী রাজার রাজ্যকালের প্রথম যে তারিখ জানা যায় তাহা ৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ; কাজেই মনে হয় যে দ্বিতীয় ইন্দ্র বর্মন বহুকাল ধরিয়া শান্তিতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র জয় সিংহবর্মন সিংহাসন লাভ করেন বলিয়া জানা যায়, এবং তাঁহার দুইটি জানা তারিখ ৮৯৮ ও ৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ।

জয় সিংহবর্মনের সময়ের পাঁচটি লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু এই-গুলিতে তাঁহার ধর্মসংক্রান্ত দানের তালিকা ছাড়া রাজ্যের অন্য কোন ঘটনার উল্লেখ নাই। এইগুলিতে ইন্দ্রপুরের শোভা ও ধনদৌলতের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় ইহাই এই বংশের রাজধানীর স্থান অধিকার করিয়াছিল, যদিও চম্পা নগর তখনও প্রধান নগর বলিয়া পরিগণিত হইত।

জয় সিংহবর্মন জাভায় দূত পাঠান এবং এই রাজনৈতিক সম্বন্ধ তাঁহার পরবর্তী রাজারাও বজায় রাখিয়াছিলেন। তাঁহার পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীজয়শক্তিবর্মন রাজা হন, কিন্তু তিনি সম্ভবতঃ খুব অল্প দিন রাজত্ব করেন।

তাঁহার পরবর্তী রাজার নাম ভদ্রবর্মন। কিন্তু এই দুই রাজার কি সম্বন্ধ ছিল তাহা জানা যায় না। নান বিউ (Nhan Bieu) লেখতে তাঁহার যে পরিচিতি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে মনে হয় না যে তিনি অন্যায়ভাবে সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। কারণ জয় সিংহ-

বর্মনের রাণীর ভ্রাতুষ্পুত্র রাজদ্বার ভদ্রবর্মনের পূর্ববর্তী দুই রাজার সময়ের মতনই ভদ্রবর্মনের সময়ও রাজসভায় উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং এই সময়েও আবার তাঁহাকে জাভায় এক দৌত্যকার্যে প্রেরণ করা হইয়াছিল। ইহা হইতে অবশ্য কিছু নিশ্চিত ভাবে প্রমাণ হয় না, কিন্তু ইহা অনায়াসেই অনুমান করা যায় যে কোন গুরুতর বিপ্লবের দ্বারা রাজ্যের আভ্যন্তরিক নীতির কোন পরিবর্তন ঘটে নাই।

ভদ্রবর্মনের সময়কার লেখগুলিতে তাঁহার শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়লাভের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন দেশের রাজগণ যে তাঁহার সভায় দূত পাঠাইয়াছিলেন তাহাও বলা হইয়াছে। তাঁহার মন্ত্রীদের মধ্যে একজন বিভিন্ন দেশ হইতে যে সমাচার আসিত তাহা বুঝিতে সক্ষম ছিল এবং রাজা নিজেও রাজনৈতিক কারণে জাভায় দূত পাঠাইয়াছিলেন। পৃথক পৃথক প্রসঙ্গে যে সব বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে বুঝা যায় যে এই সময়ে চম্পা রাজ্য ঐ অঞ্চলে একটি প্রধান ও ক্ষমতাশালী রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইত এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে এই রাজ্য একটি অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। এই নূতন পরিস্থিতির প্রথম সূচনা জয় সিংহবর্মনের রাজ্যকালেই দেখা যায়।

তৃতীয় ভদ্রবর্মন খুব অল্প দিন রাজত্ব করেন। তাঁহার জানা তারিখ ৯০৮ ও ৯১০ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁহার পরে তাঁহার পুত্র তৃতীয় ইন্দ্রবর্মন রাজা হন। একটি লেখতে উক্ত হইয়াছে যে এই রাজা হিন্দুর ষড়দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন, কাশিকা, সটীক পাণিনি ব্যাকরণ এবং শৈবদের উত্তরকল্প অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে অত্যুক্তি থাকিলেও রাজা যে একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

কিন্তু রাজা যখন দর্শন ও ব্যাকরণ অধ্যয়নে রত তখন ৯৪৪ হইতে ৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে কাম্বোজরা চম্পা রাজ্য আক্রমণ করে। অবশ্য রাজা শেষ পর্যন্ত তাহাদের বিতাড়িত করিতে সক্ষম

হইয়াছিলেন। ৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দ্রবর্মন মারা যান। তাঁহার পরে তাঁহার পুত্র প্রথম জয় ইন্দ্রবর্মন রাজা হন। ৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এই রাজা পো নগরের মন্দিরটি পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু এই সময়ে রাজ্যের অবস্থা যে বেশ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল তাহা বুঝা যায়, কারণ আক্রমণকারীরা ভগবতীর সোনার মূর্তিটি লইয়া যাওয়ায় রাজা তাহার বদলে পাথরের মূর্তি স্থাপন করেন। এই রাজা ৯৬০ হইতে ৯৭১ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে ছয়বার চীনদেশে দূত পাঠান।

তৃতীয় অধ্যায়

আনামাইট আক্রমণ

প্রথম জয় ইন্দ্রবর্মনের মৃত্যুর পর প্রায় এক শতাব্দী কাল চম্পার ইতিহাস পরিষ্কাররূপে জানা যায় না। এই সময়ের প্রধান ঘটনা বার বার আনামাইটদের আক্রমণ। ইহার ফলে সমস্ত রাজ্যটি ছোট ছোট অংশে ভাগ হইয়া যায়।

প্রথম জয় ইন্দ্রবর্মনের পরে সম্ভবতঃ পরমেশ্বরবর্মন রাজা হন। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার সহিত আনামাইটদের বিবাদ বাধে ও ইহার ফলে তাঁহার ও তাঁহার রাজ্যের শেষ হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, টনকিন ও আনামের উত্তরভাগ খ্রীষ্টপূর্ব ১১১ অব্দে চীনের অধীনে যায়। কিন্তু চীনা রাজকর্মচারী ও উপনিবেশকের অত্যাচারে ইহার অধিবাসীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। ৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা বিদ্রোহ করে কিন্তু চীনা সৈন্যেরা সহজেই তাহা দমন করে।

১৮৩ খ্রীষ্টাব্দে আনামাইটরা আবার বিদ্রোহ করে কিন্তু ২২৬ খ্রীষ্টাব্দে পরাজিত হয়। ৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে লি-বন (Ly Bon) অথবা লি-বি (Ly Bi) নামে আনামের এক চীনা অধিবাসী চীনা শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি ও তাঁহার দুইজন উত্তরাধিকারী ৬২ বৎসর আনাম শাসন করেন কিন্তু ৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে চীনারা এই প্রদেশ আবার জয় করে। সমগ্র টনকিন প্রদেশটি লি-বন-এর অধীনে ছিল এবং দক্ষিণে তাঁহার রাজত্ব চম্পার সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার সহিত রুদ্রবর্মনের যুদ্ধের কথা আগেই বলা হইয়াছে। ৬০৩ হইতে ৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চীনারা নির্বিরোধে টনকিন শাসন করিয়াছিল। ৭২২ খ্রীষ্টাব্দে মাইথুক

লোয়ান (Mai-Thuc Loan) নামে এক আনামাইট প্রধান চম্পার রাজার সহিত মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হয় ও চীনা শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, কিন্তু সহজেই চীনা সেনাপতিরা বিদ্রোহ দমন করে।

অবশেষে চীনাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া আনামাইটরা দশম খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে আবার বিদ্রোহ করে। ৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে চীনে টাঙ্গ (Tang) রাজবংশের পতন হয় ও ইহার ফলে প্রায় অর্ধ শতাব্দী-কাল চীনে অরাজকতা ও ছোট ছোট রাজ্যের মধ্যে বিরোধ চলিতে থাকে। এই কারণে আনামাইটদের বিদ্রোহ সফল হয় ও তাহারা চীনের কঠিন শাসনপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হয়। এই সময় হইতে আনাম একটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইল। অবশ্য সময়ে সময়ে তাহারা নামমাত্র চীনের আনুগত্য স্বীকার করিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চীনের শাসন হইতে মুক্তি পাইল। এইরূপে যে নূতন রাজশক্তির উদ্ভব হইল তাহা কালক্রমে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিল।

ঙ্গো-কুয়েন (Ngo-Quyen) ৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম স্বাধীন আনা-মাইট রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু মাত্র একজনের অধীনে সমস্ত রাজ্য বেশিদিন ছিল না। ৯৬৫ খৃষ্টাব্দে বারোজন প্রধান তাহাদের মধ্যে দেশটি ভাগ করিয়া লইল। ৯৬৮ খৃষ্টাব্দে দিন-বো-লিন (Dinh-Bo-Linh) ঐ বারোজন প্রধানকে পরাজিত করিয়া নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বারো বৎসর রাজত্ব করার পর তাঁহার মৃত্যু হয়। বারোজন প্রধানের অন্যতম ঙ্গো-ন্থুটখান (Ngo-Nhut-Khanh) সম্রাটের হাতে পরাজিত হইয়া চম্পা রাজ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সম্রাটের মৃত্যুর খবর পাইয়াই তিনি সিংহাসন অধিকার করিতে মনস্থ করেন এবং এইজন্য পরমেশ্বর বর্মণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। পরমেশ্বর বর্মন সহজেই রাজী হন এবং নিজে একটি নৌবাহিনী লইয়া টনকিনের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। চাম নৌ-বাহিনী অতি দক্ষতার সহিত অগ্রসর হয় এবং রাজধানীর কয়েক

মাইলের মধ্যে পৌঁছায়। কিন্তু রাত্রের ঝড়ে বাহিনীর সমস্ত জাহাজ ভাঙ্গিয়া যায়; কেবল রাজা যে জাহাজটিতে ছিলেন, সেটির কোনও ক্ষতি হয় না, এবং রাজা নিরাপদে চম্পায় ফিরিয়া আসেন। মুটখান ও বহু ব্যক্তি জলে ডুবিয়া যান এবং বাকি সকলে আনামাইটদের হাতে বন্দী হয় (৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দ)।

ইহার অল্পদিন পরে সমস্ত আনামাইট প্রধানরা মিলিয়া লে-হোয়ানকে (Le-Hoan) তাহাদের সম্রাট নির্বাচিত করে (৯৮০ খ্রীঃ)। চীনা সম্রাট কুয়াং-ই (Kuang-Yi) এই প্রদেশটি পুনরায় জয় করিবার জন্য একদল সৈন্য পাঠান কিন্তু লে-হোয়ান সফলতার সহিত তাহাদের বাধা দেন। তিনি পরমেশ্বর বর্মণের সভায় একজন দূত পাঠান কিন্তু চম্পার রাজা সর্বকাল ও সর্বদেশের রাজনীতি অমান্য করিয়া দূতকে বন্দী করিলেন। স্বভাবতই লে-হোয়ান ইহাতে ক্রুদ্ধ হইলেন এবং নিজেই একদল সৈন্য লইয়া চম্পার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। প্রথম যুদ্ধেই পরমেশ্বরবর্মন পরাজিত ও নিহত হইলেন এবং আনামের রাজা চম্পার রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ইতিমধ্যে একজন নূতন রাজাকে চম্পার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি রাজধানী রক্ষা করিতে পারিলেন না। ইহা আনামাইটদের হস্তগত হইল। শহরটি লুটপাট করিয়া ও মন্দিরগুলি পোড়াইয়া লে-হোয়ান এই প্রদেশটি শাসনের ব্যবস্থা করিয়া বহুবিধ লুণ্ঠিত দ্রব্যসহ ফিরিয়া আসিলেন (৯৮২ খ্রীঃ)। তিনি রাজ-অন্তঃপুরের একশত মহিলা ও একজন ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

নূতন রাজা চতুর্থ ইন্দ্রবর্মন দেশের দক্ষিণভাগে আশ্রয় লইলেন এবং আনামাইটরা চম্পা দখল করিয়াছে এই অভিযোগ জানাইয়া চীন সম্রাটের দরবারে একজন ব্রাহ্মণ দূত পাঠাইলেন। কিন্তু সম্রাট এই সময়ে নূতন করিয়া আনামাইটদের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, তাই চম্পার রাজাকে নিজের রাজ্য রক্ষা করিবার ও প্রতিবেশী

রাজ্যগুলির সহিত সৎ ভাব বজায় রাখিবার পরমর্শ দিলেন।

ইতিমধ্যে আনামাইট প্রধানদের নিজেদের ভিতর কলহ বাধিয়া উঠিল। এই সময়কার আভ্যন্তরিক গোলযোগের ইতিহাস খুব পরিষ্কার ভাবে জানা যায় না, কিন্তু লু-উ-কি তং (Lu'u-Ky-Tong) নামে একজন আনামাইট প্রধান লে-হোয়ানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন ও এই ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত চম্পার সিংহাসন দখল করেন। লে-হোয়ান এই ব্যক্তিকে শাস্তি দিবার জন্য একদল সৈন্য লইয়া অগ্রসর হন কিন্তু পথের কষ্টে ও খারাপ আবহাওয়ার জন্য পিছাইয়া যাইতে বাধ্য হন (৯৮৩ খ্রীঃ)।

ইহাতে চম্পার উত্তরভাগে লু-উ-কিং-তং-এর ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। ক্রমশই তাঁহার ক্ষমতা বিস্তার লাভ করিতে লাগিল এবং চতুর্থ ইন্দ্রবর্মণের মৃত্যু হইলে তিনি প্রকাশ্যে নিজেকে সমস্ত চম্পা রাজ্যের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বৈদেশিক কঠোর শাসনে অতিষ্ঠ হইয়া দলে দলে চম্পার অধিবাসীরা চীনা অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে চলিয়া যাইতে লাগিল। সৌভাগ্যবশতঃ এই সময় বিজয় নামক নগরে এক বীর নেতার আবির্ভাব হয়। লু-উ-কিং-তং বিতাড়িত হইল এবং এই নেতা ৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহরিবর্মন (দ্বিতীয়) নামে রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। বিজয়ে (Binh-Dinh) রাজধানী স্থাপিত হইল।

দ্বিতীয় হরিবর্মনের সিংহাসন আরোহণ করিবার অল্পদিন পরেই লে-হোয়ান আবার তাঁহার রাজ্য লুটপাট করিলেন। বহু মূল্যবান উপহার সহ হরিবর্মণ আবার চীনের সম্রাটের দরবারে দূত পাঠাইয়া লে-হোয়ানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন এবং সম্রাট লে-হোয়ানকে তাঁহার নিজের রাজ্যের সীমানার বাহিরে যাইতে নিষেধ করিয়া নির্দেশ পাঠাইলেন। দ্বিতীয় হরিবর্মন আনামাইট রাজার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইলেন এবং লে-হোয়ানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী একজন আনামাইট প্রধানকে সাহায্য করিতে অস্বীকার করিলেন।

এই ঘটনায় খুশি হইয়া ও সম্ভবতঃ চীন সম্রাটের নির্দেশ পাইয়া লে-হোয়ান শুধু যে আক্রমণ বন্ধ করিলেন তাহা নয়, বহুসংখ্যক চাম বন্দীদের মুক্তিও দিলেন (৯৯২ খ্রীঃ)। এই বৎসরই চীন সম্রাট বহু মূল্যবান দ্রব্যাদি দ্বিতীয় হরিবর্মণকে উপহার স্বরূপ পাঠাইলেন। এই অপ্রত্যাশিত সম্মানে হরিবর্মন অভিভূত হইয়া পড়িলেন ,এবং বহু মূল্যবান সামগ্রী উপঢৌকন স্বরূপ দিয়া চীন সম্রাটের নিকট দূত পাঠাইলেন।

হরিবর্মন ও আনামাইট রাজা লে-হোয়ানের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হইল এবং হরিবর্মন আনামাইট রাজ্যে দূত পাঠাইতে লাগিলেন। ইহা সত্বেও চাম সৈন্যেরা আনামাইট রাজ্যের উত্তর ভাগে লুঠতরাজ করিতে লাগিল। একবার লে-হোয়ান চাম দূতকে তিরস্কার করিয়া সে যে উপহার আনিয়াছিল তাহা লইতে অস্বীকার করিলেন। হরিবর্মন মিটমাট করিতে চেষ্টা করিলেন এবং নিজের পৌত্রকে জামিন স্বরূপ লে-হোয়ানের দরবারে পাঠাইয়া দিলেন (৯৯৫ খ্রীঃ)। কিন্তু তথাপি চামরা আনামাইট রাজ্য মাঝে মাঝে আক্রমণ করিতে লাগিল। ৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে একদল চাম সৈন্য টনকিনের সীমানা পর্যন্ত অগ্রসর হইল কিন্তু উহা আক্রমণ না করিয়া ফিরিয়া আসিল।

দ্বিতীয় হরিবর্মনের পরে বিজয়শ্রী রাজা হ'ন। ৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চীন দরবারে দূত পাঠান এবং ইহার কিছু পূর্বেই তিনি সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় হরিবর্মনকে বিজয়-শহর হইতে রাজা ঘোষণা করা হয় কিন্তু পরে তিনি তাঁহার দরবার পুরাতন রাজধানী ইন্দ্রপুরে স্থানান্তরিত করেন। এক সময়ে এই শহরটি লে-হোয়ান দ্বারা লুণ্ঠিত হইয়াছিল এবং বৈদেশিক অত্যাচারের সকল চিহ্নই এখানে বিদ্যমান ছিল। বিজয়শ্রী ইহা চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিলেন এবং আনামাইটদের অত্যাচারের হাত এড়াইতে বিজয়-শহরে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই সময় হইতে চম্পা রাজ্যের শেষ অবধি চম্পার রাজধানী এখানেই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

বিজয়শ্রীর পরে তৃতীয় হরিবর্মন রাজা হইলেন। তিনি ১০১০, ১০১১ ও ১০১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনবার চীনে দূত পাঠান এবং ১০১১ খ্রীষ্টাব্দে একবার টনকিনে দূত পাঠান। তিনি ১০১১ খ্রীষ্টাব্দে দূতের সঙ্গে চীনের দরবারে কয়েকটি সিংহ পাঠান এবং ইহাতে চীনের দরবারে খুব ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করে। তাঁহার পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় পরমেশ্বরবর্মন ১০১৮ খ্রীষ্টাব্দে চীনে রাজকর পাঠান। চম্পার উত্তর সীমানায় অবস্থিত বো-চান (Bo Chanh) শিবির ১০২১ খৃষ্টাব্দে আনামাইটদের দ্বারা হঠাৎ আক্রান্ত হয়। চাম সেনাপতি তাহাদের বাধা দেয় কিন্তু নিহত হয় এবং তাহার সৈন্যরা বিশৃঙ্খল অবস্থায় পিছাইয়া আসে। আক্রমণকারী সৈন্যদেরও যথেষ্ট ক্ষতি হয় এবং তাহারা আর অগ্রসর হইতে সাহস করে না।

পরবর্তী রাজা চতুর্থ বিক্রান্ত বর্মণ ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আসীন ছিলেন, কারণ এই বৎসর তিনি রাজস্ব সহ চীনের দরবারে দূত পাঠান। তাঁহার রাজ্যকাল গৃহযুদ্ধ ও বিদ্রোহে পূর্ণ ছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ ১০৩৮ ও ১০৩৯ খৃষ্টাব্দে দুইবার তাঁহার পুত্র টনকিনের দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। ইহার কয়েক মাস পরেই বো-চান শিবিরের সমস্ত সৈন্যরা আনামাইট সম্রাটের শরণাপন্ন হয়। বিক্রান্তবর্মন ১০৪১ খৃষ্টাব্দে মারা যান এবং পরের বৎসর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় জয়-সিংহবর্মন রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার জন্য চীন দরবারের সম্মতি প্রার্থনা করেন।

জয়সিংহবর্মনের অবিবেচনার ফলে চম্পা রাজ্যের বিষম বিপদ ঘটে। ১০৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার নৌবাহিনী আনামাইট উপকূলে উপদ্রব করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে প্রেরিত একটি শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে না পারিয়া পিছাইয়া আসে। প্রায় ষোল বৎসর ধরিয়া চম্পার রাজারা আনামাইট রাজার বশ্যতা অস্বীকার করায় এবং এই সময় জয়সিংহবর্মনের উপদ্রবে অতিষ্ঠ হইয়া আনামাইট সম্রাট ফাট-মা (Phat Ma) তাঁহার এই উদ্ধত প্রতিবেশী

রাজাকে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে একটি সৈন্যবাহিনী সুসজ্জিত করিলেন। প্রায় একশত নূতন জাহাজ তৈয়ারী করা হইল এবং সৈন্যদের যুদ্ধে আক্রমণ ও আত্মরক্ষা উভয় বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইল। ১০৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারি সম্রাট সৈন্যবাহিনী লইয়া নিজে চম্পার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। সৈন্যবাহিনী নিরাপদে ঙু-বো (Ngu Bo) নদীর তীরে পৌঁছিল এবং এইখানেই জয়সিংহবর্মন সৈন্য লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। আনামাইট সৈন্যেরা তীরে উঠিয়া আক্রমণ করিল। চাম বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল ও জয়সিংহবর্মন ৩০,০০০ হাজার সৈন্য সহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এই দৃশ্যে অভিভূত হইয়া ফাট-মা ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড বন্ধ করিলেন এবং সসৈন্যে রাজধানী বিজয় অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বিজয় অতি সহজেই তাঁহার অধীনে আসিল এবং তাঁহার সৈন্যরা শহরটি দখল ও বিধ্বস্ত করিল। অবশেষে আনাম সম্রাট বহুবিধ লুণ্ঠিত দ্রব্য ও অনেক লোকজন বন্দী করিয়া ফিরিতে উদ্যত হইলেন। এই বন্দীদের মধ্যে রাজঅন্তঃপুরের সমস্ত মহিলারাও ছিলেন। একটি বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে যখন এই মহিলাদিগকে রাজার নিজস্ব তরীতে উঠিতে আদেশ করা হইল তখন তাঁহাদের মধ্যে একজন বিদেশীর হাতে অপমানিত হওয়ার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয় মনে করিয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া মরিলেন। সম্রাট তাঁহার সতীত্বের প্রশংসা করিলেন এবং তাহাকে "অতিশয় সতীসাধ্বী মোহিনী মহিলা" এই উপাধি দিলেন।

কিছুকাল পূর্বে আনামাইট দখলের শেষে ৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে যে রাজবংশের পত্তন হইয়াছিল, দ্বিতীয় জয়সিংহবর্মনের সময় দ্বিতীয় বার আনামাইট আক্রমণে তাহার সমাপ্তি হইল। কিন্তু ছয় বৎসরের মধ্যেই চম্পার প্রাচীন রাজবংশ হইতে উদ্ভূত জয় পরমেশ্বর বর্মদেব ঈশ্বরমূর্তি নামে এক ব্যক্তি আবার একটি নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিলেন।

নূতন রাজাকে অনেক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। কারণ

প্রায় সত্তর বৎসর (৯৮০-১০৫০ খ্রীঃ) যাবৎ এই রাজ্যে আভ্যন্তরিক গণ্ডগোল চলিতেছিল এবং ইহা বিদেশী আক্রমণে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বার বার আনামাইট আক্রমণের ফলে রাজ্যের দুরবস্থা চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল এবং সঙ্গতিও নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছিল। কেন্দ্রের ক্ষমতা কমার সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক বিদ্রোহ দেখা দিল। এই সময়ে দক্ষিণে অবস্থিত পাণ্ডুরঙ্গ প্রদেশ বিদ্রোহ করে এবং একজন নূতন রাজাকে সিংহাসনে স্থাপিত করে। কাম্বোজ রাজ্যও প্রতিবেশী রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে এই রাজ্যে লুঠপাট করিতে লাগিল।

জয় পরমেশ্বর বর্মনের পক্ষে ইহা খুবই প্রশংসনীয় যে, তিনি সাহসে ভর করিয়া বিপদের সম্মুখীন হইলেন এবং রাজ্যে যথেষ্ট পরিমাণে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হইলেন। পাণ্ডুরঙ্গ প্রদেশে বহুকাল ধরিয়া বিদ্রোহ চলিতেছিল। সুতরাং এই প্রদেশের ব্যবস্থা করিতে জয় পরমেশ্বর বর্মন প্রথমে মনোযোগ দিলেন। স্বয়ং রাজা ও তাঁহার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র যুবরাজ মহাসেনাপতি ও দেবরাজ মহাসেনাপতি, এই তিনজনের অধীনে তিনটি সেনাবাহিনী পাণ্ডুরঙ্গের বিরুদ্ধে যাত্রা করিল। পাণ্ডুরঙ্গের বিদ্রোহী অধিবাসীরা সম্পূর্ণ পরাজিত হইল এবং সন্ধি করিল (১০৫০ খ্রীঃ)। অর্ধেক অধিবাসীদের শহরটি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মুক্তি দেওয়া হইল ও বাকি অর্ধেককে বিভিন্ন ধর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলির দাস হিসাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। এই জয়ের স্মারক রূপে রাজা ও যুবরাজ মহাসেনাপতি দুইজনে দুইটি পাথরের লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই সমস্তই এই প্রদেশের অধিবাসীদের মনে চম্পার রাজার ধন সম্পদ ও ধর্মানুরাগ সম্বন্ধে একটি আভাষ দিবার জন্য করা হইয়াছিল এবং আশানুরূপ ফলও ফলিয়াছিল।

পাণ্ডুরঙ্গ প্রদেশের সমস্যার সন্তোষজনক ব্যবস্থা করিয়া রাজা প্রতিবেশী রাজ্য কাম্বোজের সহিত বুঝাপড়া করিতে মনস্থ করিলেন। এক্ষেত্রেও তাঁহার চেষ্টা সফল হইল। পাণ্ডুরঙ্গ যুদ্ধের বিশিষ্ট নেতা

যুবরাজ মহাসেনাপতি কাম্বোজদের দারুণভাবে পরাজিত করিলেন এবং শম্ভুপুর নামে শহরটি দখল করিলেন। তিনি বহু মন্দির ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং খ্মের (Khmer) বন্দীদের শ্রীশানভদ্রেশ্বরের মন্দিরগুলির মধ্যে বিতরণ করিলেন।

পরমেশ্বরবর্মনের রাজ্য গ্রহণের পূর্বে বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলির যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল। রাজা হইবার পরে তাঁহার আর একটি প্রধান কাজ হইল এইগুলি পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা। ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত পো নগরের দেবীর মূর্তি আবার প্রতিষ্ঠিত হইল এবং মন্দিরের জন্য জমি, দাস ও মূল্যবান জিনিসপত্র দান করা হইল।

জয় পরমেশ্বরবর্মন ১০৫০ হইতে ১০৫৬ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে চীন দেশে তিনবার এবং ১০৪৭ হইতে ১০৬০ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে আনাম দেশে পাঁচ বার দূত প্রেরণ করেন। তাঁহার পরে তৃতীয় ভদ্রবর্মন রাজা হন এবং ১০৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি এই দেশের রাজা ছিলেন। তাঁহার পরে তাঁহার ভাই তৃতীয় রুদ্রবর্মন (অথবা কিংবদন্তী মূলক ভৃগু বংশের রুদ্রবর্মনকে গণ্য করিলে চতুর্থ রুদ্রবর্মন) রাজা হন। এই ব্যক্তি জয় পরমেশ্বরের' বংশেই জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু এই দুইজনের মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল তাহা সঠিক জানা যায় না। রাজ্য লাভের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁহার রাজ্যের উত্তরে অবস্থিত প্রতিবেশী রাজ্য আক্রমণের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সেনাবাহিনী গঠন করিতে ও সৈন্যদের শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং ১০৬২ খৃষ্টাব্দে আনামাইটদের বিরুদ্ধে সাহায্য পাইবার আশায় চীনে দূত পাঠাইলেন। চীন সম্রাট তাঁহার সহিত বন্ধুর মত ব্যবহার করিলেন এবং কিছু উপহারও পাঠাইলেন, কিন্তু আনামাইটদের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন না। এইজন্য তৃতীয় রুদ্রবর্মন কয়েক বৎসর আনামাইট সম্রাটের সহিত সদ্‌ভাব বজায় রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন এবং ১০৬৩, ১০৬৫ ও ১০৬৮

খ্রীষ্টাব্দে নিয়মিত রাজস্ব দিলেন।

কিন্তু এই কয় বৎসর ধরিয়াই তৃতীয় রুদ্রবর্মন তাঁহার আয়োজন করিয়া যাইতেছিলেন এবং ১০৬৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে খোলাখুলি শত্রুতা আরম্ভ করিলেন। আনামাইট সম্রাট এই যুদ্ধের আহ্বান গ্রহণ করিলেন এবং ১০৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি সৈন্য লইয়া যাত্রা করিলেন। তাঁহার সৈন্যেরা শ্রী ব্যানয় (Sri Banoy) বন্দরে উপস্থিত হইল ও এইখানে অবতরণ করিল। তু-মাও (Tu Mao) নদীর তীরে চাম সেনাদল আক্রমণকারীদের বাধা দিল। তাহারা অনেকক্ষণ ভীষণভাবে যুদ্ধ করিল কিন্তু তাহাদের সেনাপতি নিহত হওয়াতে তাহারা হতাশ হইয়া পড়িল এবং ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। বহুসংখ্যক মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়া রহিল। পরাজয়ের সংবাদ পাওয়া মাত্র রুদ্রবর্মন পরিবারবর্গ লইয়া রাজধানী ছাড়িয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার অনুসরণ করিয়া শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে কাম্বোজ রাজ্যের সীমান্তে বন্দী করা হয় (১০৬৯ খৃঃ)।

বিজয়ী রাজা বিজয়ের রাজপ্রাসাদে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং নাচগান ও ভোজ দ্বারা বিজয় উৎসব পালন করিলেন। ইহার পরে তিনি রাজধানীর ও ইহার আশেপাশের শহরে সমস্ত বাড়ীগুলি পোড়াইয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন এবং এই আদেশ পালন হইলে ফিরিবার হুকুম দিলেন। ১৭ই জুলাই তিনি সগৌরবে নিজের রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। দুইটি সেনাদল ও অশ্বারোহী কর্মচারীসহ রাজা নিজে রথে চড়িয়া আসিলেন ও এই রথের পিছনে রুদ্রবর্মন ও তাঁহার পরিবারবর্গ এবং পাঁচজন ঘাতক সারিবদ্ধভাবে হাঁটিয়া আসিল। যুদ্ধে বন্দী হিসাবে প্রায় ৫০,০০০ চামকে টনকিনে লইয়া যাওয়া হয়।

রুদ্রবর্মনকে অবশ্য বেশিদিন বন্দী দশা ভোগ করিতে হয় নাই। চম্পা রাজ্যের উত্তর দিকের তিনটি জেলা—দিয়া-লি, মা-লিন্ ও বো-চান, (Dia Ly, Ma Linh, Bo Chanh)—আনামাইটদের দিয়া

তিনি মুক্তি পাইলেন (১০৬৯ খ্রীঃ)। অর্থাৎ সমস্ত কুয়াং বিন (Quang Binh) প্রদেশ ও কুয়াং ত্রি (Quang Tri) প্রদেশের উত্তরভাগ ছাড়িয়া দিতে হইল এবং চম্পা রাজ্যের সীমানা সংকুচিত হইয়া ভিয়েট নদীর মোহনা পর্যন্ত পৌঁছিল। রাজ্যের এই সমস্ত অংশগুলি সমর্পণ, চামরা কিছুতেই মাথা পাতিয়া মানিয়া লইতে পারিল না এবং ভবিষ্যতে এইজন্য বহু যুদ্ধ হইয়াছিল।

চম্পায় ফিরিয়া আসিয়া তৃতীয় রুদ্রবর্মন দেখিলেন যে ইহা গৃহযুদ্ধ ও অরাজকতার আস্তানা হইয়াছে এবং রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন লোক নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। এই গোলযোগের মধ্যে রুদ্রবর্মনের আর কোন খবর পাওয়া যায় না; এবং যে রাজবংশ ১০৪৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব আরম্ভ করে তাহা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই শেষ হইল।

চতুর্থ অধ্যায়

হরিবর্মন প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ

চম্পার সিংহাসনের অসংখ্য দাবিদারদের মধ্যে চতুর্থ হরিবর্মনের নাম একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। এই রাজার সম্পূর্ণ নাম ছিল শ্রীহরিবর্মদেব কুমার থান য়ান বিষ্ণুমূর্তি বা মাধবমূর্তি বা দেবতা-মূর্তি। ইঁহার পিতা ছিলেন নারিকেল বংশীয় প্রালেয়েশ্বর ধর্মরাজ। ইঁহার মাতা ছিলেন সুপারি বংশীয়া, কাজেই হরিবর্মন প্রধান দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী বংশের প্রতিনিধি ছিলেন।

রুদ্রবর্মন বন্দী হওয়ার দশ বৎসরের মধ্যেই হরিবর্মন রাজ্যের একটি বৃহত্তর অংশে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু চম্পার সিংহাসনের দখল লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী প্রধানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ ইঁহার রাজ্যকাল ধরিয়া চলিয়াছিল। ১০৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নূতন করিয়া আনামাইট আক্রমণ ও কাম্বোজ রাজের লুঠপাট এই অবস্থাকে আরও শোচনীয় করিয়া তুলিল। হরিবর্মনের পক্ষে ইহা প্রশংসনীয় যে তিনি কেবল তাঁহার দেশের শত্রুদের পরাস্ত করেন নাই, ক্ষমতাশালী প্রতিবেশী রাজ্যগুলির হাত হইতেও নিজের দেশকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কাজেই মাইসোন লেখতে যে তাঁহার অসংখ্য যুদ্ধযাত্রার নিম্নোক্ত বিবরণ দেখা যায় তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছু নাই :—

"দ্বাদশবার তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন। নয়বার তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে রাজা, সেনাপতি, প্রধান ও অন্যান্য লোকদের শিরশ্ছেদ করেন। সোমেশ্বর নামক জায়গায় কাম্বোজ সৈন্যদের তিনি পরাজিত করেন ও প্রধান সেনাপতি কুমার শ্রীনন্দ-বর্মদেবকে বন্দী করেন।"

আনামাইটদের পরাজিত করাতে নূতন প্রতিষ্ঠিত রাজ্য অনেকটা নিরাপদ হইল এবং অনেকগুলি যুদ্ধে সফল হওয়াতে "চম্পার রাজা পুরোনো দিনের মত সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিলেন।" এই সময়ে হরিবর্মনের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল ও তিনি সম্ভবতঃ 'উৎকৃষ্টরাজ' উপাধি গ্রহণ করিলেন। এই সময়ের পর হইতে তিনি "পূর্ণ শান্তিতে রাজকীয় সুখভোগ করিতে লাগিলেন।"

হরিবর্মনের আর একটি দরকারী কাজ করিবার ছিল। বহুবার আনামাইট আক্রমণে ও গৃহযুদ্ধের ফলে সমস্ত দেশ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল এবং যথাসম্ভব ইহার একটা সংস্কারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

মাইসোনের দুইটি লেখতে এই পুনর্গঠন কার্যের ও রাজা ও তাঁহার ভ্রাতা যুবরাজ মহাসেনাপতি নির্মিত শ্রীশানভদ্রেশ্বর মন্দিরে নানা মুল্যবান দানের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

হরিবর্মন সাধারণ প্রাসাদগুলির প্রতিও মনোযোগ দিলেন। "চম্পা শহর ও যে সব প্রাসাদ যুদ্ধের সময় নষ্ট হইয়াছিল তিনি সেগুলি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। যেন প্রকৃতির যাদুস্পর্শে প্রাসাদগুলি ও চম্পা শহরটি সমৃদ্ধ ও নূতন করিয়া সজ্জিত হইল।"

এইরূপে হরিবর্মন রাজ্যে আইন ও শৃঙ্খলার পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং রাজ্য পুনরায় সমৃদ্ধিশালী করা এই দুইটি প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করিলেন। দক্ষিণের প্রদেশ পাণ্ডুরঙ্গ ছাড়া সম্ভবতঃ সমস্ত চম্পা রাজ্য তাঁহার অধীন হইয়াছিল। রাজ্যের যে সমস্ত ক্ষতি হইয়াছিল তাহা সংস্কার করিয়া পুরাতন দিনের সমৃদ্ধি ফিরাইয়া আনিবার জন্য হরিবর্মন নিজেকে নিয়োজিত করিলেন।

১০৮০ খ্রীষ্টাব্দে একচল্লিশ বৎসর বয়সে চতুর্থ হরিবর্মন শিবপূজা ও আধ্যাত্মিক জীবন যাপনের জন্য জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীরাজদ্বারকে সিংহাসন দিয়া রাজ্য ত্যাগ করেন। কিন্তু বেশীদিন বিশ্রাম লাভ করা তাঁহার অদৃষ্টে ছিল না। এক মাসের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহা

উল্লেখযোগ্য যে তাঁহার চৌদ্দজন পত্নী ভারতীয় রীতি অনুযায়ী তাঁহার সহিত মৃত্যু বরণ করে।

রাজদ্বার শ্রীজয় ইন্দ্রবর্মনদেব নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার তখন মাত্র নয় বৎসর বয়স এবং তিনি ঐ গোলযোগের সময় রাজ্য পরিচালনার কার্যে মোটেই উপযুক্ত ছিলেন না। তিনি এক মাস রাজত্ব করার পরেই সকলে একজন ক্ষমতাশালী শাসকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিল এবং হরির্মনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পু-লিয়ান শ্রীযুবরাজ মহাসেনাপতিকে সিংহাসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। জয় ইন্দ্রবর্মদেব প্রচারিত মাইসোন লেখতে এই ঘটনার নিম্নলিখিত বর্ণনা পাওয়া যায়।

রাজা শ্রীজয় বর্মন প্রায় একমাস রাজত্ব করেন। সেই সময়ে রাজা অতি অল্পবয়স্ক থাকাতে রাজ্যশাসন বিষয়ে কোন্‌টি ভালো কোন্‌টি মন্দ বিচারে অক্ষম ছিলেন এবং অন্যায় রকমে অনেক কার্য করেন। সেইজন্য শ্রীজয় ইন্দ্র বর্মদেব নিজে ও রাজ্যের সেনাপতি, ব্রাহ্মণ, জ্যোতিষী, পণ্ডিত ব্যক্তি, শ্রীহরিবর্মদেবের রাণী প্রভৃতি সকলে মিলিয়া রাজ্য শাসনের জন্য একজন উপযুক্ত শাসক খুঁজিতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখিলেন শ্রীজয় ইন্দ্রবর্মদেবের খুল্লতাত ও শ্রীহরিবর্মদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুবরাজ মহাসেনাপতি কুমার পাঞ্‌-এর মধ্যে রাজচক্রবর্তীর উপযুক্ত সকল চিহ্ন বিদ্যমান এবং তাঁহার ভাল মন্দ বিচার করিবার শক্তি আছে…পু-লিয়ান শ্রীযুবরাজ মহাসেনাপতির ভ্রাতুষ্পুত্র জয় ইন্দ্রবর্মদেব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, পণ্ডিত, জ্যোতিষী, মহিলারা সকলে মিলিয়া রাজদণ্ড নিয়া যুবরাজ মহাসেনাপতির নিকট গেলেন ও তাঁহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

১০৮১ খ্রীষ্টাব্দে যুবরাজ মহাসেনাপতি পরমবোধিসত্ত্ব নামে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। "তিনি সমস্ত সেনাপতিদের পুরস্কৃত করিলেন ও চম্পার অধিবাসীরা তাঁহার দানে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। আগের মত এখানে এখন শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল।"

তিনি দেশের সমস্ত গোলযোগ দমন করিলেন এবং দক্ষিণে পাণ্ডুরঙ্গ প্রদেশ জয় করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করিলেন। ১০৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আনামাইট অভিযানের পরে একজন বিদ্রোহী এখানে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া ১৬ বৎসর যাবৎ রাজত্ব করিতেছিল। পরমবোধিসত্ত্ব তাহাকে ও তাহার অনুচরদের বন্দী করিলেন। তাহাদিগকে হত্যা করা হইল না, কিন্তু তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল।

এইরূপে ১৬ বৎসর পর চম্পায় আবার একটি অখণ্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। পরমবোধিসত্ত্ব বেশি দিন রাজত্ব করেন নাই। তাঁহার পরে ১০৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীইন্দ্রবর্মদেব পরম-রাজাধিরাজ রাজা হইলেন। এই ভ্রাতুষ্পুত্রই ১০৮১ খ্রীষ্টাব্দে পরম-বোধিসত্ত্বকে রাজা করিবার জন্য নিজে সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় জয় ইন্দ্রবর্মন আনাম রাজদরবারে নিয়মিত রাজস্ব দিতেন, কিন্তু রুদ্রবর্মন উত্তরের যে তিনটি প্রদেশ আনাম রাজ্যকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, সেই ক্ষতি কখনও ভুলিতে পারেন নাই। এই সমস্যা দুই দেশবাসীর মধ্যে এমন একটি ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছিল যে যখন এই দুই দেশের দূত চীনের দরবারে একই সময়ে উপস্থিত হইল ও একই সময়ে সম্রাট সন্দর্শনে গেল, তখন দুইজনই দুইজনের মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখিল। যখন তাহারা দুইজনে এক ভোজ সভায় নিমন্ত্রিত হইল তখন দুইজন খাবার টেবিলের দুই কোণায় আসন গ্রহণ করিল।

১১০৩ খ্রীষ্টাব্দে আনাম হইতে পলাতক একজন আশ্রয়প্রার্থী চম্পার রাজা ইন্দ্রবর্মনকে আনামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার পরামর্শ দিল। সে রাজাকে বুঝাইল যে আভ্যন্তরিক গোলযোগের ফলে আনামের ক্ষমতা এখন দুর্বল এবং চম্পার আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার শক্তি তাহার নাই। এই ভুল খবরে প্ররোচিত হইয়া জয় ইন্দ্রবর্মন সসৈন্যে আক্রমণ করিয়া হৃত প্রদেশ তিনটি আবার জয় করিলেন।

কিন্তু এই বিজয় বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই। শীঘ্রই তিনি পরাজিত হইলেন ও এই তিনটি প্রদেশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। আরও বিপদের হাত এড়াইবার জন্য তিনি তাড়াতাড়ি আনামে রাজস্ব পাঠাইলেন। ইহার পর হইতে দুইদেশে শান্তি স্থাপিত হইল এবং চম্পা হইতে আনামে নিয়মিত রাজস্ব পাঠানো হইত।

দ্বিতীয় জয় ইন্দ্রবর্মন ১১১৩ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র হরিবর্মন (পঞ্চম) শান্তিতে রাজত্ব করেন।

পঞ্চম অধ্যায়

কাম্বোজ ও চীনের সহিত সংগ্রাম

সম্ভবতঃ পঞ্চম হরিবর্মনের কোন ন্যায্য উত্তরাধিকারী ছিল না। তাঁহার পরবর্তী রাজার নাম ছিল তৃতীয় জয় ইন্দ্রবর্মন। তৃতীয় জয় ইন্দ্রবর্মন ১১০৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ১১২৯ খ্রীষ্টাব্দে দেবরাজের পদ লাভ করেন, ১১৩৩ খ্রীষ্টাব্দে যুবরাজ মনোনীত হন, এবং ১১৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন। তিনি ১১৪০ খ্রীষ্টাব্দে মাইথোনে ও ১১৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পো-নগরে কয়েকটি ধর্ম-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং ইহা হইতে বুঝা যায় যে উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিকেই তাঁহার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তৃতীয় জয় ইন্দ্র বর্মন তাঁহার দুই শক্তিশালী প্রতিবেশী রাজ্যের সহিত কলহে জড়িত হইয়া পড়িলেন। কাম্বোজের রাজা কলহপ্রিয় সূর্যবর্মন ১১১৩ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন এবং চম্পা রাজ্যে উপদ্রব করিতে শুরু করেন। ১১২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিশ হাজার সৈন্য আনামের বিরুদ্ধে পাঠান এবং চম্পার রাজাকে তাঁহার সহিত যোগ দিবার জন্য প্রলুব্ধ করেন। ইহা অতি সহজেই সম্ভব হইল কারণ চম্পার রাজার মনে আনামের বিরুদ্ধে বরাবর আক্রোশ ছিল এবং রুদ্রবর্মন-সমর্পিত উত্তরের প্রদেশ তিনটি উদ্ধার করিবার কোন সুযোগই তিনি হাতছাড়া করিতে রাজী ছিলেন না। দুর্ভাগ্যবশতঃ চাম সেনাদল যথা সময়ে কাম্বোজদের সহিত যোগ দিতে পারিল না এবং দুইটি সেনাদল পৃথকভাবে পরাজিত হইল। এই উদ্যমে ব্যর্থ হইয়া সূর্যবর্মন পরের বৎসর ৭০০ জাহাজ থান-হোয়া (Thau Hoa) উপকূলে পাঠাইয়া সেখানে উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিলেন। ১১৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দ্রবর্মন কাম্বোজ

সৈন্যের সাহায্যে ঙ্ঘে-আন (Nghe-An) আক্রমণ করেন কিন্তু আনামাইটরা সহজেই তাঁহাকে পরাজিত করে। অতঃপর ইন্দ্রবর্মন মিটমাট করিবার জন্য আনাম রাজ্যে রাজস্ব পাঠান এবং সূর্যবর্মনের সহিত যে সন্ধি করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যাহার করেন।

কিন্তু ইহাতেও হতভাগ্য রাজা নিস্কৃতি পাইলেন না। আনামাইট অভিযানে অকৃতকার্য হইয়া সূর্যবর্মন বিশ্বাসঘাতক চম্পার রাজাকে আক্রমণ করিয়া নিজের ক্ষতিপূরণ করিতে মনস্থ করিলেন। ১১৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চম্পা আক্রমণ করিলেন এবং বিজয় অধিকার করিলেন। তৃতীয় জয় ইন্দ্রবর্মন যুদ্ধে হয় নিহত কিংবা বন্দী হইলেন। অতঃপর তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না।

যখন চম্পারাজ্য বিজয়ী কাম্বোজ সৈন্যদলের পদানত হইল, সেই সময়ে পুরাতন রাজবংশের সন্তান ও পরমবোধিসত্ত্বের একজন বংশধর নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন ও দক্ষিণে পাণ্ডুরঙ্গ প্রদেশে আশ্রয় লইলেন। তাঁহার নাম ছিল রুদ্রবর্মন পরম ব্রহ্মলোক। তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হ'ন কিন্তু অল্পদিন পরে ১১৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান।

এই রাজার মৃত্যু হইলে পাণ্ডুরঙ্গের অধিবাসীরা তাঁহার পুত্র রত্নভূমিবিজয়কে চম্পার সিংহাসন গ্রহণ করিতে আমন্ত্রণ করে ও তিনি ১১৪৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসন গ্রহণকালে তাঁহার নাম হইল শ্রীজয় হরিবর্মদেব কুমার শিবানন্দন। জয় হরিবর্মন অত্যন্ত সংকটপূর্ণ সময়ে সিংহাসন আরোহণ করেন। রাজ্যের একটি বৃহৎ অংশ বিদেশীর অধীনে ছিল এবং তাহারা ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতেছিল। এবং এই গোলযোগের সুযোগে সীমান্তে অবস্থিত আনামাইট এবং কিরাত ও অন্যান্য অসভ্য জাতিরা রাজ্যের মধ্যে ঢুকিয়া লুঠপাট করিতেছিল। জয় হরিবর্মনের এই সমস্ত বিপদের সম্মুখীন হইবার দক্ষতা ও সাহস ছিল এবং শেষ পর্যন্ত তিনি রাজ্যের সব বিপদ কাটাইয়া উঠিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

জয় হরিবর্মন সিংহাসনে আরোহণ করিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কাম্বোজের রাজা তাঁহার প্রধান সেনাপতি শংকরকে রাজপুরের প্রান্তরে গিয়া যুদ্ধ করিতে নির্দেশ দিলেন। বিজয় অর্থাৎ চম্পার যে অংশ কাম্বোজের অধীন ছিল সেখান হইতে বহু সৈন্য শংকরকে সাহায্য করিবার জন্য পাঠানো হইল। চকল্যানে হরিবর্মনের সঙ্গে শত্রু সৈন্যের সাক্ষাৎ হইল এবং তিনি জয়লাভ করিলেন। ইহা ১১৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ঘটে। পরের বৎসর "কাম্বোজের রাজা পূর্বাপেক্ষা হাজারগুণে বেশি ক্ষমতাশালী সেনাদল বীরপুরের প্রান্তরে যুদ্ধ করিতে পাঠান।" কায়েভের প্রান্তরে হরিবর্মনের সঙ্গে তাহাদের যুদ্ধ হয় ও তাহারা সম্পূর্ণ পরাজিত হয়।

দুই দুইবার তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত সৈন্যদল পরাজিত করিয়া হরিবর্মন এইবার শত্রুকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। কাম্বোজের রাজা এই বিপদের গুরুত্ব তুচ্ছ করেন নাই। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁহার প্রথমা রাণীর ছোট ভাই হরিদেবকে বিজয়ের রাজ্যপদে অভিষিক্ত করিলেন এবং "সমস্ত সেনাপতিদের সৈন্য পরিচালনা করিয়া হরিদেবকে রক্ষা করিতে নির্দেশ দিলেন।" জয় হরিবর্মন এই শহরের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং হরিদেব, তাঁহার চাম ও কাম্বোজ সেনাপতিগণ ও তাঁহাদের সৈন্যদের বিনাশ করিলেন। ইহার পর বিজয়ী রাজা যথোপযুক্ত অনুষ্ঠান ও জাঁকজমক সহ তাঁহার পূর্বপুরুষদিগের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন (১১৪৯ খ্রী) এবং এই সময় হইতে সমস্ত রাজ্যের একচ্ছত্র রাজা হইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কিন্তু হরিবর্মনের বিপদ তখনও শেষ হয় নাই। কাম্বোজের রাজা তিনবার ব্যর্থ হইয়া একটি নূতন পরিকল্পনা করিলেন। তিনি চম্পার পার্বত্য অঞ্চলের অসভ্য অধিবাসীদের তাহাদের রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। সাধারণতঃ কিরাত নামে পরিচিত রাদে, মদ ও অন্যান্য অসভ্য জাতি বিজয়ের আশে পাশে সমতল ভূমিতে অক্রমণ আরম্ভ করিল। স্লে নামক গ্রামের কাছে যুদ্ধ হইল এবং কিরাতেরা

পরাজিত হইল। দুর্ভাগ্যবশতঃ বাহিরের শত্রু ছাড়া নিজের আত্মীয়রাও হরিবর্মনের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিল। তাঁহার রাণীর ভাই বংশরাজ শত্রুদের সঙ্গে যোগ দিল এবং কিরাত রাজগণ মধ্যমগ্রাম নামক শহরের রাজা বলিয়া তাহাকে ঘোষণা করিল। কিন্তু নির্ভীক রাজা সাহসের সহিত এই নূতন বিপদেরও সম্মুখীন হইলেন। জয় হরিবর্মন নিজে সৈন্য পরিচালনা করিয়া বংশরাজকে ও কিরাত সেনাদলকে পরাজিত করিলেন।

কিরাত সমস্যার মীমাংসা হইল কিন্তু বংশরাজের বিষয়ে কিছু সমাধান হইল না। সে আনাম রাজদরবারে গিয়া আশ্রয় লইল এবং চম্পার সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য সম্রাটের কাছে যুদ্ধে সাহায্য চাহিল। সম্রাট তাহার অনুরোধে সম্মত হইলেন এবং তাহাকে চম্পার রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইহার পরিণাম নিম্নলিখিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

"যবনদের (আনামাইট) রাজা যখন জানিতে পারিলেন যে কাম্বোজের রাজা জয় হরিবর্মনের রাজ্যে উৎপাত সৃষ্টি করিতেছেন তখন তিনি বংশরাজ নামে চম্পার এক অধিবাসীকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য কয়েকজন যবন সেনাপতি ও একলক্ষ সাহসী যবন সৈন্য দিলেন। জয় হরিবর্মন বিজয়ের সমস্ত সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন। দুইদলে ভীষণ যুদ্ধ হইল। জয় হরিবর্মন বংশরাজকে পরাজিত করিলেন......বহুসংখ্যক যবন সৈন্যের মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়া রহিল (১১৫০ খ্রী)।"

সম্ভবতঃ এই সমস্ত বাহিরের শত্রুদের দমন করিয়া হরিবর্মন শান্তিতে রাজত্ব করিবার আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইল না। প্রথমে অমরাবতী (১১৫১ খ্রী) ও পরে পাণ্ডুরঙ্গে (১১৫৫ খ্রী) গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইল। হরিবর্মন ইহা দমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন কিন্তু ১১৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই বিদ্রোহ সম্পূর্ণ প্রশমিত হয় নাই।

জয় হরিবর্মন চম্পার সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া মন্দিরগুলির সংস্কার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে মনোযোগী হইলেন। ১১৬৬ বা ৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং সম্ভবতঃ তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় জয় হরিবর্মন রাজ্য লাভ করেন। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই গ্রামপুর বিজয়ের অধিবাসী চতুর্থ শ্রীজয় ইন্দ্রবর্মন চম্পার সিংহাসন অধিকার করেন। প্রথম বা দ্বিতীয় জয় হরিবর্মনের সঙ্গে তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত রূপে জানা গিয়াছে যে দ্বিতীয় জয় হরিবর্মনের দুই পুত্র ছিল এবং তাঁহারা পরে চম্পায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। কাজেই চতুর্থ জয় ইন্দ্রবর্মন যে সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী ছিলেন না সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

১১৬৭ খ্রীষ্টাব্দে যথোচিত ভাবে চতুর্থ জয় ইন্দ্রবর্মনের অভিষেক সম্পন্ন হয়। অভিষেকের পরেই তিনি রাজপদে প্রতিষ্ঠার জন্য চীন সম্রাটের অনুমতি চাহিয়া তাঁহার দরবারে দূত পাঠান। দূতের সহিত যে সব উপহার চীনে পাঠান হইয়াছিল সেগুলি আরব বণিকদের নিকট হইতে লুণ্ঠিত দ্রব্য। উপহারের পরিমাণ এত বেশি ছিল যে চীন সম্রাট প্রথমে ইহার দশমাংশ মাত্র গ্রহণ করিতে রাজী হইয়াছিলেন, কিন্তু যখন আরব বণিকদের নালিশ হইতে এই জিনিসগুলির প্রকৃত তথ্য জানিতে পারিলেন, তখন ইহার কিছুই গ্রহণ করিলেন না এবং ইহার কারণ বিবৃত করিয়া জয় ইন্দ্রবর্মনের নিকট পত্র দিতে আদেশ করিলেন। ইহা ছাড়া মন্ত্রী পরিষদ আরও ঠিক করিল যে এই ব্যাপারে যে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা শেষ না হওয়া পর্যন্ত যে সব সম্মানজনক উপাধি চম্পার রাজাকে দিবার রীতি আছে তাহাও এক্ষেত্রে দেওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে না।

চতুর্থ জয় ইন্দ্রবর্মন এইবার কাম্বোজ জয় করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি আনাম সম্রাটকে মূল্যবান উপহার ও দূতের মারফত নির্দিষ্ট রাজস্ব পাঠাইয়া ঐ রাজ্যের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলেন।

রাজ্যের উত্তর সীমানা সম্বন্ধে নিরুদ্বিগ্ন হইয়া তিনি কাম্বোজ রাজ্য আক্রমণ করিলেন (১১৭০ খ্রী)। এই সময় ঐ রাজ্যের রাজা ছিলেন ত্রিভুবনাদিত্য বর্মন। দুই পক্ষই সমান শক্তিশালী হওয়ায় কোন চূড়ান্ত মীমাংসা না হইয়া বহুদিন যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এই সময়ে একজন চীনা কর্মচারী চম্পার উপকূলের কাছে জাহাজডুবি হওয়ায় চম্পায় উপস্থিত হয় এবং রাজাকে ঘোড়ার পিঠ হইতে তীর ছুড়িবার এবং অশ্ব-যুদ্ধের এক নূতন পদ্ধতির কৌশল শিখায় (১১৭১ খ্রী)। জয় ইন্দ্রবর্মন তখন তাঁহার নিজের জন্য চীনা কর্মচারীকে তাহার দেশ হইতে অশ্ব ক্রয় করিয়া দিতে বলেন। এই ঘোড়াগুলির সাহায্যে শত্রুদের বিরুদ্ধে কতকটা সুবিধা লাভ করায় তিনি আরও ঘোড়া কিনিতে প্রলুব্ধ হন। ১১৭১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হাইনান দ্বীপের কিয়োং চিউ শহরে যতগুলি ঘোড়া পাওয়া যায় সবগুলি কিনিবার জন্য অনেক লোক পাঠান। কিন্তু তাঁহার লোকেরা এখানকার লোকদের নিকট হইতে ভাল ব্যবহার না পাইয়া প্রতিশোধ স্বরূপ যাহাকে পাইল তাহারই উপর জোর জবরদস্তি করিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে ভীত হইয়া ঐখানকার অধিবাসীরা তাহাদের নিকট ঘোড়া বিক্রয় করিল। কিন্তু এই ঘটনা চীন সম্রাটের গোচরে আসিল এবং ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজ্যের বাহিরে ঘোড়া রপ্তানি বন্ধ করিয়া এক আদেশ জারি করিলেন।

চতুর্থ জয় ইন্দ্রবর্মন স্থলপথে কাম্বোজ আক্রমণের কল্পনা ত্যাগ করিলেন। ১১৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি সুসজ্জিত নৌবহর প্রেরণ করিলেন। একজন চীনা ব্যক্তির পরিচালনায় নৌবহরটি উপকূল ধরিয়া অগ্রসর হইয়া মেকং নামক মহানদীর মোহনায় আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং এখান হইতে নদীপথে রাজধানীতে পৌঁছিল। রাজধানী লুঠপাট করিয়া প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া জয় ইন্দ্রবর্মন ফিরিয়া আসিলেন।

চতুর্থ জয় ইন্দ্রবর্মনের গৌরবময় বিজয় অভিযানে চম্পার পুরাতন

কালের সমৃদ্ধির পুনঃ প্রতিষ্ঠার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া মন্দিরগুলিতে রাজার বহুবিধ দান হইতেও এই একই কথা প্রকাশ পায়। একটি লেখ হইতে সেই সময়ে যে সামরিক সামন্ত তন্ত্র (Military feudalism) প্রথা প্রচলিত ছিল তাহা জানা যায়। এই লেখতে দেখা যায় যে রাজ্যের তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তি অন্যান্য শপথের সহিত তাহারা ও তাহাদের সন্তানগণ যতদিন জীবিত থাকিবে ততদিন যুদ্ধ বাধিলে রাজার পক্ষ অবলম্বন করিবে এই শপথ গ্রহণ করিয়া রাজার আনুগত্য স্বীকার করে।

চতুর্থ জয় ইন্দ্রবর্মনের পরে পঞ্চম জয় ইন্দ্রবর্মন চম্পার রাজা হন। এই দুই জনের মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিল কিনা তাহা জানা যায় না, তবে এই রাজাও পূর্ববর্তীর মত আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করেন ও কাম্বোজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যান। ১১৯০ খ্রীষ্টাব্দে কাম্বোজের রাজা সপ্তম জয় বর্মন চম্পার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই অভিযানের নেতা শ্রীসূর্যবর্মদেব কুমার শ্রীবিদ্যানন্দন পরবর্তী কালের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আসলে তিনি চম্পার অধিবাসী কিন্তু অতি অল্প বয়সেই কাম্বোজে গিয়া বাস করেন (১১৮২ খ্রী)। কাম্বোজের রাজা তাঁহার বীরত্বে খুশি হইয়া তাঁহাকে যুবরাজের সম্মান দেন এবং যখন চম্পার সহিত যুদ্ধ বাধে তখন রাজা "তাঁহাকে সৈন্যদের নেতা করিয়া বিজয় অধিকার করিতে ও জয় ইন্দ্রবর্মনকে পরাজিত করিতে প্রেরণ করেন।" শ্রীসূর্যবর্মদেব সম্পূর্ণ জয়লাভ করেন এবং চম্পার রাজাকে বন্দী করিয়া কাম্বোজে লইয়া যান।

ইহার পর কাম্বোজের রাজা চম্পা রাজ্যকে দুই ভাগে ভাগ করেন। উত্তরভাগের রাজধানী হইল বিজয় এবং এখানে তাঁহার নিজের শ্যালক সূর্যজয়বর্মদেব রাজা হইলেন। বিজয়ী সেনাপতি সূর্যবর্মদেব কুমার শ্রীবিদ্যানন্দন দক্ষিণ অংশের রাজা হইলেন এবং ইহার রাজধানী হইল পান্‌রানের অন্তর্গত রাজপুর।

সূর্যবর্মদেব কুমার শ্রীবিদ্যানন্দন কতগুলি তস্কর অথবা জলদস্যুকে দমন করিয়া শান্তিতে রাজপুর হইতে রাজত্ব করিতে থাকেন। দস্যু বা তস্কর বলিয়া যাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে সম্ভবত তাহারা পরাজিত রাজার পক্ষের ব্যক্তি এবং নূতন রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই উত্তর ভাগের রাজ্য কাম্বোজের হস্তচ্যুত হইল। দুই বৎসরের মধ্যেই কুমার রঘুপতি নামে একজন স্থানীয় প্রধান ব্যক্তি কাম্বোজের মনোনীত অনধিকারী শ্রীসূর্যজয় বর্মনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলেন। সূর্যজয় বর্মন পরাজিত হইয়া কাম্বোজে ফিরিয়া গেলেন এবং রঘুপতি শ্রীজয় ইন্দ্রবর্মদেব নামে সিংহাসন আরোহণ করিলেন।

কাম্বোজের রাজা তখন বিজয়ের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য পাঠাইলেন (১১৯২ খ্রী)। সম্ভবতঃ দেশের লোকদিগকে সন্তুষ্ট করার জন্য চম্পার বন্দী রাজা পঞ্চম শ্রীজয় ইন্দ্রবর্মনকে কাম্বোজের অধীনে চম্পার রাজা মনোনীত করিয়া এই সেনাদলের সঙ্গে পাঠান হইল। কাম্বোজ সেনাদল প্রথমে রাজপুরে গেল। এখান হইতে শ্রীসূর্যবর্মদেব কুমার বিদ্যানন্দন তাহাদের নেতা হইয়া বিজয়ের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন এবং বিজয় দখল করিয়া জয় ইন্দ্রবর্মন রঘুপতিকে পরাজিত ও নিহত করিলেন।

ইহার পর হইতে সূর্যবর্মদেব বিদ্যানন্দন কাম্বোজের রাজার অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন ভাবে সমগ্র চম্পা রাজ্যে রাজত্ব করিতে লাগিলেন (১১৯২ খ্রী)। কিন্তু কাম্বোজের রাজার সহিত শীঘ্রই তাহার যুদ্ধ বাধিল। ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বিরুদ্ধে একদল সৈন্য পাঠানো হয় কিন্তু তিনি সহজেই জয়লাভ করেন। পরের বৎসর আরও বড় একটি সেনাবাহিনী পাঠানো হয়, কিন্তু এবারেও তিনি কাম্বোজ সেনাপতিদের পরাস্ত করেন। শ্রীসূর্যবর্মদেব কুমার বিদ্যানন্দনের জীবনে ইহাই শ্রেষ্ঠ কীর্তি। দেশত্যাগী হিসাবে যে

ব্যক্তি জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন ঘটনাচক্রে শেষ পর্যন্ত তিনিই চম্পা রাজ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজা রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

কাম্বোজের সহিত যুদ্ধ শেষ হইলে বিদ্যানন্দন অমরাবতীর দিকে যাত্রা করিলেন এবং এতদিন ধরিয়া দেশে গৃহযুদ্ধ ও বৈদেশিক শাসনের ফলে যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহা পূরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু বেশিদিন রাজ্য ভোগ করা তাঁহার অদৃষ্টে ছিল না। ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার খুল্লতাত যুবরাজ ধনপতিগ্রামের কাছে পরাজিত হইলেন। তাঁহাকে কাম্বোজ রাজা ইঁহার বিরুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন।

সূর্যবর্মন ও এই যুবরাজের জীবনে অনেক সাদৃশ্য ছিল। যুবরাজও দেশত্যাগী হইয়া কাম্বোজে আশ্রয় এবং রাজার অনুগ্রহ লাভ করেন। কাম্বোজের রাজা দুইবার সূর্যবর্মনকে পরাজিত করিতে ব্যর্থ হইয়া খুল্লতাতকে ভ্রাতুষ্পুত্রের বিরুদ্ধে পাঠান। ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে সূর্যবর্মনকে পরাজিত করিয়া যুবরাজ ধনপতিগ্রাম চম্পা শাসন করিতে থাকেন। কিন্তু তাঁহাকে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহের সূচনা হয়। ইহাদের মধ্যে পুতো আজ্ঞা কু পরিচালিত বিদ্রোহটি সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়াছিল, কিন্তু যুবরাজ ইহাও দমন করেন। তাঁহার বীরত্বে খুশি হইয়া কাম্বোজের রাজা তাঁহাকে নানাবিধ সম্মানজনক পদবীতে ভূষিত করেন ও ১২০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে চম্পার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই দ্বিতীয় জয় হরিবর্মনের পুত্র জয় পরমেশ্বর বর্মদেব নামে এক নূতন ব্যক্তির আবির্ভাব হইল। আইনতঃ এই ব্যক্তিই চম্পার সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী ছিল। কারণ তাঁহার পিতাকে চতুর্থ জয় ইন্দ্রবর্মন গ্রামপুর বিজয় অন্যায় ভাবে সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। বিদ্রোহী রাজার রাজত্ব-কালে ও পরে কাম্বোজ যুদ্ধের সময় তিনি দেশত্যাগ করেন ও শেষ পর্যন্ত কাম্বোজ রাজদরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

১২০১ খ্রীষ্টাব্দে কাম্বোজরাজ তাঁহাকে "পু পোং পুল্যং শ্রীযুবরাজ" এই পদবীতে ভূষিত করেন এবং পরে তাঁহাকে চম্পার শাসনকর্তা যুবরাজ ধনপতিগ্রামের সহিত চম্পায় গিয়া থাকিতে অনুমতি দেন। ইহা নিশ্চিত যে হর্ষ ও বিষাদে মিশ্রিত অনুভূতি লইয়া তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসেন, কারণ তাঁহার পূর্বপুরুষের সিংহাসন তখন অন্য লোকের আয়ত্তাধীন। কেন যে তাঁহাকে চম্পায় পাঠান হইয়াছিল এবং পরবর্তী কুড়ি বৎসর তিনি ঐখানে কি করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না।

এই সময় আনামাইটরা চম্পা রাজ্যে নানারকম উপদ্রব করিতেছিল। ১২০৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রায় অনবরত দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছিল এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আনামাইটরা জয় লাভ করিয়াছিল। এই দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে কাম্বোজদের শক্তি নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে ১১৯০ খ্রীষ্টাব্দে যখন তাহারা চম্পা জয় করে সেই সময় হইতে এতদিন পর্যন্ত যুদ্ধ তাহাদের পক্ষে বিশেষ পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে ১২২০ খ্রীষ্টাব্দে কাম্বোজেরা চম্পা ত্যাগ করে এবং সম্ভবত: ১২২২ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ ভাবে জয় পরমেশ্বর বর্মনের সহিত সন্ধি হয়। কারণ যাহাই হউক জয় পরমেশ্বর বর্মন তাঁহার পূর্বপুরুষের সিংহাসন লাভ করেন এবং ১২২৬ খ্রীষ্টাব্দে আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁহার অভিষেক হয়। ইহার পর হইতে তিনি শান্তিতে রাজত্ব করিতে থাকেন এবং রাজ্যের বিভিন্ন অংশে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করিয়া "৩২ বৎসর ব্যাপী (১১৯০-১২২২ খ্রী)" কাম্বোজ যুদ্ধের ফলে দেশের যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহার সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হ'ন।

দ্বিতীয় জয়পরমেশ্বর বর্মনের রাজত্বের শেষ ভাগে, ১২৫২ খ্রীষ্টাব্দে বা ইহার কাছাকাছি সময়ে, আনামাইটদের সহিত আবার গোলযোগ দেখা দেয় এবং যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই সময়ে আনামের সিংহাসনে একটি ক্ষমতাশালী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। চাম

জলদস্যুরা আনামের উপকূলের অধিবাসীদের উপর অত্যাচার করিতেছিল, আনামের রাজা ইহার বিরুদ্ধে চম্পার রাজদরবারে প্রতিবাদ জানান। ইহার উত্তরে চম্পার রাজা, চম্পার উত্তরে অবস্থিত যে তিনটি প্রদেশ আনামাইটরা দখল করিয়াছিল তাহা ফেরত দিবার জন্য বলেন। ইহাতে উত্তেজিত হইয়া আনাম সম্রাট চম্পার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। অনেকদিন ধরিয়া এই ভীষণ যুদ্ধ চলিল কিন্তু কিছু সঠিক মীমাংসা হইল না। সম্রাট চম্পার রাজার একজন রাণী ও কতকগুলি উপপত্নী এবং ঐ দেশের সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া আসিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই দ্বিতীয় জয়পরমেশ্বর বর্মনের মৃত্যু হয় ও তাঁহার ভাই শকংবিজয়ের কুমার হরিদেব ষষ্ঠ জয় ইন্দ্রবর্মন রাজা হন। তিনি তাঁহার রাজ্যের উত্তরস্থিত প্রতিবেশী রাজ্যের সহিত সদ্‌ভাব বজায় রাখিয়া ধর্মকার্যে মনোনিবেশ করেন।

১২৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই রাজাকে তাঁহার ভাগিনেয় হত্যা করেন এবং নিজে জয়সিংহ বর্মন নামে সিংহাসন আরোহণ করেন। ১২৬৬ খ্রীষ্টাব্দে যথারীতি তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং এই সময় তিনি (পঞ্চম) ইন্দ্রবর্মন নাম গ্রহণ করেন।

নূতন রাজা শান্তিতে রাজত্ব করিবার উদ্দেশ্যে অভিষেকের পরেই দূতের হাতে আনাম রাজাকে রাজস্ব পাঠান (১২৬৬ খ্রী) এবং ১২৬৭, ১২৬৯ ও ১২৭০ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় রাজস্ব পাঠান।

কিন্তু ইন্দ্রবর্মনের রাজত্ব কালেই চম্পা রাজ্যের সর্বাপেক্ষা বিপদ ঘনাইয়া আসে! সবে মাত্র বত্রিশ বৎসর ব্যাপী কাম্বোজ অভিযান শেষ হইয়াছিল, সেই সময়ে এই রাজ্য মোঙ্গোলদের দ্বারা আক্রান্ত হইল।

দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দে অল্পকালের মধ্যেই মোঙ্গোলরা এশিয়া মহাদেশে একটি ক্ষমতাশালী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাহাদের নেতা চেঙ্গিজ খাঁ (১১৬২-১২২৭ খ্রী) এশিয়া মহাদেশের একটি বিরাট অংশ

ও পূর্ব ইয়োরোপ জয় করিয়া চীন বিজয়ের পরিকল্পনা করেন, কিন্তু এই সময়ে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার সাম্রাজ্য পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর ও কৃষ্ণসাগর অতিক্রম করিয়া বুলগেরিয়া, সার্ভিয়া, হাঙ্গারী, ও রাশিয়া অবধি বিস্তৃত হইয়াছিল। পূর্বে কোরিয়া ইহার অন্তর্গত ছিল এবং ইহা প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণে ইহার সীমা বেষ্টন করিয়া ভারতবর্ষ, তিব্বত ও খ্বারিজম (Khwarizm) সাম্রাজ্যের ভগ্নাবশেষ অবস্থিত ছিল। চেঙ্গিজ খাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী ওগোতই চীনের এক অংশ জয় করেন। ১২৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গোল সাম্রাজ্য মংকুর (১২৪৮-১২৫৯ খ্রী) অধীনে যায় ও তাহার পর তাঁহার ভ্রাতা ও চেঙ্গিজ খাঁর পৌত্র কুবলাই খাঁর অধীনে আসে। কুবলাই খাঁ চীনের সম্রাটের আসন গ্রহণ করিয়া পিকিং-এ রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সুং রজবংশকে বিনাশ করিয়া সমস্ত চীন সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট হইবার কল্পনা করেন। এই পরিকল্পনা তিনি ১২৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কার্যে পরিণত করেন। কিন্তু যে সময়ে তিনি চীন রাজবংশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিলেন সেই সময়েই যে সব বিদেশী রাজ্য চীন সম্রাটকে সার্বভৌম রাজা বলিয়া মান্য করিত তাহাদের নিকট হইতে বশ্যতা স্বীকারের দাবী করিলেন। সুতরাং এই অনুসারে আনাম ও চম্পার রাজাকেও সশরীরে আসিয়া কুবলাই খাঁকে সম্মান জানাইবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইল। ইন্দ্রবর্মন প্রথমে ১২৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১ঃই অগস্ট ও ইহার দুই মাস পরে আবার মোঙ্গোল দরবারে দূত পাঠাইলেন এবং কুবলাই খাঁ শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে "দ্বিতীয় পর্যায়ের যুবরাজ" (Prince Imperial of the Second rank) এই সম্মানে ভূষিত করিলেন।

এখন হইতে কুবলাই খাঁ চম্পাকে তাঁহার সাম্রাজ্যের অধীনস্থ প্রদেশ রূপে গণ্য করিতেন এবং সগাটু ও লিউচেঙ্গ নামে দুইজনকে চম্পার রাজার নামে চম্পার শাসনকার্য চালাইবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। বৃদ্ধ ও দুর্বল রাজা ইহা মানিয়া লইলেন কিন্তু তাঁহার

অভিমানী পুত্র কুমার হরিজিৎ এই অপমান সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি জনসাধারণের অসন্তোষে ইন্ধন জোগাইতে লাগিলেন এবং শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি এমন সংকটাপন্ন হইয়া উঠিল যে খানের নিযুক্ত শাসকরা তাহাদের অবস্থা মোটেই নিরাপদ নয় বুঝিতে পারিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেল।

কুবলাই খাঁ তখন চম্পার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা স্থির করিলেন এবং সগাটুর উপর ইহার ভার দেওয়া হইল। ১২৮২ খ্রীষ্টাব্দে সগাটুকে "চম্পা প্রদেশের শাসক' এই উপাধি দেওয়া হইল এবং টন্‌কিন্‌ হইতে স্থলপথে চম্পায় যাওয়ার অনুমতি আনামের রাজা না দেওয়াতে সে এক হাজার জাহাজে সৈন্য বোঝাই করিয়া চম্পার বিরুদ্ধে যাত্রা করিল। তাহারা সোজা চম্পার উপকূলে উপস্থিত হইল এবং বিনা বাধায় এখানে অবতরণ করিল। কুমার হরিজিৎ নিজেই চাম সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করিতেছিলেন। সগাটু প্রথমে সন্ধির চেষ্টা করিল, কিন্তু সফল হইল না। অবশেষে ১২৮৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে, যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দশ হাজার চাম সৈন্য দৃঢ়তার সহিত ছয়ঘণ্টা ধরিয়া যুদ্ধ করিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাদের পিছাইয়া যাইতে হইল। পঞ্চম ইন্দ্রবর্মন তাঁহার গোলাবারুদের ঘরে আগুন লাগাইয়া সৈন্যসহ পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় লইলেন।

সগাটু তাহার সেনাদলের এক অংশ রাজার বিরুদ্ধে পাঠাইল। প্রথমে কিছু সাফল্য লাভ করিলেও অপরিচিত পার্বত্য অঞ্চলে মোঙ্গোল সৈন্যরা শত্রু দ্বারা বিপর্যস্ত হইল এবং অনেক কষ্টে বহু ক্ষতি সহিয়া শিবিরে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু চীন হইতে নূতন সেনাদলের সাহায্যে সগাটু ১২৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুন আবার আক্রমণ করিল এবং চাম সৈন্যদের যথেষ্ট ক্ষতি করিল। ইন্দ্রবর্মন পুনরায় পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় লইলেন।

চাম অভিযানে কুবলাই খাঁর অর্থ ও লোকবল উভয় দিক দিয়া যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল। ইহা সত্ত্বেও তিনি ১২৮৪ খ্রীষ্টাব্দে আরও

১৫,০০০ সৈন্য পূর্বে প্রেরিত সেনাদলকে সাহায্য করিবার জন্য পাঠাইলেন। এই সৈন্যদের প্রথম দল লইয়া প্রথমে যে নৌবাহিনী রওনা হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইল, তাহাদের যে কি পরিণাম হইল তাহার কোনো খবর পাওয়া গেল না। অবশিষ্ট সৈন্যদল ওয়ান হুর নেতৃত্বে নিরাপদে চম্পার উপকূলে অবতরণ করিল। কিন্তু শ্রীবনয়ে (Banoy) আসিয়া ওয়ান হু জানিতে পারিল যে সগাটু শিবির পোড়াইয়া দিয়া কয়েকদিন মাত্র আগে দেশের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। এই খবরে আশ্চর্য্য হইলেও ওয়ান হু একাই অগ্রসর হইল এবং পুত্রকে সঙ্গে করিয়া তাহার সহিত দেখা করিবার আদেশ দিয়া একজন দূতকে ইন্দ্রবর্মনের নিকট পাঠাইল। কিন্তু রাজা এই আদেশ পালন করিতে রাজী হইলেন না। তিনি তাঁহার পৌত্রকে নূতন করিয়া বশ্যতার শপথ করিবার জন্য (১২৮৪ খ্রী) সম্রাটের কাছে পাঠাইলেন এবং চারি মাস পরে ১৮ জন ব্যক্তি লইয়া গঠিত এক দৌত্যের মারফত, নিয়মিত রাজস্ব দিবার অঙ্গীকার ও ইহার পরিবর্তে রাজ্য হইতে সৈন্যদল সরাইয়া লইবার প্রার্থনা সম্রাটের দরবারে পেশ করিলেন। দুই মাস পরে ঐ দূত গোষ্ঠীই আবার মূল্যবান উপহার সামগ্রী লইয়া সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হইল।

কিন্তু এই সমস্ত দূত মারফত বশ্যতা স্বীকার সত্ত্বেও অবস্থার কোন পরিবর্তন হইল না। রাজা আগের মতই পার্বত্য অঞ্চলে বাস করিতেছিলেন, এবং যখনই তাঁহার সেনাদল মোঙ্গোলদের আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হইতেছিল তখনই তাহাদের নূতন সৈন্য পাঠাইয়া সাহায্য করা হইতেছিল। মোঙ্গোলরাও কোনো নিরাপদ আস্তানা গঠন করিতে না পরিয়া, গরমে, নানারকম অসুখে ও খাদ্যের অভাবে কষ্ট পাইতেছিল। এই সমস্ত কারণে এই যুদ্ধযাত্রা যাহাতে শেষপর্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হয় সেইজন্য কুবলাই খাঁ সব রকম ক্ষতি স্বীকার করিয়াও চম্পা জয় করিবার উদ্দেশ্যে স্থলপথে বৃহৎ একদল সৈন্য পাঠাইতে মনস্থ করিলেন।

স্থলপথে চম্পারাজ্যে পৌঁছিতে গেলে আনাম রাজ্যের মধ্য দিয়া যাইতে হইত। ইন্দ্রবর্মনের মত এই রাজ্যের রাজাও নিজে গিয়া সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। কাজেই যখন তাঁহার রাজ্যের ভিতর দিয়া চম্পার বিরুদ্ধে প্রেরিত সেনাদলের যাইবার জন্য রাস্তা দিবার নির্দেশ আসিল তখন তিনি তাহাদের তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিতে বাধা দিলেন।

কুবলাই খাঁর পুত্র টোগান মোঙ্গোল সৈন্যদের নেতৃত্ব করিতেছিল। কূটনীতির দ্বারা আনাম রাজাকে বশীভূত করিতে না পারিয়া অবশেষে যে প্রদেশগুলির ভিতর দিয়া তাহাকে অগ্রসর হইতে হইবে সেইগুলি সে আক্রমণ করিল এবং এক একটি করিয়া জয় করিতে লাগিল। এইভাবে জয়লাভ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া সে লাল নদী (Red River) পার হইয়া বিজয়ীর বেশে আনাম রাজধানীতে প্রবেশ করিল। এই একই সময়ে দক্ষিণ দিক হইতে অগ্রসর হইয়া সগাটু জ্ঘে-আন (Nghe-An) ও থান হোয়া (Than-Hoa) তে শত্রুদের পরাজিত করিল। এই সময়ে আনাম সম্রাট আক্রমণ আরম্ভ করিলেন। উত্তরদিকে তিনি টোগানকে পরাজিত করিয়া সসৈন্যে তাহাকে লাল নদীর অপর দিকে তাড়াইয়া দিলেন। এই পরাজয়ের কোনো খবর সগাটুর কাছে পৌঁছায় নাই এবং সে শত্রুদেশের অভ্যন্তরে আরও অগ্রসর হইতেছিল এমন সময়ে তাহাকেও সম্পূর্ণ পরাজিত করা হইল। যুদ্ধকালে তাহার মৃত্যু হয় এবং তাহার মাথা কাটিয়া আনিয়া আনাম সম্রাটের কাছে উপস্থিত করা হয়।

এইরূপে চম্পা রাজ্য মোঙ্গোল আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা পাইল। অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর যাহাতে না হয় তাহার জন্য ইন্দ্রবর্মন তাড়াতাড়ি দূতের হাতে বহু মূল্যবান উপহার সামগ্রী কুবলাই খাঁকে পাঠাইলেন (১২৮৫ খ্রী)। কুবলাই-খাঁ চম্পা জয়ের আশা ত্যাগ করিলেন এবং সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আনামাইটদের দ্বারা চম্পা অধিকার

(১) আনামের জয়

বীরত্বের সহিত দুর্ধর্ষ শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া শেষ পর্যন্ত জয়ী হইবার পর পঞ্চম ইন্দ্রবর্মন সম্ভবতঃ বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। ১২৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মার্কোপোলো চম্পায় আসেন এবং তাঁহার বিবরণী হইতে মনে হয় যে ইহার পূর্বেই ইন্দ্রবর্মনের মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার ও রাণী গৌড়েন্দ্র লক্ষ্মীর বীর পুত্র হরিজিৎ বিপদের সময় সর্বদা পিতার পাশে উপস্থিত থাকিয়া পিতার মৃত্যুর পর তৃতীয় জয়সিংহবর্মন নামে সিংহাসন আরোহণ করিলেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধ চলার দরুণ রাজ্যে মোটেই শান্তি ছিল না, নূতন রাজা রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

এই গর্বিত রাজা কুবলাইখাঁর নিকট বশ্যতার সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করিলেন। আনাম রাজ্যে নিয়মিত রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিলেন। আনামের রাজা নোন-টোন (Nho'n-Ton) তাঁহার পুত্র আন-টোন (Anh-Ton) কে রাজ্য দিয়া নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিছুকাল নির্জনে বাস করিবার পর তাঁহার বিভিন্ন দেশের তীর্থস্থানগুলি ঘুরিয়া দেখিবার ইচ্ছা হইল এবং ১৩০১ খ্রীষ্টাব্দে চম্পায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে তিনি নয়মাস অবস্থান করেন এবং জয়সিংহ বর্মনের অতিথেয়তায় খুশি হইয়া যাইবার সময় রাজাকে নিজের এক কন্যা দান করিবার প্রতিজ্ঞা করেন।

কিন্তু আনাম রাজ দরবারে এই প্রস্তাব বিশেষ আগ্রহের সহিত গৃহীত হইল না। যদিও জয় সিংহবর্মন ইতিপূর্বেই জাভার (অথবা মালয় উপদ্বীপের) তাপসী নামে এক রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তথাপি নূতন করিয়া এই সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য বিশেষ

আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন। ১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই প্রস্তাবের কথাবার্তা চলিতে লাগিল, কিন্তু এই বিলম্বে জয়সিংহবর্মন অধীর হইয়া দূতের হাতে বিবাহের উপহার সামগ্রী পাঠাইয়া দিলেন এবং বিবাহ হইলে আনামা-রাজকে তাঁহার নিজের রাজ্যের উত্তর সীমাস্থিত থুয়া থিয়েন অর্থাৎ কুয়াঙ্গটি প্রদেশের দক্ষিণ অংশ ও কুয়াঙ্গনাম প্রদেশের উত্তর অংশ ছাড়িয়া দিতে স্বীকার করিলেন। যে লোক নিজের জীবনের আশঙ্কা উপেক্ষা করিয়া দেশের জন্য বীরের মত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, অদৃষ্টচক্রে সেই লোকই নিজের একটি খেয়াল পূরণ করিবার জন্য কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া নিজরাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ দুইটি প্রদেশ ও ইহাদের অন্তর্গত সুরক্ষিত কিউ সিউ (Kiu S'iu) পর্যন্ত দিতে স্বীকৃত হইলেন। এইভাবে দ্বিতীয়বার আবার চম্পা রাজ্য খণ্ডিত হইল। আনামের মন্ত্রীপরিষদ সম্রাটের কন্যার পক্ষে এইরূপ সম্বন্ধ অসম্মানজনক মনে করিয়া বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু আন-টোন (Anh-Ton) এর মত একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি, রাজ্যের সুবিধার কথা ভাবিয়া বংশের সম্মান ও ভ্রাতৃসুলভ ভাবুকতার প্রশ্রয় দিলেন না। তিনি ঐ প্রদেশগুলি গ্রহণ করিলেন ও রাজকুমারীকে জয়সিংহবর্মনের হস্তে দান করিলেন। কিন্তু বিবাহের পরে জয়সিংহবর্মন বেশি দিন বাঁচিয়া ছিলেন না। ১৩০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তৃতীয় জয়সিংহবর্মনের পরে তাঁহার রাণী ভাস্করদেবীর গর্ভজাত পুত্র কুমার হরিজিতাত্মজ মহেন্দ্রবর্মন নামে সিংহাসন আরোহণ করিলেন। চম্পা রাজ্যের উত্তরের প্রদেশ দুইটি ছাড়িয়া দেওয়ায় চম্পা রাজ্যের সীমানা অনেকটা দক্ষিণ দিকে সরিয়া আসিয়াছিল। পিতার এই কার্য মহেন্দ্রবর্মনের বিশেষ পরিতাপের বিষয় হইয়াছিল এবং বিদেশীর অধীনস্থ হওয়ায় এই দুই প্রদেশের অধিবাসীরাও যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। ফলে ঐ প্রদেশ দুইটিতে বিদ্রোহ দেখা দিল ও মাঝে মাঝে ইহাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চলিতে লাগিল এবং আনাম

রাজ্য হইতে যে সমস্ত লোক ঐ দুইটি প্রদেশে বসবাস করিতে আসিয়াছিল তাহাদের পক্ষে ঐখানে বাস করা দুষ্কর হইয়া উঠিল। কাজে কাজেই ১৩১২ খ্রীষ্টাব্দে আনাম সম্রাট আন-হোয়াং (Anh Hoang) চম্পার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা স্থির করিলেন।

সম্রাট নিজেই যুদ্ধ পরিচালনা করিলেন এবং মহেন্দ্রবর্মনকে বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করিতে রাজী করান হইল। সপরিবারে রাজা জলপথে গিয়া সম্রাটের কাছে উপস্থিত হইলেন। এইরূপ অবমাননা স্বীকার করিয়া লওয়াতে সৈন্যেরা উত্তেজিত হইয়া সম্রাটের শিবির আক্রমণ করিল। কিন্তু শীঘ্রই তাহারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। ইহার ফলে মহেন্দ্রবর্মনকে বন্দী করা হইল এবং তাঁহার ভাই চেদবানিয়েম (Che-da-a-ba-niem) কে চম্পার শাসনভার দিয়া তাঁহাকে 'দ্বিতীয় পর্য্যায়ের সামন্ত রাজা' (Feudatory Prince of the Second rank) এই উপাধি দেওয়া হইল। ছয় মাসের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হইল এবং আন হোয়াং (Anh Hoang) বন্দী চম্পারাজকে সঙ্গে নিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। সম্রাট রাজাকে নানাবিধ সম্মানে ভূষিত করিলেন কিন্তু ইহাতে বন্দী রাজা কিছুমাত্র সান্ত্বনা পাইলেন না এবং ১৩১৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইল।

মহেন্দ্রবর্মনের যে ভাইকে আনাম সম্রাট সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, অভিষেক কালে তাহার চে-নাং (Che Nang) নাম করণ হইল (১৩১২ খ্রী)। দুই বৎসর পরে আন হোয়াং পুত্রকে রাজ্য দান করিয়া আনামের সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। সম্রাট বদল হওয়ার সুযোগে চে-নাং আনামের অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করিলেন। প্রথমে কিছু সফল হইলেও তিনি পরে পরাজিত হ'ন এবং পলাইয়া যান। ভাই-এর মত পরিণামের আশঙ্কা করিয়া তিনি দেশত্যাগ করিয়া জাভা রাজ্যে আশ্রয় লন (১৩১৮ খ্রী)। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ১১৪৫ খ্রীষ্টাব্দে রুদ্রবর্মন পরম ব্রহ্মলোক প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের সমাপ্তি হইল।

২। চম্পা রাজ্যের পুনরুদ্ধার

চম্পারাজ্যে এই সময় কোনো রাজা ছিল না এবং সম্ভবতঃ সিংহাসনের কোনো ন্যায্য উত্তরাধিকারীও ছিল না। বিজয়ী আনাম সেনাপতির পরামর্শে সম্রাট আ-নান (A-Nan) নামে একজন সেনা-প্রধানকে (Military Chief) চম্পার শাসক নিযুক্ত করিলেন (১৩১৮ খ্রী)।

আনান তাঁহার পূর্ববর্তীদের পন্থাই অনুসরণ করিলেন। যখনই তিনি নিজেকে যথেষ্ট ক্ষমতাশালী বলিয়া মনে করিলেন তখনই তিনি আনামের অধীনতা হইতে মুক্ত হওয়ার প্রয়াস পাইলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি মোঙ্গোলদের সহিত সন্ধির প্রস্তাব চালাইতে লাগিলেন এবং ১৩২৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার ভাইকে চীন সম্রাটের দরবারে চম্পা রাজ্যের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত ক্ষমতাশালী প্রতিবেশী রাজার বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য অনুরোধ জানাইলেন। সম্রাট জেনৎ সং (Jen Tsong) ইহাতে রাজী হইলেন এবং নিন-হোয়াং (Ninh Hoang) কে চম্পা রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষার নির্দেশ দিয়া আনামে দূত পাঠাইলেন (১৩২৪ খ্রী)। ইহার উত্তরে নিন্‌-হোয়াং চম্পার বিরুদ্ধে ১৩২৬ খ্রীষ্টাব্দে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। আ-নান এই সেনাদলকে পরাজিত করিলেন এবং অতঃপর নিজেকে আর আনামের অধীন বলিয়া মনে করিতেন না।

ইহার পর কিছুদিন পর্যন্ত আ-নান মোঙ্গোলদের সহিত পূর্ব সম্বন্ধ বজায় রাখিয়াছিলেন এবং ১৩২৭, ১৩২৮ ও ১৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে চীন দরবারে দূত পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার পরে তিনি দূত পাঠানো বন্ধ করেন। এইরূপে তাঁহার রাজ্যকালের শেষ এগার বৎসর আ-নান স্বাধীন রাজা রূপে রাজত্ব করেন ও রাজ্যে শান্তি স্থাপন করেন।

আ-নানের পরে ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জামাতা বো-ডে সিংহাসন আরোহণ করেন। আ-নানের পুত্র চে-মো (Che-Mo) এই

অনধিকার নীরবে সহ্য করিল না। সে কিছু রাজভক্ত অনুচর সংগ্রহ করিয়া সিংহাসন লাভের জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। পরাজিত হইয়া সে আনাম রাজ দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করিল। আনামের রাজা একদল সৈন্য পাঠাইলেন (১৩৫৩ খ্রী), কিন্তু সেনাদল নৌ-বাহিনীর সহিত নির্দিষ্ট স্থানে মিলিত হইতে না পরিয়া ফিরিয়া গেল। চে-মো এই সেনাদলের সঙ্গে ছিল এবং এই সময়ের কিছু পরে তাহার মৃত্যু হয়।

বো-ডে আনাম সৈন্যদের ফিরিয়া যাওয়ার সংবাদে খুশি হইলেন এবং উত্তরের প্রদেশগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য আক্রমণ করা স্থির করিলেন। কিন্তু প্রথম আক্রমণের সময়েই (১৩৫৩ খ্রী) পরাজিত হওয়ায় এই পরিকল্পনা ত্যাগ করিলেন।

বো-ডের পরে চে বং গা (Che Bong Nga) রাজা হইলেন। তাঁহার সিংহাসন আরোহণের তারিখ এবং তাঁহার সহিত বো-ডের কি সম্পর্ক, এই সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তবে খুব সম্ভব তিনি ১৩৬০ খ্রীষ্টাব্দে বা ইহার কাছাকাছি সময়ে সিংহাসন আরোহণ করেন।

চেবংগার রাজ্যকাল আনামের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য বিখ্যাত হইয়া আছে। ১৩৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হঠাৎ দা-লি বন্দর আক্রমণ করেন। যে সমস্ত সৈন্য এই বন্দরটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত ছিল তাহাদের বিতাড়িত করিয়া তিনি সমস্ত শহরটি ও ইহার আশেপাশের জায়গাগুলি লুঠপাট করিলেন এবং এই সমস্ত জায়গায় বহু লোকজনকে হত্যা করিয়া প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্যসহ জলপথে ফিরিয়া আসিলেন। পরের বৎসর তিনি হোয়া-চৌ (Hoa Chau) এর প্রধান শহর লুঠ করেন। ১৩৬৫ খ্রীষ্টাব্দে হোয়া-চৌ-এর একটি স্থানীয় উৎসব উপলক্ষে যে সব বালক বালিকারা একস্থানে উপস্থিত হইয়াছিল চাম-রা তাহাদের হরণ করিয়া আনে।

অবশেষে ১৩৬৮ খ্রীষ্টাব্দে আনামের রাজা ডু-হোয়াং (Du Hoang) একটি শক্তিশালী সেনাদল চম্পার বিরুদ্ধে পাঠাইলেন,

কিন্তু চেবংগার হঠাৎ আক্রমণে তাহারা দ্রুত পলাইয়া যাইতে বাধ্য হইল।

আনামের রাজা ডু-হোয়াং ১৩৬৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে মারা যান। রাজমাতার চক্রান্তে তাঁহার একটি কিশোর পুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। কিন্তু মৃত রাজার ভ্রাতা ফু ইঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং ইঁহাকে বন্দী করিয়া নিজেই জিয়া-হোয়াং (Nghia-Hoang) নামে সিংহাসন আরোহণ করেন (১৩৭০ খ্রী)। রাজমাতা চম্পা রাজ্যে পলাইয়া যান ও চেবংগার সাহায্য লাভ করেন। ১৩৭১ খ্রীষ্টাব্দে চেবংগা একটি নৌবাহিনী লইয়া যাত্রা করেন এবং বিনা বাধায় আনামের রাজধানীতে প্রবেশ করেন। সমস্ত শহরটি লুঠ করিয়া ও রাজপ্রাসাদ পোড়াইয়া দিয়া তিনি প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া ফিরিয়া আসেন (১৩৭১ খ্রী)।

ইহার এক বৎসর পরে জিয়া হোয়াং (Nghia Hoang), খাম হোয়াং (Kham Hoang)-কে সিংহাসন দান করিয়া আনাম রাজ্য ত্যাগ করেন (১৩৭২ খ্রী)। নূতন রাজা, তাঁহার বংশকে চম্পার রাজা যে অপমান করিয়াছিল, তাহার প্রতিশোধ লইতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং এই উদ্দেশ্যে যুদ্ধের জন্য বিরাট আয়োজন করিতে লাগিলেন।

দীর্ঘকাল প্রস্তুতির পরে ১৩৭৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে খাম হোয়াং (Kham Hoang) চম্পার বিরুদ্ধে ১,২০,০০০ সৈন্য লইয়া যাত্রা করিলেন ও বিনা বাধায় বিজয় শহরের নিকট পৌঁছিলেন। বিজয় শহরটি কাঠের প্রাচীর (Palisade) দিয়া ঘেরা ছিল। এই সময় চম্পার এক ব্যক্তি খবর দিল যে শহর পরিত্যাগ করিয়া রাজা পলায়ন করিয়াছেন এবং তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইলে হয়তো এখনও রাজাকে ধরা যাইতে পারে। সেনাপতিদের পরামর্শে কর্ণপাত না করিয়া খাম হোয়াং অমনি সৈন্যপরিচালনার কোন সুব্যবস্থা না করিয়া বিশৃঙ্খল সেনাদল লইয়া অগ্রসর হইলেন।

যখন তাহারা খানিক দূর অগ্রসর হইয়াছে সেই সময় চাম সৈন্যদল সহসা তাহাদের আক্রমণ করিয়া গতিরোধ করিল। ইহাতে এমন আতঙ্কের সৃষ্টি হইল যে আনাম সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ পরাজিত হইল। দুইজন সেনাপতি সহ সম্রাট ও অন্যান্য বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির যুদ্ধক্ষেত্রেই মৃত্যু হইল।

এই জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গেই চেবংগা একটি নৌবাহিনী লইয়া আনামের রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গিয়ান হোয়াং (Gian Hoang) নামে এক ব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল, এবং তিনি রাজধানী রক্ষার জন্য আয়োজনও করিয়াছিলেন, কিন্তু চেবংগা শহরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত দিন ধরিয়া শহর লুঠ করেন ও প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া ফিরিয়া আসেন। ইহার পরের বৎসর আবার তিনি আনামের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। ঙ্ঘে-আন (Nghe-An) জয় করিয়া সেখানে নিজের মনোনীত লোককে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং রাজধানী লুঠ করিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া ফিরিয়া আসেন।

ইহার পর আনামের অধিবাসীরা সর্বদা চম্পার ভয়ে ভীত হইয়া থাকিত। সম্রাট গিয়ান-হোয়াং চম্পার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত ধনসম্পত্তি থিয়েন-কিয়েন (Thien Kien) পর্বতের গুহাগুলিতে নিরাপদ স্থানে সরাইয়া রাখিলেন (১৩৭৯ খ্রী)। ইহা করিয়া তিনি সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন। কারণ ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে চেবংগা পুনরায় নূতন করিয়া আনামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। আনামের বৃদ্ধ রাজা জল ও স্থলপথে, উভয় দিক দিয়াই রাজ্য রক্ষার আয়োজন করেন এবং শেষ পর্যন্ত চেবংগাকে হারাইয়া দিতে সক্ষম হন। চেবংগা পলাইয়া যান।

এই পরাজয় সত্ত্বেও চেবংগা মাঝে মাঝেই আনামাইটদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। ১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আনাম সেনাদলকে পরাজিত করিয়া রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

তিনি হাই ত্রিউ (Hai Trieu) নদীর কাছে পৌঁছিলেন এবং অনায়াসে সমস্ত দেশ জয় করিতে পারিতেন, কারণ তাঁহাকে বাধা দিতে কেহ ছিল না।

কিন্তু এই সময়ে একজন চাম সৈন্যাধ্যক্ষের বিশ্বাসঘাতকতায় অবস্থার আমূল পরিবর্তন হইল। চম্পার একজন সৈন্যাধক্ষ কোনো দুষ্কার্যের জন্য তিরস্কৃত হইয়াছিল এবং সে নিজের জীবন নিরাপদ মনে করিতেছিল না। চেবংগা যখন শ' খানেক জাহাজ লইয়া শত্রুসৈন্যের অবস্থা নিরূপনের জন্য অগ্রসর হইলেন, তখন এই সৈন্যাধ্যক্ষ শত্রুপক্ষে যোগ দিল এবং তাহাদের জানাইল যে চম্পার রাজার নিজস্ব জাহাজটি তাহার সবুজ রং হইতে চেনা যাইবে। এই খবর পাইয়া আনাম সেনাপতি চাম নৌবাহিনী আক্রমণ করিল ও তাহার দলের লোকদের বিশেষ করিয়া রাজার জাহাজটির উপর আক্রমণ করিতে নির্দেশ দিল। হঠাৎ এই মিলিত আক্রমণের ফলে চেবংগার মৃত্যু হয়। নায়কের এই আকস্মিক মৃত্যুতে হতাশ হইয়া সেনাপতি লাখাই (Lakhai) এর অধীনে হোং নদীতে অবস্থিত প্রধান নৌবাহিনীর সহিত যোগ দিবার জন্য চাম সৈন্য তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসে (ফেব্রুয়ারি ১৩৯০ খ্রী)। লাখাই তাড়াতাড়ি সেনাদল লইয়া স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিল। শত্রুসৈন্য পিছন পিছন আসিয়া আক্রমণ করে কিন্তু সহজেই পরাজিত হয়। চম্পা রাজ্যে ফিরিয়াই লাখাই নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। চেবংগা-র দুই পুত্র ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া আনাম রাজ দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করে। যদিও সেখানে তাহাদের সসম্মানে অভ্যর্থনা করা হইল তথাপি তাহারা সিংহাসন উদ্ধারের জন্য কোন সাহায্য লাভ করিতে সক্ষম হইল না।

৩। আনামাইটদের শেষ বিজয়

নূতন রাজবংশের প্রতিষ্টাতা লাখাই (Lakhai) ও বৃষু রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীজয়সিংহবর্মদেব (চতুর্থ) শ্রীহরিজাত্তি বীরসিংহ চম্পাপুর খুব সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি।

তান-বিন (Tan Binh) ও থুয়ান হোয়া (Thuan Hoa) নামে যে দুইটি প্রদেশ চেবংগো জয় করিয়াছিল সে দুইটি তাহার মৃত্যুর পরে আবার আনামের আনুগত্য স্বীকার করে। সম্ভবতঃ চম্পারাজ্যের অন্যান্য সব অংশও চতুর্থ জয় সিংহবর্মদেবের অধীনতা স্বীকার করে নাই। তিনি দশ বৎসর (১৩৯০-১৪০০ খ্রী) রাজত্ব করার পর শ্রীবৃষু বিষ্ণুজাত্তি বীর ভদ্রবর্মদেব রাজা হ'ন। এই রাজা প্রথমে কুমার নউক গ্লউন বিজয় (Nauk Glaun Vijaya) নামে পরিচিত ছিলেন এবং বত্রিশ বৎসর রাজত্ব করার পর তাঁহার যখন অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তখন বৃষু ইন্দ্রবর্মন নাম গ্রহণ করেন।

আনামাইটরা কোনদিনই চম্পা জয়ের আশা ত্যাগ করে নাই এবং ১৪০১ খ্রীষ্টাব্দে আবার ইহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করে। বীর ভদ্রবর্মন এই সময়ে কেবলমাত্র সিংহাসন আরোহন করিয়াছিলেন। তিনি বীরত্বের সহিত শত্রুদের বাধা দেন এবং তাহাদের পিছু হটিয়া যাইতে বাধ্য করেন। বহু বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া আনামাইট সৈন্যরা নিজেদের রাজত্বে ফিরিয়া যাইতে সক্ষম হয়।

১৪০২ খ্রীষ্টাব্দে আনামাইট সৈন্যরা আবার চম্পা আক্রমণ করে। ভদ্রবর্মন তাঁহার সেনাপতিকে ইহাদের বাধা দিবার জন্য পাঠান কিন্তু একটি অগ্রগামী শত্রু সেনাদলের সহিত যুদ্ধের সময় তাহার মৃত্যু হয়। ইহাতে রাজা নিজের জীবন ও রাজ্যের জন্য শঙ্কিত হইয়া নানাবিধ মূল্যবান উপহার সহ নিজ মাতুলকে শত্রুদের সহিত সন্ধির জন্য পাঠান। শত্রুতা ত্যাগ করিয়া আনামাইট সৈন্যদের সরাইয়া লইবার বিনিময়ে তিনি ইন্দ্রপুর নামে সমৃদ্ধিশালী প্রদেশটি আনাম রাজাকে দান করিবার প্রস্তাব করেন। আনামাইটরা ঐ প্রদেশটি ছাড়াও কুয়াং-ঙিয়া (Quang-Nghia) দাবী করে এবং এইরূপে সমস্ত কুয়াং-নাম (Quang-Nam) ও কুয়াং ঙিয়া (Quang-Nghia) অর্থাৎ প্রাচীন অমরাবতী প্রদেশটি শত্রুদের

ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহা চম্পা রাজ্যের ক্ষমতা ও সম্মানের পক্ষে বিশেষ হানিকর হইল। পূর্ব সমৃদ্ধির স্মৃতি বিজড়িত প্রাচীন রাজধানী ইন্দ্রপুর বহুবিধ সম্পদে ও বিভিন্ন বিজয় যাত্রার স্মৃতিসৌধে পরিপূর্ণ ছিল। সর্বাপেক্ষা উর্বরা ও সমৃদ্ধিশালী প্রদেশগুলির মধ্যে অমরাবতী অন্যতম ছিল। এই অসম্মানজনক সন্ধির দ্বারা চম্পা রাজ্যের আয়তন প্রায় অর্ধেক হইয়া গেল এবং উত্তরের উর্বরা ভূমি হারাইয়া দক্ষিণের পার্বত্য অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হইল।

ভদ্রবর্মন নিজের হঠকারিতায় শীঘ্রই অনুতপ্ত হইলেন। তিনি চীন সম্রাটের কাছে সাহায্যের জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইলেন (১৪০৩ খ্রী) এবং চীন সম্রাট আনাম রাজদরবারে তাঁহার প্রতিবেশী রাজ্যকে শান্তিতে থাকিবার নির্দেশ দিয়া দুইজন দূত পাঠাইলেন। ইহার উত্তরে আনামাইটরা জল ও স্থলপথে ২০০,০০০ সৈন্য চম্পার বিরুদ্ধে পাঠাইল।

আনামের এই ব্যবহারে চীন সম্রাট অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি ভদ্রবর্মনের সাহায্যের জন্য যুদ্ধ জাহাজ পাঠাইলেন। আনামের নৌবাহিনী ইহাদের সম্মুখে পড়িয়া যুদ্ধ না করিয়াই পিছাইয়া গেল। আনামের যে সেনাদল বিজয় অবরোধ করিয়াছিল, তাহারাও নগরটি সুরক্ষিত থাকায় এবং নিজেদের খাদ্যের অভাব হওয়ায় ফিরিয়া গেল।

কিন্তু চীন সম্রাট তাঁহার এই দুর্ধর্ষ প্রতিবেশী রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন এবং চম্পার রাজাও তাঁহাকে এই কার্যে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। যদিও আনামের রাজা, যাহাতে এই যুদ্ধ না হয় তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তথাপি শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে বাধ্য হইয়া যুদ্ধ করিতে হয় এবং ইহাই তাঁহার ও তাঁহার রাজবংশের সর্বনাশের কারণ হয়। ১৪০৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে আনামের রাজা তাঁহার পিতা ও পুত্র সহ চীনাদের হাতে বন্দী হন এবং সকলেই নির্বাসন কালে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন।

বীরভদ্রবর্মন তাঁহার শত্রুপক্ষের এই পরাজয়ে আহ্লাদিত হইয়া চীন সম্রাটকে প্রচুর রাজস্ব পাঠাইলেন এবং প্রতিদানে মহার্ঘ্য উপহার দ্রব্য পাইলেন। ইহার পর তিনি যেসব প্রদেশগুলি আনাম রাজ্যকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, সেইগুলি উদ্ধারের জন্য সৈন্য পাঠাইলেন। আনামের যে সেনাদল এইগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত ছিল তাহারা সহজেই পরাজিত হইল এবং ১৪০২ খ্রীষ্টাব্দে যে প্রদেশ দুইটি ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল সেই দুইটি আবার চম্পার অধীন হইল।

চীন কর্তৃক আনামের পরাজয়ের ফলে উত্তরদিক হইতে কোন গোলমালের আশঙ্কা না থাকায় ১৪০৭ খ্রীষ্টাব্দে ভদ্রবর্মন কাম্বোজ আক্রমণ করেন এবং ইহাতে যথেষ্ট সফলতা লাভ করেন। বীর ভদ্রবর্মন ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মহাবিজয় রাজা হন।

সিংহাসন লাভ করিয়াই মহাবিজয় তাঁহার খুল্লতাত যে তাঁহাকে লিখিত দলিলপত্র দ্বারা সিংহাসন দান করিয়া গিয়াছেন, এই খবর দিয়া চীন সম্রাটের নিকট দূত পাঠান ও সিংহাসনে আরোহণ করিবার জন্য তাঁহার অনুমোদন প্রার্থনা করেন। চীন সম্রাট তাঁহাকে চম্পার রাজা নিযুক্ত করেন এবং রাজা ও রাণীর জন্য উপহার পাঠান।

এইরূপে চীনের বন্ধুতা, অন্ততপক্ষে নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া মহাবিজয় পুরাতন রীতি অনুযায়ী আনাম সীমান্তে উপদ্রব শুরু করেন। আনামের সীমান্তে অবস্থিত হোয়া-চৌ (Hoa Chau) প্রদেশের বিরুদ্ধে ১৪৪৪ ও ১৪৪৫ খ্রীষ্টাব্দে দুইবার তিনি সৈন্য পাঠান। কিন্তু দ্বিতীয়বার দুর্ভাগ্যক্রমে সেনাদল আনডুঙ্গ দুর্গে একটি বন্যার মধ্যে পড়ে এবং তাহাদের প্রচুর ক্ষতি হয়।

আনামাইট-রাজ অনবরত এই সীমান্ত প্রদেশের যুদ্ধে শ্রান্ত হইয়া একেবারে চম্পা রাজ্যের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া যুদ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন। আনামাইট সেনাদল চম্পা রাজ্যে প্রবেশ করিয়া শত্রু সৈন্য পরাজিত

করিয়া রাজধানী বিজয় অবরোধ করিল (১৪৪৬ খ্রী)। মহাবিজয় সৈন্যসহ নগরের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন ও এইরূপে শত্রুদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার আশা করিলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মহা কুই-লাই তাঁহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিল। সে নিজে চম্পার রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে এই প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে শহরটি আনামের সেনাদলের হাতে সমর্পণ করিল। পত্নী ও উপপত্নীদের সহিত মহাবিজয় বন্দী হইলেন ও শত্রুরা প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেল।

নিজের দেশ ও রাজার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মহা কুই-লাই রাজত্ব লাভ করিলেন বটে, কিন্তু বেশিদিন তাঁহার ভাগ্যে রাজ্য ভোগ করা হইল না। তাঁহার ছোট ভাই কুই-ডো তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া বন্দী করিলেন এবং নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন (১৪৪৯ খ্রী)।

১৪৫৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে বা পরবর্তী বৎসরের প্রথম দিকে মহা বন-ল ত্র-ঙ্গুয়েৎ (Mahā Ban-la Tra-Nguyet)-এর নির্দেশে একজন ধাত্রীর পুত্র কুই-ডোকে হত্যা করে। এই নূতন রাজা চীন দরবারের কাছ হইতে স্বীকৃতি পাইলেন, কিন্তু তিনি আনাম সম্রাটকে অধীন রাজার ন্যায় কোন সম্মান দেখাইলেন না। ইহার ফলে দুই দেশের মধ্যে পূর্বের শত্রুতা আবার দেখা দিল এবং একবার চম্পার রাজা আনামের আক্রমণের বিরুদ্ধে চীন সম্রাটের কাছে নালিশও জানাইলেন। কিন্তু এই রাজা বেশিদিন রাজত্ব করেন নাই। ছোট ভাই বান-ল-ত্র-তোয়ান (Ban-La-Tra-Toan)-কে রাজ্য দান করিয়া তিনি ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন ত্যাগ করিলেন।

পূর্ববর্তী রাজার দুষ্কার্যের ফলে আনামের সহিত চম্পা রাজ্যের মধ্যে যে শত্রুতার সৃষ্টি হইয়াছিল এই নূতন রাজার আমলেও তাহার শেষ হইল না। আনাম সম্রাট থান-টন চম্পাকে তাহার অধীনস্থ রাজ্য হিসাবে মনে করিতেন। কিন্তু ত্র-তোয়ান (Tra-Toan) যে কোন

উপায়েই হউক তাঁহার রাজ্যের স্বাধীনতা বজায় রাখিতে বদ্ধপরিকর হইলেন এবং যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন। প্রথমে তিনি হোয়া-চৌ (Hoa-Chau) প্রদেশের বিরুদ্ধে একটি নৌবাহিনী পাঠাইলেন (১৪৬৯ খ্রী) এবং তাহার পরের বৎসর ১০০,০০০ সৈন্য লইয়া ঐ প্রদেশটি আক্রমণ করিলেন। তাঁহার সহিত শক্তিশালী অশ্ববাহিনী ও হস্তিবাহিনী ছিল। আনামের সেনাপতি এই বিশাল বাহিনীকে বাধা দিতে না পারিয়া দুর্গদ্বার বন্ধ করিয়া আত্মগোপন করিল এবং থান-টনকে তাহার বিপন্ন অবস্থার খবর পাঠাইল।

সম্রাট এই সুযোগেরই অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ১০০,০০০ লোকসহ এক বিরাট নৌবাহিনী রওয়ানা করিয়া দিয়া নিজে ১৫০,০০০ সৈন্য লইয়া যাত্রা করিলেন। এই বিশাল সেনাবাহিনী নির্বিঘ্নে চম্পা রাজ্যে পৌঁছিল (১৪৭১ খ্রী)। শত্রু শিবির অতর্কিতে আক্রমণ করিবার জন্য ত্র-তোয়ান (Tra-Toan) নিজের ছোট ভাইয়ের অধীনে ৫,০০০ লোক লইয়া গঠিত একটি হস্তিবাহিনী পাঠাইলেন। কিন্তু শত্রুরা এই ছোট সেনাদলকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং প্রায় সমূলে ধ্বংস করিল।

এই দুঃসংবাদে ত্র-তোয়ান অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন এবং আনুগত্য স্বীকারের প্রস্তাব করিয়া তাঁহার পরিবারের একজনকে সম্রাটের কাছে পাঠাইলেন। কিন্তু সম্রাট আরও অগ্রসর হইয়া শ্রীবিনি দখল করিলেন এবং অবশেষে রাজধানী বিজয় অবরোধ করিলেন। পরে শহরটি আক্রমণ করিয়া অতি সহজেই ইহা দখল করিলেন। প্রায় ৬০,০০০ চাম নিহত হইল এবং ৩০,০০০ বন্দী হইল। রাজা ও রাজপরিবারের পঞ্চাশ জন বন্দী হইল। ত্র-তোয়ানকে বেশিদিন এই অপমান সহ্য করিতে হয় নাই, আনামে যাইবার পথে জাহাজেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইতিমধ্যে বো-ত্রি-ত্রি নামে এক চাম সেনাপতি অবশিষ্ট সৈন্যদের একত্র করিয়া পাণ্ডুরঙ্গে আশ্রয় লইল। এইখানে সে নিজেকে রাজা

বলিয়া ঘোষণা করিল ও আনুগত্যের শপথ করিয়া ও রাজস্ব দিয়া একজন দূতকে থান-টনের কাছে পাঠাইল। সম্রাট ইহা গ্রহণ করিলেন। যে পর্বতমালা বর্তমানে ফু-য়েন (Phu-Yen) ও খান-হোয়া (Khanh-Hoa) প্রদেশ দুইটি বিভক্ত করিয়া ভেরেলা অন্তরীপে শেষ হইয়াছে তাহাই এই সময় হইতে চম্পা ও আনাম রাজ্যের সীমানা হইল। একটি পাথরের ফলক দ্বারা সীমানা নির্দেশ করা হইল।

অমরাবতী প্রদেশ ১৪০২ খ্রীষ্টাব্দে আনামকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় কিন্তু ১৪০৭ খ্রীষ্টাব্দে চামরা আবার ইহা অধিকার করে। এখন অমরাবতী ছাড়া বিজয় প্রদেশও আনামের অধীনস্থ হইল। কেবল মাত্র কৌঠার ও পাণ্ডুরঙ্গ লইয়া চম্পা রাজ্য গঠিত হইল এবং এইরূপে চেবংগা-র সময়েও রাজ্যের আয়তন যাহা ছিল এখন তাহার এক পঞ্চমাংশে পর্যবসিত হইল। যে সামান্য অংশটুকু এই রাজ্যের অন্তর্গত রহিল (অর্থাৎ বর্তমান খান হোয়া (Khan Hoa) ও বিন-থুয়ান (Binh Thuan) জেলা) তাহাও শক্তিশালী আনামের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া কোন মতে টিকিয়া রহিল।

কিন্তু প্রাচীনকালের গৌরব ও প্রতিপত্তির মায়া ত্যাগ করা সহজ নহে। দক্ষিণ প্রদেশে অবস্থিত ক্ষুদ্র চাম শাসকরা 'চম্পার রাজা' এই গৌরবময় উপাধি ব্যবহার করিত এবং চীন সম্রাট শুধু যে ইহাতে সম্মতি দিতেন তাহা নহে, তাহাদের অমরাবতী ও বিজয় ফিরাইয়া দিবার জন্য আনামাইটদের নির্দেশও দিলেন। এইভাবে চীন দরবার হইতে রাজ্য গ্রহণের অনুমতি তিনজন রাজা পাইয়াছিলেন। প্রথম, পূর্ববর্তী এক রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র, চৈ-য়া-মা ফুঙ্গান (Chai-Ya-Ma-Fu-Ngan)। তিনি ১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। সম্ভবতঃ তাঁহার ভাই কুলাই তাঁহাকে হত্যা করেন ও নিজে রাজা হ'ন এবং ১৪৭৮ হইতে ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী চা-কু-পু-লো (Cha-Ku-Pu-Lo) প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ১৫০৯

খ্রীষ্টাব্দে চীন দরবার হইতে সিংহাসনে আরোহণের অনুমতি লাভ করেন এবং ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে চীনে দূত পাঠান। চম্পা রাজ্য হইতে চীনে এই শেষবারের মত দূত পাঠানো হয়।

এই রাজার জীবনের পরিণতি অত্যন্ত দুঃখময়। আনাম রাজ্যের আভ্যন্তরিক গণ্ডগোলের সুযোগে তিনি নিজ রাজ্য আনামের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য শেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি পরাজিত হ'ন ও তাঁহাকে একটি লোহার খাঁচার মধ্যে বন্দী করিয়া রাখা হয়। এইভাবেই তাঁহার মৃত্যু হয়। এই উপলক্ষে আনামাইটরা ফনরং নদী পর্যন্ত চাম রাজ্যের অংশ দখল করে। এই সময় হইতে চাম রাজ্যের রাজধানী ফানরিতে অবস্থিত বালচানারে স্থানান্তরিত হয়। এখানে ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে গ্যালাথি (Galathee) জাহাজের নাবিকেরা চম্পার রাজাকে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিয়াছিল; এবং তাহাদের বিবরণ হইতে রাজপ্রাসাদের অনেক খবর জানা যায়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দে খান-হোয়া (Khan Hea) ও ফান রাং (Phan Rang) প্রদেশ দুইটি চামদের হস্তচ্যুত হইল। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে শেষ রাজা পো চোঙ্গ আনামাইটদের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া একদল দেশবাসীর সহিত কাম্বোজে চলিয়া গেলেন। শুধু রাজকুমারী পো বিয়া তথা-কথিত 'চাম রাজ্যের ধনসম্পত্তি' রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বালচানারে রহিলেন। সসম্মানে বহুদিন অবস্থান করিয়া পরিণত বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে অনুগত প্রজারা অত্যন্ত দুঃখিত হয়, কারণ এই রাজকুমারীই তাহাদের কাছে স্বাধীনতার শেষ চিহ্ন স্বরূপ ছিলেন।

এইরূপে ভারতীয় উপনিবেশের একটি গৌরবময় অধ্যায়ের শেষ হইল। ভারতবর্ষের যে বীর সন্তানেরা একদা সুদূরে জয় পতাকা উড়াইয়াছিল প্রায় পনরশত বৎসর ধরিয়া সসম্মানে তাহার গৌরব রক্ষা করিয়া অবশেষে তাহারা বিস্মৃতির অন্তরালে মিলাইয়া গেল। কিন্তু যে সভ্যতার আলোক তাহারা এখানে বহন করিয়া আনিয়াছিল,

কালের গতি তাহাকে সম্পূর্ণ ম্লান করিতে পারে নাই এবং ইতিহাসের পাতায় এখনও তাহার আভাষ পাওয়া যায়।

প্রাচীন চম্পা বর্তমান ভিয়েটনামের দক্ষিণ ও মধ্যভাগে অবস্থিত ছিল। এখনও সেখানে প্রায় ৪০,০০০ চাম বাস করে। আনাম কর্তৃক চম্পা জয়ের পরও যাহারা দেশ ছাড়িয়া যায় নাই ইহারা তাহাদেরই বংশধর। ইহাদের দুই-তৃতীয়াংশ এখনও ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করিয়াছে—কিন্তু তাহারা এখনও অনেক পুরাতন সামাজিক আচার ব্যবহার ত্যাগ করে নাই। ধর্মের ভেদ থাকিলেও এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকটা সম্প্রীতি আছে।

যে সকল চাম খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে দেশ ছাড়িয়া কাম্বোজে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের বংশধরেরা তায় নিন ও চাউ ডোক এই দুই প্রদেশে বাস করে। তাহাদের সংখ্যা প্রায় ১২,০০০। এই দুই প্রদেশ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে আনাম বা ভিয়েটনামের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহারা সকলেই মুসলমান।

সপ্তম অধ্যায়

শাসন-পদ্ধতি

চম্পা রাজ্যে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। সমস্ত রাজ্য রাজার শাসনাধীন ছিল এবং শাসন বিষয়ে রাজার পূর্ণ ক্ষমতা ছিল। কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা, অসামরিক, সামরিক ও ধর্মবিষয়ক। অসামরিক শাসন বিষয় দুইজন প্রধান মন্ত্রী ও তাহাদের অধীনস্থ তিন শ্রেণীর কর্মচারীর হাতে ছিল। প্রধান সামরিক কর্মচারী ছিল সেনাপতি ও রক্ষী নায়ক (Captain of Guards), এবং ধর্ম বিষয়ক কাজকর্ম পরিচালনা করিতেন প্রধান পুরোহিত, ব্রাহ্মণ, জ্যোতিষী. পণ্ডিতগণ ও অনুষ্ঠান-অধিকর্তা।

রাজ্যটি তিনটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল।

(১) অমরাবতী, রাজ্যের উত্তর অংশ—বর্তমান কুয়াঙ্গনাম প্রদেশ। চম্পাপুর ও ইন্দ্রপুর এই দুইটি বিখ্যাত রাজধানী এখানে অবস্থিত ছিল। বর্তমান ডং ডুয়োং শহরে ইন্দ্রপুর অবস্থিত ছিল।

(২) বিজয়, রাজ্যের মধ্যভাগ—বর্তমান বিন ডিন প্রদেশ। এখানকার প্রধান শহর বিজয়ে কিছুকাল সমস্ত রাজ্যের রাজধানী অবস্থিত ছিল। এখানে বিখ্যাত বন্দর শ্রীবিনয় অবস্থিত ছিল।

(৩) পাণ্ডুরঙ্গ, রাজ্যের দক্ষিণ ভাগ—বর্তমান ফান রাণ (Phan-ranh) ও বিন-থুয়ান (Binh-Thuan) উপত্যকাদ্বয়। ইহার প্রধান শহর বীরপুর অথবা রাজপুর নামে পরিচিত এবং এখানে এক সময়ে সমস্ত রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কৌঠার অঞ্চল (অধুনা খান-হোয়া—Khan

Hoa) এই প্রদেশের অন্তর্গত, কিন্তু মাঝে মাঝে এই অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাজ্য গঠিত হইয়াছিল।

এই প্রদেশগুলি আবার বিভিন্ন জেলায় বিভক্ত ছিল। একটি চীনা বিবরণী হইতে জানা যায় যে চতুর্থ হরিবর্মনের রাজ্যকালে (১০৮০ খ্রী) গুএলি সংখ্যায় আটত্রিশ ছিল। প্রত্যেক জেলায় কয়েকটি শহর ও অনেকগুলি গ্রাম ছিল এবং এই গ্রামগুলি রাজ্যের ক্ষুদ্রতম বিভাগ ছিল।

প্রতি প্রদেশের শাসনকার্যে প্রাদেশিক শাসনকর্তা (Governor) ও সেনাপতি এই দুইজনই প্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তার অধীনে পঞ্চাশজন বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী শাসনকার্য পরিচালনা ও কর আদায়ের জন্য নিযুক্ত হইত। এই সমস্ত কর্মচারীরা কোন বেতন পাইত না, হয় কিছু জায়গির পাইত, অথবা যে সমস্ত দেশবাসী তাহাদের অধীনস্থ ছিল তাহারাই ইহাদের ব্যয় নির্বাহ করিত। নাগরিকরা এই সমস্ত কর্মচারীদের খরচ জোগাইতে বাধ্য ছিল এবং 'বাধ্যতামূলক শ্রম' (Forced Labour) প্রচলিত ছিল।

রাজ্যের প্রধান আয় হইত ভূমি-কর হইতে। সাধারণতঃ উৎপাদনের এক-ষষ্ঠাংশ কর রূপে গৃহীত হইত কিন্তু কখনও ইহা কমাইয়া এক-দশমাংশও করা হইত। কখনও রাজা এই প্রাপ্য অংশ খরচ নির্বাহের জন্য মন্দিরে দান করিতেন। ইহা ছাড়া যে সব জমি মন্দিরের অধিকারভুক্ত থাকিত তাহার খাজানা রাজা প্রায়ই মাফ করিতেন। সকল প্রকার শিল্পজাত ও বাণিজ্য দ্রব্যের উপর কর ধার্য করা হইত।

বিচার পদ্ধতি হিন্দুরীতির অনুযায়ী ছিল। কথিত আছে দ্বিতীয় জয় ইন্দ্রবর্মদেব "মনু-স্মৃতিতে বর্ণিত আইনের আঠারটি বিবাদ-পদ মানিয়া চলিতেন।" চতুর্থ হরিবর্মদেবও অনুরূপ প্রথা প্রচলিত রাখিয়াছিলেন। চতুর্থ জয় ইন্দ্রবর্মদেব ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে, বিশেষ করিয়া নারদীয় ও ভার্গবীয় ধর্মশাস্ত্রে, বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন।

কতকগুলি অপরাধের শাস্তিস্বরূপ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইত ও অপরাধীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লোপ পাইত। ঋণের শাস্তিস্বরূপ দাসত্বপ্রথা প্রচলিত ছিল। বেত্রদণ্ডই সাধারণতঃ অপরাধের প্রধান শাস্তি ছিল। অপরাধীকে মাটিতে শোয়াইয়া তাহার দুই পাশে দুইজন করিয়া চারিজন লোক পর্যায়ক্রমে তাহাকে বেত মারিতে থাকিত। বেত্রাঘাতের সংখ্যা অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী ৫০, ৬০ এবং কখনও ১০০ পর্যন্ত হইত। অঙ্গুলি ছেদন, চুরি ও ডাকাতির জন্য নির্ধারিত শাস্তি ছিল।

মৃত্যুদণ্ড দিবার অনেক রকম প্রণালী ছিল। সাধারণতঃ অপরাধী ব্যক্তিকে একটি গাছের সহিত বাঁধা হইত এবং তীক্ষ্ণ বর্শা তাহার গলায় বিঁধাইয়া পরে মাথাটি কাটিয়া ফেলা হইত। বিনা উত্তেজনায় খুন, অথবা ডাকাতির সময়ে খুন করিলে অপরাধী ব্যক্তিকে হয় নাগরিকদিগের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইত ও তাহারা তাহাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিত, নতুবা হাতির পায়ের নীচে ফেলিয়া অপরাধীকে পিষিয়া মারা হইত। বশ্যতা স্বীকার না করা পর্যন্ত বিদ্রোহীকে নির্জন জায়গায় স্তম্ভের সহিত বাঁধিয়া রাখা হইত। আবার কতকগুলি অপরাধের জন্য দেশ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইত।

রাজ্যে একটি স্থায়ী বৃহৎ সেনাদল পোষণের ব্যবস্থা ছিল। ফান-ওয়েন (Fan Wen) এর সময়ে সৈন্যগণের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ হইতে পঞ্চাশ হাজারের মত ছিল। পরবর্তীকালে ইহার সংখ্যা আরও বাড়ানো হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। চেবংগা (Che Bong Nga) এর সময়ে কেবল রাজার দেহরক্ষীর সংখ্যাই ছিল পাঁচ হাজার। সৈনিকেরা অস্ত্র হিসাবে ঢাল, বর্শা, কুঠার ও তীর ধনুক ব্যবহার করিত। তীরের পিছনে পালক লাগানো থাকিত না, কিন্তু ইহার অগ্রভাগ বিষ মাখানো থাকিত। সৈনিকেরা যুদ্ধকালে পতাকা হাতে ঢাকের বাদ্য ও শঙ্খধ্বনির তালে তালে পদক্ষেপ করিত। পাঁচজন সৈনিক লইয়া একটি দল গঠিত হইত এবং দলের একজন অপরের জন্য দায়ী থাকিত।

দলের একজন পলাইলে অপর চারিজনের মৃত্যুদণ্ড হইতে পারিত।

চাম সেনাদল পদাতিক, অশ্বারোহী ও হস্তিবাহিনী লইয়া গঠিত ছিল। ১১৭১ খ্রীষ্টাব্দে চীনাদের নিকট হইতে চামেরা ঘোড়ার পিঠের উপর হইতে তীর ছোড়ার কৌশল শেখে। অবশ্য ইহা খুব আয়াসসাধ্য, কারণ অশ্বারোহীর দুইটি হাতই মুক্ত রাখিতে হইত। হস্তিবাহিনী সেনাদলের একটি প্রধান অংশ ছিল। যুদ্ধের জন্য প্রায় এক হাজার হাতি চম্পায় ছিল। ওডোরিক ডি পর্দেনোন (Odoric de Pordenone) যে সময়ে চম্পা ভ্রমনে যান (আঃ ১৩২৩ খ্রী) তখন চম্পার রাজার ১৪,০০০ পোষা হাতি ছিল বলিয়া জানা যায়।

বড় বড় যুদ্ধ জাহাজ ও হালকা নৌকা লইয়া নৌবাহিনী গঠিত ছিল। রণতরীর সংখ্যা খুব বেশী ছিল বলিয়া মনে হয় এবং ১০০টি জাহাজ লইয়া গঠিত এক একটি দল স্থলপথে সেনা চলাচলের সময় তাহাদের সাহায্যের জন্য নিযুক্ত থাকিত বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়।

অষ্টম অধ্যায়

চম্পায় ভারতীয় কৃষ্টি

১। সমাজ

চম্পায় ভারতীয় ঔপনিবেশকরা ভারতে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে প্রয়াস করিয়াছিল, কিন্তু ঐ দেশের পূর্ব প্রচলিত রীতি ও ধারা অনুযায়ী কতগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপারে কিছু কিছু পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। জনসাধারণ সাধারণতঃ চারি বর্ণে বিভক্ত ছিল, যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—কিন্তু বাস্তব জীবনে এই বিভাগ শুধু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বেলায় মানিয়া চলা হইত, অন্য দুই বর্ণের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না।

ভারতীয় ঔপনিবেশকরা প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই বর্ণের অন্তর্গত ছিল। অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে সম্ভবতঃ জাতিবিভাগের কঠোরতা খুব উগ্র রকমের ছিল না। সম্ভবতঃ বণিক সম্প্রদায় তাহাদের ধনসম্পত্তির দৌলতে সমাজে উচ্চ স্থানের অধিকারী ছিল। কিন্তু ইহা ছাড়া অন্যান্য সাধারণ লোকের মধ্যে—তাহারা ভারতীয় অথবা চাম, যে দেশীয় হউক না কেন—সামাজিক মর্যাদার সম্ভবতঃ বিশেষ কোনও প্রভেদ ছিল না। প্রাচীন লেখগুলি হইতে এমন কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যে, সমাজে পরাজিত চামদের বিশেষভাবে দাস রূপেই গণ্য করা হইত।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রভেদ, বর্ণগত অপেক্ষা শ্রেণীগত ছিল বলিয়া মনে হয়। ঐ দুই শ্রেণীর মধ্যে বিবাহে যে কোনও বাধা ছিল না তাহা স্পষ্টই বুঝা যায় এবং এইরূপ অসবর্ণ বিবাহ খুবই প্রচলিত ছিল।

সমাজে ব্রাহ্মণের স্থান ছিল সর্বোচ্চে। কিন্তু রাজা ও রাজ্যের উপর তাহাদের প্রভুত্ব ভারতের মত এখানে অতটা বিস্তৃতি লাভ করে নাই। তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে তাহারা যথেষ্ট মর্যাদার পাত্র ছিল। ব্রাহ্মণরা দেবতা বলিয়া পরিগণিত হইতেন ও ব্রহ্মহত্যা অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ বলিয়া মনে করা হইত। অবশ্য তাহাদের স্থান ক্ষত্রিয়ের উচ্চে ছিল কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। একটি মাত্র বিবরণে চার বর্ণের নাম একত্রে পাওয়া যায়, ইহাতে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ব্রাহ্মণ বর্ণের নাম সর্বপ্রথম উল্লিখিত। কিন্তু অন্যান্য বহুক্ষেত্রে, যেখানে কেবলমাত্র দুইটি বর্ণের উল্লেখ আছে, সেখানে ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ ব্রাহ্মণের আগে করা হইয়াছে,—যেমন ভারতের বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে দেখা যায়। মোটের উপর যে সব প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই বর্ণের মধ্যে বিভেদ খুব কঠোর ছিল না এবং এইজন্য বর্ণ প্রথা বলিতে যাহা বুঝায় ঠিক সেই অর্থে ইহা এই দুয়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। প্রধানতঃ সমাজ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় লইয়া উচ্চ শ্রেণী এবং অবশিষ্ট লইয়া নিম্নশ্রেণী।

কিন্তু সমাজে আর একটি প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়—অর্থাৎ অভিজাত ও সাধারণ লোক। এই প্রভেদের সীমা খুব নির্দিষ্ট ছিল না। অর্থাৎ অভিজাত সম্প্রদায় সাধারণতঃ রাজ্যের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শ্রেণী লইয়াই গঠিত ছিল, তথাপি সাধারণ লোকেরাও তাহাদের ধনসম্পত্তির দৌলতে বা কোনও বিশিষ্ট রাজকার্যে নিযুক্ত থাকার দরুণ যে এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইত ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। ধনী সম্প্রদায়ের বাহ্যিক চিহ্ন ছিল—

(১) পোশাক ও অলঙ্কার।

(২) বাদ্যযন্ত্র সহযোগে বিশেষ যানবাহনের অর্থাৎ পালকি, হাতি প্রভৃতি ব্যবহারের অধিকার।

(৩) রাজার নিকটে আসন গ্রহণের অধিকার।

এই বিষয়ে ভারতীয় ঔপনিবেশকরা তাহাদের মাতৃভূমির প্রথা বজায় রাখিয়াছিল। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে কোনও বিশেষ পোশাক পরিধান করার বা যানবাহন ব্যবহারের অধিকারের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হইত, কারণ কবিরা তাহাদের গুণের জন্য বা অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা রাজকার্যে যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার জন্য রাজার নিকট হইতে এই ধরণের সম্মান লাভ করিত।

প্রাচীন চম্পার মূর্তিগুলি হইতে তখনকার সাধারণ লোকের ব্যবহৃত পোশাক ও গহনার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হয়।

পোশাক সম্বন্ধে বলিতে গেলে সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইহার স্বল্পতা। কেবল কোমর হইতে দেহের নিম্নাংশ বস্ত্রাবৃত; দেহের উপরের অংশ, এমনকি স্ত্রীলোকেরও, নগ্ন। শিল্প হইতে এই যে প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা চীনা বিবরণী দ্বারাও সম্পূর্ণ সমর্থিত হয়। সম্ভবতঃ কালক্রমে দেহের উপরের অংশ ঢাকিবার জন্য বস্ত্রের প্রচলন হইয়াছিল, কিন্তু বহুকাল পর্যন্ত শিল্পে ইহার কোন আভাষ পাওয়া যায় না। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বর্তমান কালেও (অন্ততঃ কিছুকাল পূর্বেও) বলি দ্বীপে স্ত্রীলোকেরা কোমরের উপরিভাগে কোনও বস্ত্রাবরণ ব্যবহার করিত না।

লম্বা ও খাটো এই দুই ধরণের বস্ত্র দেহের নিম্নাংশ আবরণের জন্য ব্যবহৃত হইত। দীর্ঘ বস্ত্র পাদমূল পর্যন্ত পৌঁছিত, কিন্তু খাটো বস্ত্র সাধারণতঃ হাঁটু পর্যন্ত, কখনও কখনও ইহারও অনেকটা উপরে থাকিত। স্ত্রীলোকের বেলায় দীর্ঘ ও পুরুষের বেলায় খাটো বস্ত্র পরিধানের রীতি প্রচলিত ছিল। উভয় ক্ষেত্রেই বস্ত্রগুলি কটিবন্ধ দ্বারা কোমরের কাছে আঁটা থাকিত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই কটিবন্ধগুলি মূল্যবান পাথরে খচিত হইত।

সাধু সন্ন্যাসী ও ভৃত্যেরা ভারতীয় পদ্ধতিতে ল্যাঙোট বা কৌপীন পরিত।

চাম-রা কেশচর্চায় বিশেষ যত্নবান ছিল। মূর্তিগুলিতে ইহাদের

নানা ধরণের কেশ রচনার নমুনা পাওয়া যায়। নানা ধরণের শিরস্ত্রাণও তাহারা ব্যবহার করিত। কেবলমাত্র উচ্চ-শ্রেণীর লোকেরা চামড়ার জুতা ব্যবহার করিত, সাধারণ লোক খালি পায়ে চলিত।

অলংকারের বহুল প্রচার ছিল এবং ইহা নানারকমের হইত। ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিল রকমারি আংটি, কর্ণভূষণ, হাতের বালা ও তাবিজ, গলার হার, কটিবন্ধ, পায়ের মল প্রভৃতি।

বিবাহের আদর্শ ও বিভিন্ন পদ্ধতি এবং স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সম্বন্ধ সমস্তই ভারতীয়দের অনুরূপ ছিল। 'সতী' প্রথাও প্রচলিত ছিল। ভারতে প্রচলিত বহু উৎসবের প্রচলন এখানেও হইয়াছিল। চাম-রা নৃত্য-গীত-প্রিয় জাতি ছিল এবং তাহাদের মৃতদেহ-সৎকার-ক্রিয়াও ভারতীয়দের মত ছিল। জলদস্যু বলিয়া চাম নাবিকদের অখ্যাতি ছিল; সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত শহর ও বন্দরগুলি অতর্কিতে আক্রমণ করা ছাড়াও যে সমস্ত জাহাজ তাহাদের দেশের উপকূলের কাছ দিয়া যাতায়াত করিত সেইগুলি তাহারা আটক করিয়া লুটপাট করিত। চীন হইতে আসিতে বা সেখানে যাইতে গেলে আনামের উপকূলের কাছ দিয়া যাইতে হইত এবং এই জাহাজগুলিই তাহাদের প্রধান শিকার ছিল। এক এক সময়ে ইহাদের উৎপাতে এই পথ পূর্বদেশের বণিকদের কাছে ভীতির স্থল হইয়া উঠিয়াছিল।

চাম রাজ্যে দাস শ্রেণীর উদ্ভব এই নীচ কার্যের একটি পরোক্ষ ফল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। চাম বণিকদের দ্বারা নিয়মিত দাস ব্যবসা পরিচালিত হইত এবং রাজ্যের জনসাধারণের মধ্যে ধনী ও সাধারণ শ্রেণীর লোক ছাড়া দাস শ্রেণীও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল।

২। সাহিত্য

চম্পায় ভারতীয় সাহিত্যের অনুশীলন যথেষ্ট পরিমাণে হইয়াছিল এবং সংস্কৃত সরকারী ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইত। চম্পায় এ পর্যন্ত শতাধিক সংস্কৃত ভাষায় রচিত লেখ পাওয়া গিয়াছে। ভারতে

প্রচলিত লিপি ও তাহা হইতে উদ্‌ভূত বর্ণমালায় এগুলি লিখিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে আনীত সংস্কৃত পুস্তকের অধ্যয়ন ছাড়াও এখানে সংস্কৃত ভাষায় নূতন পুস্তক রচিত হইয়াছিল এবং অন্ততঃ একটি ঐরূপ পুস্তকের নাম ও তাহার কিছু অংশের উদ্ধৃতি পাওয়া গিয়াছে।

সাহিত্য চর্চ্চার ক্ষেত্রে দেশের রাজারাই বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভদ্রবর্মন চতুর্বেদ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া জানা যায়। প্রথম জয় ইন্দ্রবর্মন দর্শনের ছয়টি শাখা ও বৌদ্ধ দর্শন, কাশিকা টীকা সহ পাণিনি ব্যাকরণ, এবং শৈব সম্প্রদায়ের আখ্যান ও উত্তরকল্প অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। চতুর্থ শ্রীজয় ইন্দ্রবর্মদেব ব্যাকরণ, জ্যোতিষ শাস্ত্র, মহাযান দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রে (বিশেষতঃ নারদীয় ও ভার্গবীয়) অভিজ্ঞ ছিলেন। সভাকবিদের বর্ণনা অনুযায়ী এই সব রাজাদের পাণ্ডিত্য যথার্থই এতটা ছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের এই সব বিভিন্ন শাখাগুলি যে চম্পায় অধীত হইত তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

এই সব ছাড়া অন্যান্য যে সব পুস্তকের প্রচলন সম্বন্ধে লেখগুলি হইতে জানা যায় তাহা—রামায়ণ ও মহাভারত, শৈব, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ, মনুস্মৃতি ও বিভিন্ন পুরাণ। লেখগুলির রচনাশৈলী হইতে অনুমান করা যায় যে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য, বিশেষতঃ কাব্য ও গদ্য উপাখ্যানগুলি সম্বন্ধে ইহাদের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল।

চীন দেশীয় লিউফাঙ্গ ৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে চম্পা রাজ্য জয় করার পরে যে সমস্ত জিনিস তাঁহার সহিত চীনে লইয়া যান, তাহাদের তালিকায় ১৩৫০ খানি বৌদ্ধ পুস্তকের উল্লেখ পাওয়া যায়; ইহা হইতে বুঝা যায় যে রাজ্যের প্রথম দিকেও এখানে সাহিত্য ক্ষেত্রের বিস্তৃতি নিতান্ত অল্প ছিল না।

৩। ধর্ম

ক। শৈব ধর্ম

হিন্দু ধর্মের প্রধান তিন দেবতার মধ্যে শিব চম্পায় সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। চম্পা রাজ্যের প্রধান দুই স্থানের অর্থাৎ মাইসোন ও পো নগরের মন্দিরগুলি শৈব সম্প্রদায়ের দেবতাদের উদ্দেশ্যে নির্মিত। ইহা ছাড়া চম্পা শহর ও চম্পা রাজ্যের ইষ্ট দেবতাও ছিলেন শিব।

বহু লেখতে শিব 'ত্রিমূর্তির মধ্যে প্রধান' ও 'দেবাদিদেব' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। 'শিবের সম্মুখে ইন্দ্র, ডাহিনে ব্রহ্মা, পশ্চাতে চন্দ্র ও সূর্য ও বামে নারায়ণ'—এইভাবে অবস্থিত সম্মিলিত দেবতাদের প্রতিকৃতি হইতেই শিবের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু কেবল শিবের ধারণা নহে, পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে শিব ও তাহার পরিবার ও অনুচরের মূর্তি এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রচলিত গল্পও খোদিত হইয়াছে। ভারতের প্রাচীন জনপ্রিয় দেবতা সুপরিচিত বিশেষ লক্ষণগুলি সহ এই বিদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

চম্পায় মনুষ্য মূর্তি ও লিঙ্গ, শিবের এই উভয় প্রতীকই দেখা যায়। ভারতের মত এখানেও মূর্তি অপেক্ষা লিঙ্গের প্রতীকই বেশি ছিল।

শিবের একটি প্রাচীনতম লিঙ্গ জাতীয় দেবতারূপে পরিগণিত হইয়াছিল এবং চম্পা রাজ্যের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ঐ আসনেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই লিঙ্গটি ভদ্রবর্মন দ্বারা চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে অথবা পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা ভদ্রেশ্বর নামে পরিচিত ছিল, কারণ এখানে প্রতিষ্ঠাতা রাজার নামের প্রথম অংশের শেষে 'ঈশ্বর' শব্দ যোগ করিয়া দেবতার নাম করণের প্রথা ছিল। ভদ্রেশ্বর বা ভদ্রেশ্বর স্বামী লিঙ্গটি মাইসোনে একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়। অল্পকালের মধ্যেই ইহা জাতীয় দেবালয়ে রূপান্তরিত হয় এবং এই মন্দিরটিকে কেন্দ্র করিয়া এখানে অনেকগুলি

সুন্দর সুন্দর মন্দির গড়িয়া উঠে। ৪৭৮ হইতে ৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে এই মন্দিরটি পুড়িয়া যায় কিন্তু শম্ভুবর্মন ইহার পুনঃ নির্মাণ করেন এবং ভদ্রবর্মন এই মন্দিরের উদ্দেশ্যে যে সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন, তাহাও অনুমোদন করেন। ভদ্রবর্মনের পন্থা অনুসরণ করিয়া শম্ভুবর্মনও নিজের নাম এই দেবতার নামের সঙ্গে যুক্ত করেন এবং ইহা শম্ভুভদ্রেশ্বর নামে পরিচিত হয়। পরবর্তী রাজগণ—যথা প্রকাশ-ধর্ম, দ্বিতীয় ইন্দ্রবর্মন প্রভৃতি, নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিয়া দেবাদিদেবের উদ্দেশ্যে মূল্যবান সম্পত্তি প্রভৃতি উৎসর্গ করেন ও তাঁহার স্তোত্র রচনা করেন। কালক্রমে এই লিঙ্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি অপ্রাকৃত কাহিনী প্রচলিত হয়। ৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত একটি লেখতে বলা হইয়াছে যে শিব নিজে ইহা ভৃগুকে দান করেন এবং উরোজ ভৃগুর নিকট হইতে ইহা লাভ করিয়া চম্পায় প্রতিষ্ঠিত করেন। বলা হইয়াছে যে দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শম্ভুভদ্রেশ্বরই পূজার উপযুক্ত একমাত্র দেবতা, ইনিই চম্পা রাজ্যের রক্ষাকর্তা ও তাঁহারই কৃপায় ও অনুগ্রহে এখানকার রাজারা পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত হইয়াছেন।

একাদশ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ হইতে শ্রীশান-ভদ্রেশ্বর জাতীয় দেবতার স্থান অধিকার করেন। প্রাচীন দেবতা শম্ভুভদ্রেশ্বর এই নূতন নামে পরিচিত হইয়াছিলেন ইহাই খুব সম্ভব বলিয়া মনে হয়। কারণ উরোজকেই শ্রীশান-ভদ্রেশ্বরেরও নির্মাতা বলা হইয়াছে। এই সময় হইতে রাজারা প্রত্যেকেই নিজেকে উরোজের অবতার বলিয়া মনে করিতেন এবং বগ্‌বন পর্বতে উরোজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীশান-ভদ্রেশ্বরের মন্দিরের সংস্কার সাধন বা ইহার উদ্দেশ্যে ধন-সম্পত্তি দান করিতেন। এই মন্দিরটি শত্রু দ্বারা, প্রধানতঃ কাম্বোজ-বাসী-দ্বারা, বহুবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কাজেই বহু রাজার আমলেই ইহার সংস্কার সাধন হয় এবং এখানে ধনসম্পত্তি দান করা হয়। অনেক সময় কাম্বোজ হইতে লুণ্ঠিত দ্রব্য দ্বারাই ইহার সংস্কার সাধন করা হইয়াছে।

চতুর্থ জয় ইন্দ্রবর্মন শ্রীশান-ভদ্রেশ্বরের মন্দিরটি রূপায় এবং মন্দিরের চূড়াগুলি সোনার পাতে ঢাকিয়া দেন। এই জন্য প্রায় এক মণ সোনা ও ৪৩৭ মণ রূপা ব্যবহার করা হয়।

যে শিবলিঙ্গ জাতীয় দেবতার আসন লাভ করিয়াছিল, তাহা ছাড়া অন্যান্য অনেক শিবলিঙ্গও পূজিত হইত। ইহাদের মধ্যে পো-নগরের শম্ভু-মুখলিঙ্গ উল্লেখযোগ্য। অষ্টম খ্রীষ্টাব্দের একটি লেখ হইতে জানা যায় যে এই মুখলিঙ্গটি বিচিত্রসগর নামে এক রাজা প্রতিষ্ঠিত করেন। দুইটি লেখতে এই ঘটনার তারিখ দিবারও প্রয়াস হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে দ্বাপর যুগের ৫৯১১ বৎসরে অর্থাৎ প্রায় ১,৭৮০,৫০০ বৎসর আগে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। কি উপায়ে যে এই তারিখ গণনা করা হইয়াছে তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়, কিন্তু এই বক্তব্যের প্রধান উদ্দেশ্য মন্দিরটির প্রাচীনতা প্রমাণ করা। ৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সমুদ্রপথে বর্বর জাতি আসিয়া এই লিঙ্গটি বিনষ্ট করে; কিন্তু সত্যবর্মন ইহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহা সত্যমুখলিঙ্গ নামে পরিচিত হয়। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দ পর্যন্ত এই লিঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু কোনও সময়েই ইহা শম্ভুভদ্রেশ্বর বা শ্রীশান-ভদ্রেশ্বরের ন্যায় জাতীয় দেবতার আসন লাভ করে নাই।

প্রাচীন আমলের লিঙ্গমূর্তিগুলি রক্ষার ব্যবস্থা ও ইহাদের উদ্দেশ্যে ধন সম্পত্তি দান করা ছাড়াও নূতন মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা চম্পার রাজাদের কর্তব্যের মধ্যে গণ্য হইত। নূতন মূর্তির প্রতিষ্ঠার সময় প্রতিষ্ঠাতার নাম ইহার সহিত সংযুক্ত করা হইত। এই প্রথা ভারতে প্রচলিত ছিল।

শিব মূর্তির সহিত অন্যান্য মূর্তিও সংশ্লিষ্ট ছিল। ইহাদের মধ্যে অবশ্য প্রধান ছিলেন শিবের শক্তি। ইনি এখানে উমা, গৌরী, ভগবতী, মহাভগবতী, দেবী ও মহাদেবী নামে পরিচিত। মাতৃলিঙ্গেশ্বরী ও ভূমিশ্বরী নামেও তিনি পরিচিতা ছিলেন। ইনি হিমালয়ের কন্যা ও শিবের অতুলনীয়া ও আদরিণী পত্নী।

দক্ষিণে অবস্থিত কৌঠার দেশে শক্তি পূজার প্রচলন অধিক ছিল। এখানে পো-নগরে দেবী য়পু নগর বা ভগবতী কৌঠারেশ্বরীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং চামদের নিকট ইহা শম্ভূভদ্রেশ্বর বা শ্রীশান-ভদ্রেশ্বরের মন্দিরের ন্যায় জাতীয় দেবালয়রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

শিব মূর্তির সংশ্লিষ্ট দ্বিতীয় দেবতা গণেশ বিনায়ক নামেও পরিচিত। গণেশের মূর্তি যে পরিমাণে চম্পায় দেখা যায় তাহাতে মনে হয় এক সময়ে তাঁহার জনপ্রিয়তা তাঁহার মাতা উমা দেবী হইতেও অধিক ছিল। সাধারণতঃ একটি বেদীর উপর আসীন স্থূলকায় হস্তীর মস্তকযুক্ত এই দেবতার মূর্তি দেখা যায়।

শৈব সম্প্রদায়ের তৃতীয় মূর্তি কার্তিক বা কুমার চম্পায় যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এ যাবৎ এই দেবতার চার বা পাঁচটি মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে দুইটিতে তাঁহার পরিচিত বাহন ময়ূরকে দেখা যায়। অন্য দুইটিতে তাঁহার বাহনরূপে গণ্ডার দেখা যায়। কার্তিকের এইরূপ বাহন ভারতে প্রচলিত ছিল না, কিন্তু কাম্বোজে উহা যথেষ্ট দেখা যায়।

সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য শিব ও উমার বাহন নন্দী। পৃথক ভাবে নন্দীর মূর্তি বহু মন্দিরের দরদালানে অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই মূর্তিগুলি একটি কুব্জপৃষ্ঠ বৃষের এবং ইহা অর্ধশয়ান অবস্থায় মন্দির মধ্যে অবস্থিত দেবতার দিকে চাহিয়া আছে।

খ। বৈষ্ণব ধর্ম

শৈব মতবাদের মত অতটা না হইলেও বৈষ্ণব মতবাদও চম্পায় যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। পুরুষোত্তম, নারায়ণ, হরি, গোবিন্দ ও মাধব প্রভৃতি বিষ্ণুর বহুবিধ নাম এখানে প্রচলিত ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের মত এখানেও বিষ্ণু অপেক্ষা তাঁহার অবতারদের পূজাই অধিক পরিমাণে প্রচলিত ছিল। তাঁহাদের মধ্যে দুই জন—

রাম ও কৃষ্ণের উল্লেখ বারে বারেই পাওয়া যায়। বিষ্ণু তাঁহার সত্তা চারজন রাম অর্থাৎ রাম ও তাঁহার তিন অনুজের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া বলা হইয়াছে। কৃষ্ণ-অবতার রূপে বিষ্ণু যে সব বীরত্বের কাজ করিয়াছিলেন তাহাদের যথেষ্ট প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। তিনি গিরি গোবর্ধনকে শূন্যে উঠাইয়াছিলেন এবং কংশ, কেশী, চানূর, অরিষ্ট ও প্রলম্ব প্রভৃতিকে হত্যা করিয়াছিলেন।

চম্পার রাজারা নিজেদের বিষ্ণুর সহির সহিত তুলনা করিতেন ও কখনও কখনও বিষ্ণুর অবতার বলিয়া মনে করিতেন। জয় রুদ্রবর্মন বিষ্ণুর অবতার বলিয়া গণ্য ছিলেন ও তাঁহার পুত্র জয় হরিবর্মদেব শিবনন্দন নিজেকে বিষ্ণুর এমন এক বিশিষ্ট অবতার বলিয়া মনে করিতেন, যাঁহার খ্যাতি রাম ও কৃষ্ণকে ছাড়াইয়া চতুর্দিকে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

যে সব বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া যায় সেগুলি চারিহস্ত বিশিষ্ট। এই মূর্তিগুলি কখনও গরুড়ের পৃষ্ঠে আসীন, আবার কখনও অনন্ত দুগ্ধ-সাগরে নাগরাজ বাসুকির দেহের উপর শয়ান অবস্থায় দেখা যায়। বাসুকির সহস্র ফণা তাঁহার মস্তকোপরি খোলা রহিয়াছে এবং লক্ষ্মী তাঁহার পদসেবা করিতেছেন।

বিষ্ণুর শক্তি লক্ষ্মী, পদ্মা এবং শ্রী নামে চম্পায় পরিচিতা ছিলেন এবং লেখগুলিতে প্রায়ই তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

শিবের বাহন নন্দীর ন্যায় বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের মূর্তিও চম্পায় সুপরিচিত ছিল।

গ। ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতাগণ

হিন্দু ত্রিমূর্তির অন্যতম দেবতা ব্রহ্মা অনেক লেখতে সৃষ্টিকর্তা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, কিন্তু চম্পায় তাঁহার বিশেষ প্রাধান্য ছিল বলিয়া মনে হয় না।

ব্রহ্মা মূর্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁহার চারিটি মুখ—অবশ্য বেশির

ভাগ ক্ষেত্রেই তিনটি মুখ দৃষ্টিগোচর হয়—এবং তাঁহার বাহন হংস। সাধারণতঃ জপমালা ও পদ্মবৃন্ত তাঁহার হাতে দেখা যায়।

যদিও ত্রিমূর্তি অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন ও জনসাধারণের পূজ্য ছিলেন, তথাপি হিন্দুধর্মের অন্যান্য দেবতারা একেবারে বিস্মৃত হন নাই। ইঁহাদের মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্র, যম, চন্দ্র, সূর্য, কুবের ও সরস্বতী প্রধান।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিবরণী সম্পূর্ণ করিতে গেলে চম্পায় প্রচলিত ধর্ম চিন্তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া আবশ্যক। প্রথমতঃ শিব, বিষ্ণু প্রভৃতির মূর্তির সঙ্গে সঙ্গে নিরাকার নির্গুণ অদ্বৈত ব্রহ্মের ধারণাও ছিল। শুধুমাত্র 'ব্রহ্ম' রূপে ভগবানের উল্লেখ একটি লেখতে পাওয়া যায়। বলা হইয়াছে যে তিনিই সৃষ্টিকর্তা ও তাঁহাকে ধারণা করা মানুষের শক্তির অতীত।

দ্বিতীয়তঃ যজ্ঞের উপর আস্থা। বারে বারেই ইহার গুণকীর্তন করা হইয়াছে।

হিন্দুধর্মের নৈরাশ্যবাদ চামদের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বহু লেখতে দেখা যায় যে রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ধনদৌলত ও পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অসারতা উপলব্ধি করিয়া ও দেহকে জলের উপর ভাসমান ফেনার মতই ক্ষণস্থায়ী মনে করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও মোক্ষ লাভ অর্থাৎ শিবলোক প্রাপ্তির আশায় নানারূপ পুণ্যকার্যে লিপ্ত ছিলেন।

ঘ। বৌদ্ধ ধর্ম

বুদ্ধের জিন, লোকনাথ, লোকেশ্বর, সুগত, শাক্যমুনি, অমিতাভ, বজ্রপাণি, বৈরোচন, ও প্রমুদিত-লোকেশ্বর ইত্যাদি নাম এখানে প্রচলিত ছিল। ৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়ী চীনা সেনাপতি চম্পা হইতে ১৩৫০ খানি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ লইয়া যায়, ইহা হইতেই প্রমাণ হয় যে বৌদ্ধধর্ম এখানে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল।

দেশের রাজাদের বৌদ্ধধর্ম আকৃষ্ট করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়,

এবং রাজাগণ ও সাধারণ লোক সমভাবেই বুদ্ধমূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এখানে বৌদ্ধশ্রমণ সম্প্রদায় যথেষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল এবং রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তাহাদের জন্য আশ্রম নির্মাণের উল্লেখ আছে।

শ্রীজয় ইন্দ্রবর্মন—যিনি লক্ষ্মীন্দ্র গ্রামস্বামী নামেও পরিচিত ছিলেন—৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে একটি লোকেশ্বর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহার নাম অনুসারে এই মূর্তিটি লক্ষ্মীন্দ্র-লোকেশ্বর নামে পরিচিত ছিল। ভিক্ষুসংঘ যাহাতে সকল প্রকার সুবিধা পাইতে পারে সেইজন্য তিনি একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং এখানে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সকল রকম জিনিসের বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

ডুঙ্গ ডুওঙ্গ নামক স্থানে বৌদ্ধ ধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল বলিয়া মনে হয়। এখানে বৌদ্ধ মন্দিরের যে ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার আয়তন চম্পার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের মন্দির হইতেও অনেক বড় ছিল। এই ধ্বংসের মধ্যে বহু বুদ্ধমূর্তিও পাওয়া গিয়াছে। ডুঙ্গ ডুওঙ্গে প্রাপ্ত একটি বুদ্ধমূর্তির উচ্চতা প্রায় পাঁচ ফিট। এখানে ব্রোঞ্জের তৈয়ারি বুদ্ধের একটি সুন্দর দণ্ডায়মান মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে। চম্পায় এপর্যন্ত যতগুলি বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে এইটির গঠনশৈলী সর্বাপেক্ষা সুন্দর বলিয়া মনে হয়।

প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত চম্পার ধর্মজীবনে যে প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য হয় তাহা ইহার উদার সহিষ্ণুতাগুণ। সাম্প্রদায়িকতা এখানেও ছিল এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায় ও দুই তিনটি প্রধান ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় এখানে একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু ধর্ম বিষয়ে ইহাদের মধ্যে কোনওরূপ বিবাদ ছিল বলিয়া জানা যায় না। অপরপক্ষে সকল ধর্ম সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও উদার মনোভাব পোষণ করা হইত বলিয়াই জানা যায়। রাজাদের ব্যবহার হইতেও সর্বধর্মসমন্বয় নীতির

পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকাশধর্ম একই সময়ে শিবলিঙ্গ ও বিষ্ণু-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইন্দ্রবর্মনও শৈব ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি সমান অনুরক্ত ছিলেন। এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। জনসাধারণও এই বিষয়ে দেশের রাজাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিত। এই ব্যাপারে ভারতীয় ঔপনিবেশকরা তাহাদের মাতৃভূমির প্রথা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল।

৪। শিল্প

কাম্বোজ ও জাভার মত সুন্দর বা বিশাল সৌধ চম্পায় ছিল না। এখানকার সৌধগুলি সাধারণতঃ ইট দ্বারা নির্মিত ছিল এবং বেশির ভাগের অস্তিত্বই এখন নাই। কিন্তু যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা হইতে এখানকার শিল্পীদের কলাজ্ঞান ও গঠন নৈপুণ্য যে যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল তাহা বুঝা যায়। ভারতবর্ষের মত চম্পাতেও ধর্ম সম্বন্ধীয় ব্যাপারেই শিল্প নিয়োজিত হইত এবং জনসাধারণ তাহাদের সমস্ত নৈপুণ্য ও সংগতি ধর্ম-সৌধ ও দেবদেবীগণের মূর্তির উদ্দেশেই উজাড় করিয়া দিয়াছে।

খুঁটিনাটি বিষয়ে যথেষ্ট প্রভেদ থাকিলেও চম্পার মন্দিরগুলির পরিকল্পনায় একটি বিশেষ আদর্শ অনুসরণ করা হইয়াছে। সাধারণতঃ এইগুলি ইট দিয়া নির্মিত ও উচ্চস্থানে অবস্থিত। ইহার গর্ভগৃহ কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। সাধারণতঃ ইহা পূর্বমুখী ও মাঝে মাঝে ইহার সম্মুখে ইহারই অনুরূপ আর একটি গৃহ পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত দেখা যায় ও ইহা নাটমন্দির রূপে ব্যবহৃত হইত। কখনও কখনও প্রধান মন্দিরের সহিত একই সারিতে, এবং ইহার উত্তর দক্ষিণে আরও দুইটি মন্দির দেখা যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এইগুলি প্রধান মন্দির নির্মানের অনেক পরে সংযুক্ত হইয়াছিল। কদাচিৎ এই প্রধান মন্দির সমষ্টিকে কেন্দ্র করিয়া আরও অনেক মন্দির নির্মিত হইত। অনেক সময়ে এগুলি আয়তনে অত্যন্ত ছোট ও বাহিরের প্রাচীরের গায়ে সংলগ্ন থাকিত।

এই সমস্ত সৌধগুলি একটি প্রাচীর দিয়া ঘেরা থাকিত এবং প্রাচীরের পূর্বদিকে গোপুরমের ন্যায় এই পুণ্যক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য সৌধাকৃতি একটি মাত্র দ্বার থাকিত। প্রধান মন্দিরের গঠন অনুযায়ী এই সৌধদ্বার তৈয়ারি হইত এবং বিপরীত দিকে অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিমে অবস্থিত দুইটি দরজায় উঠিবার জন্য দুইটি সোপান শ্রেণী থাকিত। ইহা পার হইলে প্রায়ই একটি বড় হল ঘর দেখা যাইত। ইহার টাইলের ছাদ খুব পাতলা দেওয়াল বা কেবলমাত্র স্তম্ভশ্রেণীর উপর নির্মিত হইত।

গর্ভগৃহের অভ্যন্তরভাগ একটি চতুষ্কোণ কক্ষ। ইহার খাড়া দেওয়ালগুলি অলংকার বর্জিত কিন্তু পালিশ করা। ইহার শূন্যগর্ভ (vault) মোচার আকৃতি (conical) ছাদের প্রতিটি বৃত্তাকার ধাপ ক্রমশঃ আয়তনে ছোট হইয়া চূড়ার আকার ধারণ করিয়াছে।

গর্ভগৃহের সম্মুখে একটি খিলানযুক্ত যাতায়াতের ঢাকা পথ ও পথের সম্মুখে কারুকার্য খচিত দরজা অবস্থিত। দরজার সমস্ত অংশ পাথর দিয়া তৈয়ারি হইত। দরজার মাথার দিকে নানারূপ ভাস্কর্যের নিদর্শন থাকিত। অনেক সময় এইগুলি অতি উৎকৃষ্ট ধরণের হইত।

বাহিরের দিক হইতে মন্দিরগুলি শিখরযুক্ত চতুষ্কোণ বৃহৎ কক্ষের মত দেখাইত। এই শিখরগুলির তিনটি বিভিন্ন ধরনের গঠন দেখা যায়। সাধারণতঃ চারধাপ বিশিষ্ট ছাদ—প্রত্যেকটি নিচেরটি হইতে ক্রমশঃ আয়তনে ছোট হইয়া গিয়াছে এবং সর্বশেষ ধাপের মাথায় পিরামিডের আকৃতি-সম্পন্ন প্রস্তরখণ্ড অবস্থিত। দ্বিতীয় ধরনেরগুলি দুইধাপ বিশিষ্ট ও উপরের ধাপটি দীর্ঘাকৃতি ও খিলানযুক্ত গৃহের ন্যায় নির্মিত। তৃতীয় ধরনের শিখর মন্দিরের দেওয়ালের ঠিক উপরে এবং ইহার আকৃতি উড়িষ্যার মন্দিরের শিখরের ন্যায়।

চম্পার মন্দিরগুলি ইটের তৈয়ারি হইলেও দৃঢ়তা বা শোভা

বর্ধনের জন্য প্রস্তরখণ্ড ব্যবহার করা হইত। দরজা ও ইহার বিভিন্ন অংশের জন্য প্রায়ই পাথর ব্যবহার করা হইত।

মাইসোন, ডুঙ্গ ডুওঙ্গ ও পোনগর এই তিন জায়গায় একসঙ্গে অনেকগুলি মন্দির অবস্থিত ছিল। এইগুলির মধ্যে ডুঙ্গ ডুওঙ্গের মন্দিরগুলি বৌদ্ধ ও অপর দুই স্থানের মন্দিরগুলি শৈব।

টুরাণ (Touranne) হইতে একুশ মাইল দক্ষিণ-দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত একটি উপত্যকায় মাইসোনের মন্দিরগুলি অবস্থিত। এই উপত্যকাটি প্রায় গোলাকৃতি এবং এক পর্বতশ্রেণী হইতে অপর পর্বতশ্রেণীর ব্যবধান প্রায় এক মাইলের মত। উত্তর দিক হইতে এখানে প্রবেশের একমাত্র পথ অবস্থিত এবং এইখানে একটি ছোট নদী প্রবাহিত। মাইসোনের মন্দির সংখ্যা প্রায় ত্রিশটি ও ইহা ছাড়া বড় বড় হলঘর, প্রবেশপথে অবস্থিত সৌধ ও অন্যান্য গৃহাদিও আছে।

মাইসোনের বারো মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ডুঙ্গ ডুওঙ্গের মন্দিরগুলির ভগ্নাবশেষ ৩২৮ গজ লম্বা ও ১৬৫ গজ চওড়া স্থান জুড়িয়া অবস্থিত। একটি নিচু ইটের দেওয়াল দিয়া এই স্থানটি ঘেরা, খালি পূর্বদিকে প্রবেশ পথের জন্য একটু জায়গা খোলা। লম্বালম্বি ভাবে তিনটি অপ্রশস্ত ভাগে এই স্থানটি বিভক্ত। এইগুলি পূর্ব হইতে পশ্চিমে বিস্তৃত ও ইহাদের আয়তনে সামান্য তারতম্য আছে। মধ্যভাগের পশ্চিম প্রান্তে প্রধান মন্দিরটি অবস্থিত ও প্রধান মন্দিরটি যে উচ্চ-স্থানের উপর অবস্থিত সেই একই উচ্চভূমিতে ইহার চারিদিকে আরও চারিটি মন্দির নির্মিত হইয়াছে। ইহার সম্মুখে একটি বৃহৎ সৌধ অবস্থিত, ইহার চারিকোণে চারিটি অর্ধ-গোলাকৃতি কক্ষ আছে। ইহা ছাড়া আরও দুইটি মন্দির ও দুই সারি আবাসগৃহ আছে। এই সমস্ত মন্দির ও গৃহগুলি ঘিরিয়া দেওয়াল নির্মিত হইয়াছে ও ইহাদ্বারা প্রথম আঙিনা সৃষ্টি হইয়াছে। এই দেওয়ালের ধারে ধারে আঙিনার

মধ্যে সাতটি ছোট ছোট মন্দির। তাহার পরে আরও দুইটি আঙিনা ও ইহাদের মধ্যে হলঘর ও ছোট ছোট ঘর ইত্যাদি অবস্থিত।

খান-হোয়া (Khanh Hoa) জেলার না-ট্রাং (Nha Trang) এর নিকটে পো নগরের মন্দিরগুলি অবস্থিত। এইগুলি সংখ্যায় ছয়টি, একটি ছোট পাহাড়ের মাথায় উত্তর হইতে দক্ষিণে, দুই সারিতে অবস্থিত। সমস্ত মন্দিরগুলি একটি দেওয়াল দিয়ে ঘেরা।

ভাস্কর্যশিল্পও চম্পায় যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। রাজ্যের নানা স্থান হইতে আবিষ্কৃত দেবদেবীর মূর্তিগুলি ইহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। অনেক স্থানে মন্দিরের খোদাই কাজগুলির শিল্প খুব উন্নত ধরনের।

ফুল লতাপাতা খোদাই-এর কার্যে চাম শিল্পীরা সর্বাধিক দক্ষতার পরিচয় দিয়াছে। যদিও লতাপাতাগুলি অনেকটা চিরাচরিত আদর্শ অনুযায়ী, এবং ঠিক স্বাভাবিক হয় নাই তথাপি ইহার সম্পাদনায় যে কমনীয়তা ও সৌন্দর্যের প্রকাশ পাইয়াছে তাহা যথার্থই মনোহর। শিল্পরীতি সম্পূর্ণ ভারতীয়। বেশির ভাগ ফুলপাতার নকশা গোলাকৃতি মালার (Scroll) ন্যায় এবং ছোট ও বড় স্তম্ভগুলির উপর খোদিত। এই মালাগুলি ভারতীয় রীতিতে গভীর করিয়া পরিষ্কার ভাবে সাবধানে খোদিত হইয়াছে।

এই অধ্যায় শেষ করিবার আগে চম্পায় যে বিশেষ ধরনের স্থাপত্য-শিল্প প্রচলিত ছিল তাহার উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। চাম মন্দিরগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহাদের বহু ধাপে বিভক্ত ছাদ,— প্রত্যেকটি ধাপ নীচেরটি হইতে ক্রমশঃ সংকুচিত হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহাদের প্রত্যেকটি মূল মন্দিরটির পরিকল্পনার অনুরূপ। এই বৈশিষ্ট্য দ্রাবিড় রীতিতে পরিলক্ষিত হয় এবং ইহা সপ্তম খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত মামল্লপুরের রথগুলিতে ও কঞ্জিভরম ও বাদামির মন্দিরগুলিতে দেখা যায়। ধর্মরাজ ও অর্জুন রথের সহিত চম্পার সাধারণ মন্দির-গুলির তুলনা করিলে ইহাদের শিখরগুলির মধ্যে সাদৃশ্য সকলেই লক্ষ্য করিবে। আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে ধর্মরাজ রথ একটি

শিব মন্দির এবং ঐ দেশের রাজার নাম অনুসারে অত্যন্তকাম পল্লবেশ্বর নামে পরিচিত ছিল, এবং মাইসোনের মন্দির শম্ভু ভদ্রেশ্বরেরও ইহার প্রতিষ্ঠাতার নামে নামকরণ হইয়াছিল। আবার চম্পার কতকগুলি মন্দিরের ছাদ দীর্ঘাকৃতি কিন্তু বক্ররেখায় (Curved) গঠিত। মামল্লপুরের গণেশ ও সহদেব রথেও ঐরূপ দেখা যায়। চম্পার মন্দিরের আর এক ধরনের শিখরগুলি, অর্থাৎ যেগুলি বাঁকানো (Curved), সেইগুলির সহিত দ্রৌপদী রথের খুব মিল আছে; সম্ভবতঃ ইহা উত্তর ভারতের শিল্পধারা হইতে উদ্ভূত। চম্পার মন্দির-গুলির ভিতের (basement) সহিত কঞ্জিভরম ও বাদামির মন্দির-গুলির ভিতের সাদৃশ্য আছে। সমস্ত মিলাইয়া চম্পার ও প্রথম দিককার দ্রাবিড় শিল্পধারার মধ্যে যে সাদৃশ্য আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না এবং এই দুইটি প্রায় একই সময়ে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের লোকেরা সুদূর প্রাচ্যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল ও চম্পার সভ্যতার উপর ভারতীয় সভ্যতা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল একথা যেমন সত্য, তেমনই চম্পার মন্দির নির্মাণ পদ্ধতি ভারতবর্ষের বাদামি, কঞ্জিভরম ও মামল্লপুরের মন্দিরগুলির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করার কোন কারণ নাই। বিশেষতঃ ভারতের এই স্থানগুলি চম্পার সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী। ইহা খুবই সত্য যে চাম শিল্পীরা ভারতীয় রীতির অন্ধ অনুকরণ করিয়া যায় নাই, তাহাদের নিজস্ব ও নূতন উপাদান ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে। কিন্তু এইগুলির মুল উপাদান যে ভারতীয় ধারা হইতে গৃহীত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই।

চতুর্থ ভাগ

কম্বুজ

প্রথম অধ্যায়

সর্বপ্রথম হিন্দু সাম্রাজ্য—ফুনান

কম্বুজ বা কাম্বোজ হইতে আধুনিক কাম্বোডিয়া নামের উৎপত্তি। প্রাচীন কাম্বোজ রাজ্য এখনকার কাম্বোডিয়া রাজ্য ও কোচিন চীন লইয়া বিস্তৃত ছিল। মেকং নদীর উপত্যকা এবং পশ্চিমে কাম্পোট (Kampot) ও পূর্বে স্‌ভয় রিয়েং (Svay Rieng) ও থ্বং খমুন (Thbong Khmum) এই তিনটি প্রদেশ এই রাজ্যের অন্তর্গত। শেষোক্ত প্রদেশ দুইটিতে বৈকস্ (Vaicos) নদীর দুইটি শাখা প্রবাহিত ছিল এবং বিস্তৃত জলাভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত অসংখ্য স্বাভাবিক ও কৃত্রিম খাল দ্বারা এই শাখানদী দুইটি মেকং নদীর সহিত যুক্ত হইয়াছিল। এইজন্য ইহাদের মেকং-এর উপনদীও বলা যায় এবং এইসবগুলি হইতে ইন্দোচীনের ব-দ্বীপের উৎপত্তি।

সাধারণতঃ মনে করা হয় নদীর 'মেকং' নামটি 'মা গঙ্গা' হইতে উদ্ভূত। এই ধারণার বশবর্তী না হইয়াও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে উত্তর ভারতের প্রথম যুগের ইতিহাস ও সভ্যতা যেমন গঙ্গা নদীর দ্বারা প্রভাবান্বিত, কাম্বোজ দেশের ইতিহাসেও এই নদীটি সেইরকম একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল।

ইজিপ্টের যেমন নীল নদ, কাম্বোডিয়াতে সেইরূপ মেকং নদী এই দেশকে জীবনীশক্তি দান করিয়াছে। ইহার দুই তীর যেমন জনসাধারণের বাসোপযোগী ভূমির সংস্থান করিয়াছে তেমনি ইহার বাৎসরিক প্লাবন জমিকে উর্বরা করিয়াছে। যে স্থান অবধি বন্যার জল পৌঁছায় তাহার পর হইতে দেশের অবস্থা শুষ্ক মরুভূমির মত।

যে স্থানে মেকং নদী কাম্বোডিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে সেইস্থান হইতে ইহার বিস্তৃতি শুরু হইয়াছে। যে সমস্ত জলাভূমি ইহার পার্শ্বে অবস্থিত সেগুলি বেশির ভাগই ঐ নদীর পরিত্যক্ত গতিপথ, এবং বর্তমান নদীটি ইহার পাশাপাশি প্রবাহিত থাকায় নদীগর্ভের প্রসার প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। ইহার শাখা প্রশাখা দ্বারা সমস্ত দেশ আচ্ছন্ন এবং প্‌নোম পেন (Pnom Penh) এর কাছে একটি বিস্তৃত জলাভূমি এই নদীকে প্‌নোম পেন-এর ৬২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত বৃহৎ হ্রদ টনলে সাপের সহিত যুক্ত করিয়াছে। এই সংযোগ স্থান হইতে নদীটি দুই অংশে প্রবাহিত, কিন্তু অসংখ্য খাল দুইটির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত উভয়েই চীন সাগরে মিলিত হইয়াছে ও এইরূপে কোচিন চীনের উর্বরা ব-দ্বীপের জন্ম হইয়াছে। এই খালগুলির মধ্যবর্তী ভূমি দ্বীপে পরিণত হইয়াছে।

জুন মাসের প্রখর সূর্যরশ্মিতে তিব্বত মালভূমির বরফ গলিয়া জলধারা ছোট ছোট পাহাড়ী নদী দিয়া প্রবাহিত হইয়া মেকংএ পৌঁছায় ও শাখা প্রশাখা সহ মেকং দ্রুত স্ফীত হইয়া দুই তীর প্লাবিত করে। 'উচ্চ ভূমি'তে অবস্থিত বনাঞ্চল পর্যন্ত সমস্ত ভূমি জলের নিচে তলাইয়া যায়। অক্টোবর মাস পর্যন্ত এই অবস্থায় থাকিবার পর জল সরিয়া যায় ও ভূমি কৃষিযোগ্য হয়।

যে নিচু ভূমি প্রতি বৎসর মেকং নদী দ্বারা প্লাবিত হয় সেইখানেই বর্তমান কালে কাম্বোডিয়ার জনবসতি প্রধানতঃ অবস্থিত। প্‌নোম পেন (Pnom Penh) এর উত্তর অঞ্চলে মেকং ও তাহার শাখা-নদীগুলির তীরে বা উচ্চ ভূমির প্রান্তদেশে লোকে বাস করে। বর্ষার পূর্বে নিচু ভূমিতে চাষকর্মের জন্য আসে এবং ফসল কাটা শেষ হইলেই প্লাবনের আগেই উচ্চ ভূমিতে ফিরিয়া যায়।

প্‌নোম পেন-এর দক্ষিণ অঞ্চলে লোক বসতি শুধুমাত্র নদীর তীরেই পর্যবসিত নহে। উচ্চ ভূমির যেখানে যেখানে কৃষিযোগ্য সেখানেও লোকজন বাস করে। এখানে তাল গাছ (Palm) প্রচুর

পরিমাণে দেখা যায় ; কোনও উচ্চ স্থান হইতে এই অঞ্চল দেখিলে একটি বিস্তৃত তাল গাছের বন বলিয়া মনে হয় ; মধ্যে মধ্যে খালি ধানক্ষেত বা জলাভূমি। নিচু ভূমির উত্তরে ও পশ্চিমের যে সব অঞ্চলে প্লাবনের জল পৌঁছায় না তাহাকে উচ্চ ভূমি এই সংজ্ঞা দেওয়া যায় এবং ইহা উত্তরে ডাংরেক পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলের নিচু অংশ কর্দমাক্ত জলাভূমি ও ঘন দীর্ঘ ঘাস দ্বারা আচ্ছাদিত। অপেক্ষাকৃত উচ্চ জায়গাগুলি লাল কাঁকর বা বেলে পাথরে আচ্ছন্ন, এবং এখানে সীমাহীন বন ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে না। এই সমস্ত অঞ্চলটি এখন জনমানবহীন, খালি বন্যজন্তুদিগের বিচরণ স্থলে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই অঞ্চলের দক্ষিণ অংশ অঙ্কোর নামে অভিহিত ছিল এবং এখানে হিন্দুরা যে প্রকাণ্ড নগর ও অপূর্ব সৌধসমূহ নির্মাণ করিয়াছিল, তাহা এখনও পৃথিবীর বিস্ময় উদ্রেক করিতেছে। হিন্দু ঔপনিবেশকরা প্রকৃতির সহিত যুঝিয়া এই স্থানকে সমৃদ্ধিশালী সভ্যতার কেন্দ্রে রূপান্তরিত করিয়াছিল। যখন সেই যুগ বিলুপ্ত হইল তখন আবার প্রকৃতির জয় হইল এবং সমস্ত অঞ্চলটি আদিম কালের রূপ ধারণ করিল।

ইন্দোচীনের অন্যান্য স্থানের ন্যায় কাম্বোডিয়ায় ভারতীয় উপ-নিবেশের প্রথম দিককার ঘটনাবলীর বিবরণ জানিবার কোনও উপায় নাই ; কেবল স্থানীয় গাথা ও কিংবদন্তীতে ইহার আভাষ পাওয়া যায়। এই সমস্ত কিংবদন্তী ও গাথাগুলি ঐতিহাসিক সত্য না হইলেও এইগুলি হইতে এই স্থানে হিন্দু সভ্যতার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সর্বসাধারণের ধারণা ও হিন্দু উপনিবেশের ধারা সম্বন্ধে মোটামুটি আভাষ পাওয়া যায়।

কাম্বোডিয়ার সর্বপ্রথম যে রাজ্যের কথা জানা যায় চীনারা তাহাকে ফুনান এই নামেই অভিহিত করিয়াছে। ইহা মোটামুটি ভাবে কাম্বোডিয়া ও কোচিন চীন লইয়া গঠিত ছিল। তৃতীয় শতকে কাংতাই নামে একজন চীনা ফুনান সম্বন্ধে প্রচলিত যে গল্পটি লিপিবদ্ধ করে, তাহা নিম্নরূপ :—

"প্রথমে ফুনানের শাসক ছিল লিউ-য়ি নামে একজন স্ত্রীলোক। হো-ফু-তে হিউয়েন-চেন নামে এক ব্যক্তি ছিল। সে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এক দেবতার একনিষ্ঠ উপাসক ছিল এবং তাহার ধর্মানুরাগে দেবতা তাহার উপর সন্তুষ্ট হইলেন। ঐ ব্যক্তি একদিন স্বপ্নে দেখিল যে দেবতা তাহাকে একটি দৈবশক্তিসম্পন্ন ধনুক দিয়া বাণিজ্যপোতে সমুদ্রযাত্রার নির্দেশ দিলেন। সকালবেলা দেবতার মন্দিরে গিয়া সে একটি ধনুক পাইল। তখন সে একটি বাণিজ্যপোতে যাত্রা করিল, এবং দেবতা হাওয়ার গতি এমন ভাবে পরিচালিত করিলেন যে সে ফুনানে আসিয়া উপস্থিত হইল। লিউ-য়ি একটি নৌকায় করিয়া এই পোতটি লুঠ করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইল। হিউয়েন-চেন তাহার ধনুক হইতে একটি তীর নিক্ষেপ করিয়া রাণীর নৌকাটি এক ধার হইতে আর এক ধার পর্যন্ত বিদ্ধ করিল। রাণী ভীত হইয়া তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করিল। এই সময় হইতে হিউয়েন-চেন এই দেশ শাসন করিতে লাগিল।"

পরবর্তী কালের চীনা পুস্তকে এই একই গল্পের পুনরাবৃত্তি দেখা যায়, তবে সময়ে সময়ে ইহা আরও বিস্তারিত—যথা হিউয়েন-চেন-এর সহিত লিউ-য়ির বিবাহ প্রভৃতি। রাজা ও রাণীর নাম নানা ভাবে লিখিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে হুয়েন-টিয়েন (Huen-tien) ও লিউ-য়ি (Lieu-ye) সংগত মনে করা হয়। হুয়েন-টিয়েন ও অন্যান্য নামগুলি ভারতীয় কৌণ্ডিন্য নামের অপভ্রংশ। লিউ-য়ি শব্দের অর্থ সম্ভবতঃ 'উইলো গাছের পাতা'। ভারতে মহীশূর অঞ্চলে দ্বিতীয় খ্রীষ্টীয় শতকে উৎকীর্ণ লিপিতে কৌণ্ডিন্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে।

চীনা বিবরণ অনুযায়ী ফুনানের আদিম অধিবাসীদের প্রায় অসভ্য জাতি বলা যায়। তাহারা নগ্ন অবস্থায় থাকিত এবং সমস্ত দেহ উলকি দিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিত। ব্রাহ্মণ্য ধর্মানুরাগী হিউয়েন-টিয়েন ইহাদের মধ্যে সভ্যতার প্রচার করিল, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের বস্ত্র ব্যবহার করিতে বাধ্য করিল।

হিউয়েন-টিয়েন নামে এই ব্যক্তি খুব সম্ভব ভারত হইতে আগত একজন ঔপনিবেশিক, তবে মালয় উপদ্বীপ বা মালয় দ্বীপপুঞ্জের কোনও স্থানের হিন্দু ঔপনিবেশিক হওয়াও একেবারে অসম্ভব নহে। ইহার আগমনের পরবর্তীকালের ঘটনাসমূহের বিবরণী হইতে ইহার আগমন-কাল প্রথম খ্রীষ্টীয় শতকের পরে বলিয়া মনে হয় না। হিউয়েন-টিয়েনের রাজ্যকালের কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না, কিন্তু তাহার পুত্রের ব্যয় নির্বাহের জন্য সাতটি শহরের রাজস্ব নির্ধারিত ছিল বলিয়া জানা যায়। তাহার বংশধরেরা প্রায় একশত বৎসর রাজ্য শাসন করে। ইহাদের মধ্যে সর্বশেষ পান-পান রাজকার্যের ভার তাহার সেনাপতি ফান-মান বা ফান-চে-মানের উপর অর্পণ করে। তিন বৎসর রাজত্ব করার পর রাজার মৃত্যু হইলে জনসাধারণ ফান-চে-মানকে রাজা নির্বাচিত করে (আনুঃ ২০০ খ্রী)।

ফান-চে-মান একজন ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন এবং ফুনান রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি করেন। তিনি একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করেন ও প্রায় দশটি রাজ্য জয় করেন। পাঁচ কি ছয় হাজার 'লি'র মধ্যে অবস্থিত সমস্ত রাজ্যগুলির উপর তাঁহার প্রভুত্ব হয় ও এই রাজ্যগুলি এই সময় হইতে ফুনানের অধীন রাজ্যে পরিণত হয়। যদিও চীনা বিবরণী হইতে এই সব অধীন রাজ্যগুলির যে নাম পাওয়া যায় তাহাদের অবস্থান সম্পূর্ণ সন্তোষজনকরূপে নির্ধারিত করা সম্ভব হয় নাই, তথাপি মোটের উপর এই ধারণা হয় যে সমস্ত শ্যামদেশ এবং লাওস ও মালয় উপদ্বীপের কিছু অংশ ফুনানের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিল; সুতরাং ফুনানই ইন্দোচীনে প্রথম হিন্দু সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। কেহ কেহ মনে করেন যে ফান-চে-মান ও পূর্বে উল্লিখিত চম্পার হিন্দু রাজা শ্রীমার একই ব্যক্তি এবং চম্পা তখন ফুনানের বশ্যতা স্বীকার করিত। কিন্তু সকলে এই মত গ্রহণ করেন নাই। ফান-চে-মান 'ফুনানের মহৎ রাজা' (Great King of Fu-nan) এই উপাধি গ্রহণ করেন এবং কিন-লিন (সুবর্ণভূমি বা সুবর্ণ দ্বীপ)-এর

বিরুদ্ধে এক যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করেন, কিন্তু এই সময় তাঁহার অসুখ ও মৃত্যু হয়। অসুখের সময় তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ফান্-কিন্-চেং কে সৈন্যদলের ভার গ্রহণ করিবার জন্য পাঠান, কিন্তু ফান-চে-মানের ভাগিনেয়, সেনাপতি ফান-চান, ফান-কিন্-চেং-এর অনুপস্থিতির সুযোগে নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন ও ফান-কিন্-চেং কে নিহত করেন (আনুঃ ২২৫ খ্রী)।

চীন ও ভারতবর্ষের সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপনের বিশিষ্ট প্রমাণ থাকার জন্য ফান-চানের রাজ্যকালকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করা হয়। ২৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চীনে দূত এবং ইহার সহিত উপহার হিসাবে কয়েকজন বাদক ও নিজ দেশে উৎপন্ন দ্রব্য পাঠান। তিনি সু-বু (Su-Wu) নামক তাঁহার এক আত্মীয়কে ভারতে দূত হিসাবে পাঠান। টিউ-কিউ-লি (সম্ভবতঃ বিখ্যাত তক্কোল) বন্দর হইতে সু-বু জাহাজে করিয়া রওনা হন এবং প্রায় এক বৎসর পরে ভারতবর্ষের বৃহৎ নদীর (গঙ্গা) মোহানায় পৌঁছান। নদীর ভিতর দিয়া ৭০০০ 'লি' দেশের অভ্যন্তরে অগ্রসর হইবার পরে তিনি ভারতবর্ষের রাজার দর্শন লাভ করেন। ভারতবর্ষের রাজা সু-বু কে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানান এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পরিদর্শনের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। সু-বুর সহিত রাজা নিজের দুইজন দূতকে ফুনান রাজ্যে পাঠান ও ইহাদের সহিত রাজাকে উপহার দিবার জন্য ইউ-চি (Yu-Che) দেশের চারিটি ঘোড়া দেন। সু-বু প্রায় চার বৎসর পরে এই সব লইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন।

এই চার বৎসরের মধ্যে দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন হইয়াছিল। ফুনানের সিংহাসনে তখন আর ফান-চান অবস্থিত ছিলেন না। ফান-চাং নামে ফান-চে-মানের কনিষ্ঠ পুত্র ফান-চানকে হত্যা করেন। পিতার মৃত্যুকালে ফান-চাং অতি শিশু ছিল, কিন্তু তাহার কুড়ি বৎসর বয়স হইলে কয়েকজন সাহসী লোক যোগাড় করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হত্যার প্রতিশোধ স্বরূপ ফান-চান কে

হত্যা করে। ফান চাং সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিল কিনা তাহা সঠিক জানা যায় না, তবে করিয়া থাকিলেও তাহার রাজ্যকাল খুব অল্পদিন স্থায়ী হইয়াছিল। সেনাপতি ফান-সিউন তাহাকে হত্যা করিয়া ফুনান রাজ্য লাভ করেন।

ফান সিউনের রাজ্যকালে, সম্ভবতঃ ২৪৫ ও ২৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোনও সময়ে চীনা দূত কাংতাই (K'ang T'ai) ও চু-য়িং (Chu-Ying) ফুনানে আসেন। খুব সম্ভব তিনি চীন দরবারে দূত পাঠাইয়াছিলেন বলিয়াই সেখান হইতে তাঁহার রাজ্যে দূত পাঠানো হইয়াছিল। এইখানে ভারত হইতে আগত দূতদের মধ্যে চেন সং (Chen Song) নামে একজনের সহিত চীনা দূতদিগের সাক্ষাৎ হয়।

ফুনান সম্বন্ধে কাংতাই একটি বিবরণী লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মন্তব্যের মধ্যে যেটি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাহা এই যে, যদিও দেশটি অতি সুন্দর কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এখানকার লোকেরা বস্ত্র পরিধান করে না। অবশ্য রাজা ফান সিউন এই বর্বর প্রথা বন্ধ করেন।

ফান সিউন অনেকদিন রাজত্ব করেন এবং ২৬৮, ২৮৫, ২৮৬ ও ২৮৭ খ্রীষ্টাব্দে চীনে দূত পাঠান।

ফুনান সম্বন্ধে চীনা ইতিহাসে পরবর্তী যে উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা ৩৫৭ খ্রীষ্টাব্দে চন্তন (Chantan) নামে এক হিন্দু কর্তৃক দৌত্য পাঠানো উপলক্ষ্য করিয়া। চীনা বিবরণী অনুযায়ী এই হিন্দু 'ফুনানের রাজা' এই উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনা দেশের রাজনৈতিক গোলযোগ ও সিংহাসনের বহু দাবিদার সূচিত করে। এই হিন্দুর নাম চন্দন বা চন্দ্র এই অনুমান করা হয়। ফরাসী পণ্ডিত সিলভাঁ লেভির মতে এই বিদেশী হিন্দুরাজা সম্ভবতঃ কুষাণ রাজবংশের লোক এবং গুপ্ত বংশীয় রাজগণ কর্তৃক পূর্বভারত হইতে বিতাড়িত হইয়া ফুনানে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে অথবা পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে ফুনানের সিংহাসন কিয়াও চেন-জু বা কৌণ্ডিন্য নামে এক ব্যক্তি কর্তৃক অধিকৃত হয়। লিয়াঙ্গ রাজবংশের ইতিহাসে ইঁহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্পটি পাওয়া যায়।

"কৌণ্ডিন্য জাতিতে ব্রাহ্মণ ও ভারতবর্ষের অধিবাসী ছিলেন। একদিন তিনি ফুনানে গিয়া রাজত্ব করিবার জন্য দৈবাদেশ পাইলেন। তিনি ফুনানের দক্ষিণে অবস্থিত পানপানে পৌঁছিলেন। ফুনানের অধিবাসীরা তাঁহাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাইল ও তাঁহাকে রাজা নির্বাচিত করিল। এখানে তিনি ভারতীয় আইন কানুন ও সামাজিক রীতিনীতি প্রচলিত করিলেন।"

এই গল্প হইতে মনে হয় যে নূতন করিয়া ভারত হইতে একদল উপনিবেশকারীরা আসিয়া সমস্ত দেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সভ্যতা প্রচার করে। ফরাসী পণ্ডিত সয়ডেস (Coedes) মনে করেন যে ভারতের পূর্ব উপকূলে সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক পল্লব প্রভৃতি রাজবংশের পতনের ফলেই একদল ভারতীয় ফুনানে গমন করে।

ইহার পরে চে-লি-তো-পা-মো নামে কৌণ্ডিন্যের এক উত্তরাধিকারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি ৪৩৪, ৪৩৫, ও ৪৩৮ খ্রীষ্টাব্দে চীন সম্রাটের দরবারে উপহার সহ দূত পাঠান। এই নামটি সম্ভবতঃ শ্রীইন্দ্রবর্মন বা শ্রেষ্ঠবর্মন নামের চীনা ভাষার রূপ।

চীনা পুস্তক হইতে কৌণ্ডিন্যের অপর একজন উত্তরাধিকারী সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়।

"সোং রাজত্বের (৪২০-৪৭৮ খ্রী) শেষ ভাগে চো-য়ে-প-মো (জয়বর্মন) ফুনান শাসন করিতেন। তাঁহার বংশের নাম ছিল কৌণ্ডিন্য। তিনি কয়েকজন বণিককে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ক্যানটনে পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা দেশে ফিরিবার সময় ভারতীয় ভিক্ষু না-কিয়া-সিয়েন (নাগসেন) নিজ দেশে ফিরিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের

সহিত যাত্রা করে। কিন্তু ঝড়ের জন্য তাহারা চম্পায় অবতরণ করিতে বাধ্য হয় এবং এখানকার লোকেরা তাহাদের সমস্ত জিনিসপত্র লুঠ করিয়া লয়। নাগসেন অবশ্য ফুনানে পৌঁছিয়াছিলেন।

"৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে জয়বর্মন একটি মস্ত আবেদন পত্র দিয়া নাগসেনকে সম্রাটের দরবারে পাঠান। এই আবেদনপত্রের সম্পূর্ণ নকল চীনা ইতিহাসে উদ্ধৃত আছে। কিউ--চেউ-লো নামে ফুনানের এক বিদ্রোহী প্রজা চম্পায় পলাইয়া যায় ও সেইখানে রাজার বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়া নিজেই চম্পার সিংহাসন অধিকার করে— এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ এই আবেদন পত্রে দেওয়া হইয়াছে। চম্পায় এই ব্যক্তি সকল রকম অবিচার ও অত্যাচারে লিপ্ত আছে এবং আরও নিন্দনীয় এই যে সে তাহার পূর্বতন প্রভু ফুনানের রাজার বিরুদ্ধে খোলাখুলি শত্রুজনোচিত মনোভাবের পরিচয় দিতেছে। এই কারণে জয়বর্মন সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। যদি সম্রাট চম্পার রাজাকে শাস্তি দিবার জন্য শক্তিশালী সেনাদল পাঠাইতে সম্মত না থাকেন তাহা হইলে এই বিদ্রোহী রাজাকে শাস্তি দিবার জন্য জয়বর্মনের সাহায্যার্থে একটি ছোট সেনাদল পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। নাগসেন সম্রাটের দরবারে গিয়া ফুনানের রীতিনীতির একটি বিবরণ দেন, ইহাতে ফুনানের প্রধান দেবতা হিসাবে মহেশ্বরের উল্লেখ আছে। এই সঙ্গে নাগসেন একটি কবিতাও উপহার দেন। অর্থ খুব পরিষ্কার না হইলেও ইহাতে মহেশ্বর, বুদ্ধ ও সম্রাটের গুণ-কীর্তণ করা হইয়াছে।

"সম্রাট মহেশ্বরের প্রশংসা করিলেন এবং যে বিদ্রোহী চম্পার সিংহাসন অধিকার করিয়াছে তাহার নিন্দা করিলেন। কিন্তু আবার ইহাও বলিলেন 'কৃষ্টি ও সততার দ্বারা আমি দূরদেশের লোকের ভক্তি আকর্ষণ করি, কিন্তু অস্ত্রের সাহায্য লওয়া পছন্দ করি না'।"

৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে জয়বর্মন আবার সম্রাটের দরবারে উপহার সহ

দূত পাঠান। উপহার সামগ্রীর মধ্যে একটি প্রবাল নির্মিত বুদ্ধমূর্তি ছিল। ৫১১ ও ৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে আরও দুইবার তিনি সম্রাটের দরবারে দূত পাঠান। তাঁহার রাজ্যকালে যে এই দুই দেশের সম্বন্ধ আন্তরিক ও ঘনিষ্ঠ ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই ঘটনার সমর্থক রূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে এই সময়ে ফুনান হইতে দুই জন বৌদ্ধ ভিক্ষু চীনে গিয়া বসবাস করে ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের অনুবাদ করিতে থাকে।

জয়বর্মনের প্রধান রাণীর নাম ছিল কুলপ্রভাবতী। তাঁহার মৃত্যুর পর সিংহাসনের অধিকার লইয়া গোলযোগ শুরু হয়। তাঁহার ধর্মপত্নীর গর্ভজাত অল্পবয়স্ক পুত্রকে হত্যা করিয়া রুদ্রবর্মন নামে তাঁহার এক উপপত্নীর পুত্র সিংহাসন আরোহণ করেন। খুব সম্ভব এই নিহত পুত্রের নাম ছিল গুণবর্মন ও তাঁহার মাতা ছিলেন কুলপ্রভাবতী। এই দুই জনের দুইখানি সংস্কৃত লেখ পাওয়া গিয়াছে।

৫১৭ হইতে ৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে রুদ্রবর্মন অন্ততপক্ষে ছয়বার চীনে দূত পাঠান। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত একখানি বৌদ্ধ লেখ-তেও তাঁহার উল্লেখ আছে। রুদ্রবর্মনই ফুনানের সর্বশেষ রাজা যাঁহার নাম চীনা পুস্তকে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইঁহার রাজ্যকালে বা কিছু পরে ফুনান কাম্বোজ রাজগণের দ্বারা আক্রান্ত হয়। উত্তর কাম্বোডিয়ায় অবস্থিত এই রাজ্য প্রথমে ফুনানের অধীন রাজ্য ছিল, কিন্তু ক্ষমতাশালী কয়েকজন শাসকের অধীনে শক্তিসম্পন্ন হয় ও ফুনানের অধীনতা হইতে মুক্ত হয়। ফুনানের রাজা পরাজিত হইয়া (ব-ফ্‌নোমের নিকটবর্তী) ব্যাধপুর হইতে দক্ষিণ দিকে নরবরনগরে (বর্তমান অংকোর বোরেই) রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু সপ্তম খ্রীষ্টাব্দ শেষ হইবার আগেই ফুনান কাম্বোজ কর্তৃক সম্পূর্ণ বিজিত হয় ও এই সময়ের পর হইতে ইহার আর পৃথক কোনও রাজনৈতিক অস্তিত্ব ছিল না।

ফুনানের প্রথম যুগের ইতিহাস সুদূর প্রাচ্যের অন্যান্য হিন্দু উপনিবেশের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি মাত্র। প্রথমতঃ একজন হিন্দু অথবা হিন্দুধর্মাবলম্বী শাসক একটি বর্বর বা অর্ধসভ্য দেশ বলপূর্বক বা অন্য উপায়ে অধিকার করে এবং ঐ দেশের লোকেরা হিন্দু সভ্যতা গ্রহণ করে। ক্রমশঃ এই দেশ সোজাসুজি ভারতবর্ষের সংস্পর্শে আসে এবং ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি এখানে প্রকাশ পায়।

ফুনানের ক্ষেত্রে ভারতীয় সভ্যতা প্রতিষ্ঠার দুইটি প্রধান পর্যায় লক্ষিত হয়; একটি প্রথম খ্রীষ্টাব্দে এবং অন্যটি চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দে। দুই পর্যায়েই ইহা দুই রাজার দ্বারা প্রভাবান্বিত এবং দুই জনেরই নাম কৌণ্ডিন্য বলিয়া অনুমান করা যায়। প্রথম কৌণ্ডিন্য (হুয়েন টিয়েন) ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুগামী ছিলেন বলিয়া জানা যায় কিন্তু তাঁহার আদি নিবাস কোন স্থানে ছিল সে সম্বন্ধে প্রকৃত কিছু জানা যায় না। কিন্তু চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দের কৌণ্ডিন্য যে সোজা ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছিলেন, তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ চীনা পুস্তকে পাওয়া যায়।

২৬৫ হইতে ৪১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত চীন (Tsin) রাজবংশের ইতিহাসে ফুনানের সর্বপ্রথম যে সাধারণ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহা নিম্নরূপ :—

"লিন-য়ি (চম্পা) রাজ্যের ৩০০০ 'লি' পশ্চিমে একটি বৃহৎ উপসাগরের কূলে ফুনান রাজ্য অবস্থিত। এই দেশের বিস্তৃতি ৩০০০ 'লি'। এখানে অনেক প্রাচীর বেষ্টিত নগর, প্রাসাদ ও বাড়ী আছে। এইখানকার অধিবাসীরা কৃষ্ণবর্ণ ও কুৎসিত। তাহাদের কেশ কুঞ্চিত ও তাহারা নগ্নদেহে ও নগ্নপদে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহারা সরল প্রকৃতির লোক এবং চুরি ডাকাতি করে না। তাহারা কৃষিজীবী। প্রথম এক বৎসর তাহারা শস্য রোপণ করে ও পরবর্তী তিন বৎসর ফসল সংগ্রহ করে। ইহা ছাড়া তাহারা তাহাদের গহনা খোদাই ও পালিশ করিতে ভালবাসে। প্রায় বেশির ভাগ লোক

রূপার পাত্রে খাদ্য গ্রহণ করে। তাহারা সোনা, রূপা, মুক্তা ও নানারূপ গন্ধদ্রব্য দ্বারা রাজস্ব দেয়। এই দেশে অনেক পুস্তক আছে এবং গ্রন্থাগার ও দপ্তরখানা আছে। লিখিবার কালে যে লিপি তাহারা ব্যবহার করে তাহা ভারতীয় লিপি হইতে উদ্ভূত। তাহাদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ও বিবাহের অনুষ্ঠান চম্পায় প্রচলিত অনুষ্ঠানের অনুরূপ।"

অন্যান্য চীনা পুস্তকেও ফুনানের বিবরণী পাওয়া যায়। এইগুলি ও যে তিনটি সংস্কৃত লেখ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, সব মিলাইয়া যে ধরণা করা যায় তাহাতে নিঃসন্দেহে বুঝা যায় যে ফুনানের অধিবাসীরা ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছিল।

ভারতবর্ষের তিনটি প্রধান ধর্ম—অর্থাৎ শৈব, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধধর্ম—সবগুলিই ফুনানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ভারতীয় দার্শনিক মতবাদ, ধর্ম-বিশ্বাস ও দেবদেবীর উপাখ্যান এখানে সুপরিচিত ছিল এবং ভারতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পূজা পার্বন প্রভৃতি এখানে প্রচলিত ছিল। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য অধীত হইত এবং লিখিবার জন্য ভারতীয় লিপি ব্যবহৃত হইত। বেদ, উপবেদ, ও বেদাঙ্গে অভিজ্ঞ বহু ব্রাহ্মণ এখানে বসবাস করিত। ভারতীয় শিল্পরীতি এখানে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং ভারতের অনুকরণে মন্দির ও দেবতার মূর্তি রাজ্যের নানা অংশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। জাতিভেদ প্রথা অন্ততঃ মোটামুটি ভাবে প্রচলিত ছিল। তবে সম্ভবতঃ প্রায়ই ব্রাহ্মণরা নানারূপ বৈষয়িক কর্ম অবলম্বন করিত। এইরূপে দেখা যায় যে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে হিন্দু সংস্কৃতির প্রধান প্রধান উপাদানগুলি ফুনানে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই কেন্দ্র হইতে চতুর্দিকে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রসারিত হইয়াছিল এবং ফান-চে-মান ও অন্যান্য রাজা কর্তৃক বিভিন্ন রাজ্য জয়ে এই বিস্তার আরও সহজসাধ্য হইয়াছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কাম্বোজ রাজ্য

ফুনানে সর্বপ্রথম হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল এবং এই রাজ্য হিন্দু সংস্কৃতি প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। কিন্তু সপ্তম খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই রাজ্যের অস্তিত্ব বিলীন হইল এবং ইহার পরিবর্তে কাম্বোজরাজ্যের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হইল ও এই অঞ্চলে সর্বত্র ঐ রাজ্যের প্রভুত্ব স্থাপিত হইল। এই সময় হইতে চতুর্দশ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় সাতশত বৎসর কাম্বোজের গৌরবময় ঐতিহ্য অপ্রতিহত ছিল এবং তাহার পরে ঐ রাজ্যের অবনতি হয়। কিন্তু আগের দিনের ক্ষমতা বা গৌরব না থাকিলেও এখন পর্যন্ত এই রাজ্যের অস্তিত্ব বজায় আছে।

এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে প্রচলিত বিবরণ নিম্নরূপ :—

"অতীতকালে কাম্বোডিয়া বালু ও প্রস্তরময় মরুভূমি ছিল। একদিন কম্বু স্বায়ম্ভূব নামে আর্যদেশের রাজা এই জনহীন দেশে উপনীত হইলেন। মহাদেব শিবের বরে প্রাপ্ত পত্নী মেরার মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার অত্যন্ত শোক হয় এবং এইজন্য তিনি স্বদেশ ত্যাগ করিয়া মরুপ্রান্তরে দেহত্যাগ করিবার জন্য যাত্রা করেন। কাম্বোডিয়ায় পৌঁছিয়া তিনি একটি গুহায় প্রবেশ করেন। এই গুহার অভ্যন্তরে বহু সংখ্যক একাধিক-মস্তক-বিশিষ্ট বড় বড় সাপ দেখিয়া তিনি বিস্মিত হন। কিন্তু কম্বু ভীত না হইয়া খোলা তরবারি হাতে সর্বাপেক্ষা বড় সাপের দিকে অগ্রসর হন। কম্বুকে আশ্চর্যান্বিত করিয়া সাপটি মানুষের মত কথা বলিয়া উঠিল ও তাহার নিবাস জিজ্ঞাসা করিল। কম্বুর কাহিনী শ্রবণ করিয়া সাপটি বলিল—'ওহে বিদেশী তোমার নাম আমার কাছে অজ্ঞাত, কিন্তু তুমি শিবের উল্লেখ করিয়াছ, এবং আমি যেমন নাগ সম্প্রদায়ের রাজা, সেইরূপ

শিব আমার রাজা। তোমাকে সাহসী বলিয়া মনে হইতেছে, কাজেই তোমার দুঃখের অবসান হউক, তুমি আমাদের সহিত এই দেশে বসবাস কর।' কম্বু এইখানে থাকিয়া গেলেন এবং ক্রমশঃ নাগদের পছন্দও করিতে লাগিলেন, কারণ, তাহারা মানুষের রূপ ধারণ করিতে পারিত। কয়েক বৎসর পরে তিনি নাগরাজের কন্যাকে বিবাহ করিলেন। নাগরাজা যাদুশক্তির অধিকারী ছিল এবং এই শুষ্ক মরুপ্রান্তরকে আর্যদেশের ন্যায় সুন্দর দেশে রূপান্তরিত করিয়াছিল। কম্বু এই দেশ শাসন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার নামানুসারে এই দেশের নাম হইল কম্বুজ।"

এই কাহিনী হইতে মধ্য কাম্বোডিয়ার অর্থাৎ যেখানে প্রথম কাম্বোজ রাজ্যের পত্তন হয়, সেইখানকার হিন্দু উপনিবেশ পত্তনের আরম্ভ কালের আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু প্রথম যুগের উপনিবেশ-কারীরা ফুনানের সমুদ্র উপকূল হইতে মেকং নদীপথে এই দেশে আসিয়াছিল অথবা পশ্চিমে অবস্থিত শ্যামদেশ বা পূর্বে অবস্থিত চম্পাদেশের ভিতর দিয়া এই দেশে পৌঁছিয়াছিল তাহা সঠিক নির্ণয় করা যায় না। এমন কি এই হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকালও ঠিক ভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নয়। এই রাজ্যের সর্বপ্রথম যে রাজার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় তাঁহার নাম শ্রুতবর্মন। তিনি একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র শ্রেষ্ঠবর্মন ছাড়া এই বংশের আর কোনও রাজার নাম জানা যায় না। প্রথম দিকে কাম্বোজ একটি করদ রাজ্য ছিল কিন্তু শ্রুতবর্মন বা তাঁহার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে একজন ইহার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করে। লাওস দেশের অন্তর্গত বাসাকের নিকটবর্তী ভাট ফু পাহাড়ের কাছে এই রাজ্যের রাজধানী শ্রেষ্ঠপুর অবস্থিত ছিল; সম্ভবতঃ দ্বিতীয় রাজার নাম অনুসারে রাজধানীর নামকরণ হয়। সেই সময় লিঙ্গপর্বত নামে অভিহিত এই পাহাড়ের চূড়ায় ভদ্রেশ্বর শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং ইনিই রাজবংশের ইষ্টদেবতা ছিলেন। অনেকদিন পর্যন্ত এই ধারণা ছিল

যে এই বংশের রাজারা ফুনানের অধীনতা স্বীকার করিত। কিন্তু এখন যে প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতে জানা যায় যে পঞ্চম শতাব্দে মেকং উপত্যকায় খোং (Khong) প্রপাতের উপরিভাগ পর্যন্ত অঞ্চল সমূহ দেবানীক নামে এক ব্যক্তির অধীন ছিল। এই ব্যক্তি খুব সম্ভব চম্পাদেশের রাজা ছিলেন। কাজেই ইহা অনুমান করিয়া লওয়া যায় যে ডংরেক পর্বতমালার দক্ষিণে সমতলভূমি ও মেকং উপত্যকায় খোং (Khong)-এর দক্ষিণে অবস্থিত অঞ্চল সমূহে রাজত্ব করিবার প্রথম দিকে শ্রুতবর্মনের বংশধরেরা ফুনান বা চম্পার অধীনতা স্বীকার করিত। কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দে কাম্বোজের রাজারা এই অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হইল এবং উত্তরে বাসাক (Bassac) পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিল। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে কাম্বোজের রাজাদের ন্যায় ভদ্রেশ্বর শিব চম্পার রাজাদেরও ইষ্টদেবতা ছিলেন।

শ্রুতবর্মনের বংশের পরে ভববর্মনের রাজবংশ কাম্বোজে প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্ভবতঃ ইঁহার সহিত কাম্বোজ এবং ফুনান বা চম্পা রাজ্যের রাজবংশের সম্পর্ক ছিল। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে ভববর্মন রাজা হন। তাঁহার একটি মাত্র জানা তারিখ ৫৯৮ খৃষ্টাব্দ। ফুনানের রাজাদের মত এই রাজাও কৌণ্ডিন্য হইতে তাঁহার বংশের উদ্ভব দাবী করেন, কম্বু হইতে নহে। তাঁহার সহিত ফুনানের রাজবংশের সম্পর্ক ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। কিন্তু তাঁহার সহিত ফুনানের রাজবংশ হইতে চম্পার রাজবংশের সম্পর্ক নিকটতর ছিল বলিয়া মনে করা অসংগত হইবে না। বাসাক অঞ্চলে কাম্বোজ রাজ্য বিস্তৃত হইবার আগে যে স্থান পর্যন্ত কাম্বোজ রাজ্যেরই সীমানা ছিল তাহার অন্তর্গত কম্পোনথম (Kampon Thom) নামক জায়গার কুড়ি মাইল উত্তর-পশ্চিমে ভবপুর নামে তিনি রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বহু রাজ্য জয় করেন এবং তাঁহার আমলে কাম্বোজ রাজ্যের ক্ষমতা ও বিস্তৃতি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

ভববর্মনের বা তাঁহার পুত্রের অল্পকালস্থায়ী রাজত্বের পরে ভববর্মনের ভাই চিত্রসেন রাজা হন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি মহেন্দ্রবর্মন নাম গ্রহণ করেন। এই সময়ে ফুনানের সিংহাসনে রুদ্রবর্মন অথবা তাঁহার কোনও উত্তরাধিকারী অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে মহেন্দ্রবর্মন অনেকবার যুদ্ধ করেন। কাম্বোজের নবজাগ্রত শক্তিকে বাধা দিতে অক্ষম হইয়া ফুনানের রাজা দক্ষিণদিকে পলাইয়া যান এবং নূতন এক রাজধানী হইতে রাজ্যের অবশিষ্ট অংশ শাসন করিতে থাকেন। এইভাবে মহেন্দ্রবর্মন প্রাচীন ফুনান রাজ্যের প্রায় সমস্ত অংশ জয় করিয়া ৬১৬ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্বে মারা যান ও তাঁহার পুত্র ঈশানবর্মন (বা ঈশান সেন) রাজ্য লাভ করেন। নূতন রাজাও ফুনানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং সম্ভবতঃ ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইহা সম্পূর্ণরূপে জয় করেন। কাম্বোডিয়া ও কোচিন চীনের সমস্ত অংশ এবং ডংরেক পর্বতের উত্তরে মুন নদীর উপত্যকা পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল লইয়া তাঁহার রাজ্য গঠিত ছিল। তিনি তাঁহার নামানুসারে অভিহিত ঈশানপুর নামক নূতন এক নগরীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই রাজধানী অধুনা সম্বর প্রেই কুক্ (Sambor Prei Kuk) নামক স্থানে অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। ঈশানবর্মন ৬১৬ কিংবা ৬১৭ খ্রীষ্টাব্দে চীনে দূত পাঠান এবং সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। চম্পা রাজ্যের সহিত তাঁহার নাম ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। আগেই বলা হইয়াছে চম্পা রাজ্যে এই সময় ক্রমান্বয়ে পারিবারিক বিদ্রোহ ও রাজনৈতিক দলাদলি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল; এবং কাম্বোজের রাজারা, বিশেষতঃ মহেন্দ্রবর্মন ও ঈশানবর্মন, ইহাতে একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহেন্দ্রবর্মন চম্পায় একজন দূত পাঠান এবং ঈশানবর্মনের কন্যা শ্রীশর্বানীর সহিত জগদ্ধর্মের বিবাহ হয়। ৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পুর্বে শর্বানীর পুত্র প্রকাশধর্ম চম্পার রাজা হন এবং রাজ্যে শৃঙ্খলা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা

করেন। ৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে ঈশানবর্মনের শেষ উল্লেখ পাওয়া যায়।

ইহার পরবর্তী যে দুইজন কাম্বোজ রাজার নাম জানা যায় তাঁহারা দ্বিতীয় ভববর্মন ও প্রথম জয়বর্মন। তাঁহাদের সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কোনও খবর পাওয়া যায় না, এমন কি তাঁহাদের দুইজনের মধ্যে বা তাঁহাদের পূর্ববর্তী রাজাদের সহিত তাঁহাদের কি সম্পর্ক ছিল তাহাও জানা যায় না। তাঁহাদের নিজস্ব প্রচারিত বিবরণীতে তাঁহাদিগকে মহৎ ও ক্ষমতাশালী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; এবং সম্ভবতঃ তাঁহারা সমগ্র কাম্বোজ রাজ্যটি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় ভববর্মনের উল্লেখ পাওয়া যায়। ৬৫৭ হইতে ৬৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জয়বর্মন সিংহাসনে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ভববর্মন প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের সমাপ্তি হয়। ৬৫০ হইতে ৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চীনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত টাং (T'ang) বংশের সম্রাট কাওৎ সং (Kaot song)-এর কাছে এই দুই রাজার মধ্যে একজন দূত পাঠান।

প্রথম জয়বর্মনের মৃত্যুর পরে এক শতাব্দী কাল কাম্বোজের ইতিহাস সম্বন্ধে সামান্যই জানা যায় ও যাহা জানা যায় তাহাও সুসংবদ্ধ নহে। ৭১৩ খ্রীঃ উৎকীর্ণ একখানি লেখতে রাণী জয়দেবী (সম্ভবতঃ প্রথম জয়বর্মনের বিধবা) দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন যে সময় বড়ই খারাপ। চীনা ইতিহাস অনুসারে অষ্টম খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে কাম্বোজ রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। এই দুই রাজ্য চীনাদের কাছে চেনলা (কাম্বোজের চীনা নাম)-এর স্থলভাগ ও চেনলার জলভাগ নামে পরিচিত ছিল। প্রথমোক্তটি 'পর্বত ও উপত্যকাপূর্ণ' ছিল এবং সম্ভবতঃ কম্বোডিয়ার উত্তর ভাগ, লাওস এবং টনকিন ও ইউনানের কিছু অংশ নির্দেশ করে। এইটি একটি ক্ষমতাশালী রাজ্য ছিল। ইহার সহিত চীনের রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত

হইয়াছিল এবং ৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে এখান হইতে চীন সম্রাটের দরবারে দূত পাঠানো হয়। কিন্তু পাঁচ বৎসর পরে চীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী একজন আনাম প্রধানকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে এই রাজ্য হইতে সেনাদল পাঠানো হয় এবং উভয় রাজ্যের সৈন্যদলের যুক্ত প্রচেষ্টায় চীনা সৈন্যেরা পরাজিত হয়। চীনের সহিত মিত্রতা সম্বন্ধ শীঘ্রই পুনরায় স্থাপিত হয় এবং ৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজার পুত্র চীন দরবারে উপস্থিত হয় এবং চীনা সৈন্যদলের সহিত নান চাও (ইউনান)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে।

৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে রাজা নিজেই চীন সম্রাটের সঙ্গে দেখা করিতে যান। ৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনে সর্বশেষ দৌত্য পাঠানো হয়। যদিও বিশেষ কোনও বিবরণ জানা যায় না তথাপি একথা বলা চলে যে মেকং নদীর উপত্যকার মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত উত্তর কাম্বোজ রাজ্য বিস্তৃত ও ক্ষমতাশালী ছিল। তবে সম্ভবতঃ এই প্রাচীন ভবপুর রাজ্যে একাধিক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত চেনলা বা কাম্বোজের জল রাজ্য বলিতে চীনারা কাম্বোডিয়া রাজ্য নির্দেশ করিয়াছে। কিন্তু অষ্টম খ্রীষ্টাব্দে ইহার ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তবে এইখানকার কয়েকটি রাজ্যের নাম জানা যায়, যথা, শম্ভুপুর, অনিন্দিতপুর ও ব্যাধপুর; প্রথমটি সম্ভবতঃ মেকং-এর তীরে সম্বরে অবস্থিত ছিল এবং তৃতীয়টি ফুনানের প্রাচীন রাজধানী। কিন্তু দ্বিতীয় রাজ্যটির অবস্থান সঠিক ভাবে নির্দেশ করা যায় না। এই রাজ্যগুলি একই সময়ে অথবা একটির পর একটি প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল সে সম্বন্ধেও কিছু জানা যায় না। তবে অনুমান করা যায় যে এই রাজ্যগুলি একই সময়ে এই অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে প্রতিষ্ঠিত ছিল, কারণ অনিন্দিতপুরের রাজবংশে জাত পুস্করাক্ষ শম্ভুপুর রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়াতে ইহা সম্ভব হইয়াছিল। তাহা হইলে ধরিয়া লইতে হয় যে দক্ষিণ কাম্বোজ অনেকগুলি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কয়েকজন

রাজার নামও জানা যায়, যথা শম্ভুপুরের রাজা নৃপতীন্দ্র-বর্মন ও তাঁহার পুত্র পুষ্করাক্ষ, এবং অনিন্দিতপুরের রাজা বালাদিত্য। শম্ভুবর্মন ও নৃপাদিত্য খুব সম্ভব যথাক্রমে এই দুইটি রাজ্যের রাজা ছিলেন। আরও কয়েকজন রাজার নাম জানা যায় কিন্তু তাঁহারা কোন রাজ্যের রাজা ছিলেন সে সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। পুষ্করাক্ষ যে ৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাহা সঠিক ভাবে জানা যায়। আর কোন রাজার তারিখ জানা যায় না।

এইসব হইতে অনুমান হয় যে অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে শৈলেন্দ্ররা ক্ষমতাশালী হইয়া উঠায় এই দেশের অবস্থা আরও শোচনীয় হয় এবং কিছুকালের জন্য কাম্বোজ যে জাভার অধীন রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল তাহার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। ভববর্মন ও তাঁহার পরবর্তী রাজগণ নানা দেশ জয় করিয়া যে শক্তিশালী রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন, তাঁহার ধ্বংস হয়, এমন কি কাম্বোজ রাজ্যের স্বাধীনতাও লোপ পায়।

কাম্বোজ রাজ্যের পরবর্তীকালের ইতিহাস পর্যালোচনার আগে এখানে পূর্বে কাম্বোজ রাজ্য ও পশ্চিমে মেনাম নদীর উপত্যকায় মোন রাজ্যের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত কয়েকটি রাজ্যের বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন।

ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিল কোরাটে অবস্থিত চানাশ। খ্রীষ্টীয় সপ্তম হইতে দশম শতাব্দ পর্যন্ত এই রাজ্যের অস্তিত্বছিল। এই রাজ্যের যে কয়জন রাজার নাম জানা যায় তাঁহারা ভগদত্ত, সুন্দরপরাক্রম, তাঁহার পুত্র সুন্দরবর্মন এবং ইঁহার দুই পুত্র নরপতিসিংহ-বর্মন ও মঙ্গলবর্মন। শেষোক্ত রাজা ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন। প্রথম দিকে এই রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম বিশেষ প্রভাবশালী ছিল কিন্তু পরে ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রধান্য লাভ করে। সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দে রচিত কয়েকটি লেখতে টঙ্গুর ও শাম্বুক নামে এই অঞ্চলের আরও দুইটি রাজ্যের এবং জয়সিংহবর্মন নামে একজন রাজার উল্লেখ পাওয়া

যায়, কিন্তু এই রাজা যে কোন্ রাজ্যের রাজা ছিলেন তাহার কিছু উল্লেখ নাই। এই রাজ্যগুলি কাম্বোজের খ্মের (Khmer) রাজ্য বা দ্বারবতীর মোন রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বা ইহাদের অধীন ছিল তাহা নির্ণয় করা যায় না।

ঈশানবর্মনের পৌত্র রাজা হর্ষবর্মন কর্তৃক শৈব দেবতা আম্রতকেশ্বরের উদ্দেশ্যে দানের কথা উটং (U T'ong)-এ প্রাপ্ত একটি সংস্কৃত তাম্রলিপি হইতে জানা যায়। অক্ষরের প্রমাণ অনুযায়ী এই লিপির কাল সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দ বলিয়া মনে হয়। কাজেই এই লিপিতে উল্লিখিত ঈশানবর্মন ও কাম্বোজের রাজা ঈশানবর্মন একই ব্যক্তি একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক। তাহা হইলে হর্ষবর্মনকে দ্বিতীয় ভববর্মনের পুর্ববর্তী বা পরবর্তী একজন রাজা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। কিন্তু এই লিপিতে এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যাহা কাম্বোজের কোনও লেখতে দেখা যায় না। তাহা ছাড়া কাম্বোজ রাজ্যের সীমানা যে পশ্চিমে এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহার আর কোনও প্রমাণও পাওয়া যায় না। যাহা হউক এই লিপি হইতে সপ্তম শতাব্দে ইউ টং (U T'ong)-এ যে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এতদিন পর্যন্ত এই রাজ্যের সম্বন্ধে সর্বপ্রথম উল্লেখ হইতে জানা গিয়াছিল যে ১৩৪৯ খ্রীষ্টাব্দে কলেরা মহামারী রূপে দেখা দেওয়াতে থাই রাজা এই রাজ্য ত্যাগ করিয়া শ্যামদেশের অন্তর্গত অযুথিয়াতে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। চৈয়াফুন (Chaiyaphun) প্রদেশের হিন্টাং (Hin 'Tang)-এ প্রাপ্ত আর একটি সংস্কৃত লেখর ভগ্নাংশ হইতে একজন বৌদ্ধ রাজা চন্দ্রাদিত্যের নাম জানা যায়।

———

তৃতীয় অধ্যায়

অঙ্কোরের উদ্ভব

প্রথম জয়বর্মনের মৃত্যুর পর প্রায় এক শতাব্দী কাল কাম্বোজ রাজ্যের ইতিহাস খুবই অস্পষ্ট; কিন্তু নবম খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে দ্বিতীয় জয়বর্মনের সিংহাসনে আরোহণের কাল হইতে এই অস্পষ্টতার অবসান হয়। তাঁহার সহিত কাম্বোজ রাজ্যে নূতন যুগের সূচনা হইল এবং সেই সময় হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত এই রাজ্যের ইতিহাসে কোনও ছেদ নাই। কাম্বোজের ইতিহাসে দ্বিতীয় জয়বর্মনের নাম প্রসিদ্ধ। পরবর্তী যুগে দেশবাসীরা তাঁহাকে দৈবশক্তি সম্পন্ন বীরের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল এবং এই রাজা একাধারে শক্তিশালী যোদ্ধা ও সৌধ-নির্মাতা ছিলেন বলিয়া মনে করা হইত। আধুনিক কালের ঐতিহাসিকরা অনেকদিন পর্যন্ত এই মত পোষণ করিতেন এবং তাঁহাকে কাম্বোজ দেশের কতকগুলি বৃহৎ সৌধের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু বর্তমানকালে কতকগুলি আবিষ্কারের ফলে এই রাজার কৃতিত্ব সম্বন্ধে ধারণার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে।

জয়বর্মনের জীবনের প্রথম দিককার কথা এবং তাঁহার বংশ-পরিচয় বা পূর্বপুরুষদিগের সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা নাই। পরবর্তী যুগের একটি বংশ-তালিকায় দেখা যায় যে তাঁহার মাতামহী পূর্বোক্ত অনিন্দিতপুর ও শম্ভুপুর এই যুক্তরাজ্যের রাজা পুষ্করাক্ষের ভাগিনেয়ী ছিলেন এবং তাঁহার রাণী রুদ্রবর্মনের ভাগিনেয়ী ছিলেন। এই রুদ্রবর্মন সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। একটি বিবরণীতে জয়বর্মনের মাতুলকে রাজা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সব সম্বন্ধগুলি সত্য হইলেও জয়বর্মন সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী

ছিলেন কিনা সন্দেহ। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াও মনে হয় না।

তাঁহার সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে যাহা জানা যায় তাহাতে বুঝা যায় যে কিছুকাল তিনি জাভায় বাস করার পর কাম্বোজে ফিরিয়া আসেন। এই সময়ে কাম্বোজ জাভার অধীনে ছিল। তিনি কাম্বোজ দেশকে জাভার অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া ৮০২ খ্রীষ্টাব্দে এখানে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং যাহাতে আর জাভা রাজ্যের অধীনতা স্বীকার না করিতে হয় ও কাম্বোজে একজন সার্বভৌম রাজার প্রতিষ্ঠা হয় এই উদ্দেশ্যে তান্ত্রিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করাইবার জন্য যাদুশক্তির অধিকারী হিরণ্যদাম নামে এক ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ করেন। সম্ভবতঃ ভারত হইতে আগত এই ব্রাহ্মণ তান্ত্রিক অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করিয়া 'দেবরাজ' ধর্মপদ্ধতি স্থাপন করেন এবং এই সময় হইতে ইহাই রাজধর্ম রূপে গৃহীত হয়। হিরণ্যদাম রাজপুরোহিত শিবকৈবল্যকে এই ধর্মমতে দীক্ষিত করেন এবং রাজ আজ্ঞায় স্থির হয় যে এখন হইতে রাজপুরোহিত কেবল শিবকৈবল্যের বংশ হইতেই নির্বাচিত হইবে। এই ব্যবস্থা প্রায় ২৫০ বৎসর পর্যন্ত প্রচলিত ছিল, এবং একাদশ শতাব্দের মধ্যভাগে শিবকৈবল্যের এক বংশধর, দ্বিতীয় জয়বর্মনের সময় প্রথম যখন তাহাদের বংশ খ্যাতিলাভ করে, সেই সময় হইতে তাহার বংশের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে। প্রধানতঃ এই বিবরণী এবং আরও দুইটি অনুরূপ লেখ হইতেই দ্বিতীয় জয়বর্মন সম্বন্ধে সকল তথ্য জানা যায়। ইহাতে বর্ণা হইয়াছে যে রাজা প্রথমে ইন্দ্রপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। ইহার পরে রাজা দেশ জয়ে বাহির হ'ন ও পূর্বদেশের অর্থাৎ অঙ্কোর অঞ্চলের পূর্বাংশে পৌঁছান। এই সময়ে তাঁহার রাজধানী প্রথমে হরিহরালয়ে ও পরে অমরেন্দ্রপুরে স্থানান্তরিত হয়। তাহার পর রাজার আবাসস্থল মহেন্দ্র পর্বত নামে অভিহিত একটি পাহাড়ে স্থাপিত হয়। এইখানেই দেবরাজ ধর্মপদ্ধতি প্রচারিত হয়। পরে

তিনি হরিহরালয়ে ফিরিয়া আসেন এবং এই রাজধানী হইতেই মৃত্যু পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। ইন্দ্রপুর সম্ভবতঃ থ্‌বং খ্‌মুম্‌ প্রদেশে কম্পোং চনের পূর্বে অবস্থিত ছিল। হরিহরালয় অঙ্কোরথোমের তের মাইল দক্ষিণ-পূর্বে রলুয়স (Roluos)-এ অবস্থিত ছিল। অঙ্কোর-থোমের নিকটেই অমরেন্দ্রপুর অবস্থিত ছিল। অঙ্কোরথোমের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ফ্‌নোম কুলেন (Phnom Knlen) পর্বত মহেন্দ্র পর্বত নামে পরিচিত ছিল।

এইরূপে দেখা যায় যে জয়বর্মন ক্রমশঃ কাম্বোজের পূর্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিমপ্রান্তে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন ও শেষ পর্যন্ত অঙ্কোর অঞ্চলে ইহা স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিভিন্ন রাজধানীর নামোল্লেখ হইতে বুঝা যায় যে দ্বিতীয় জয়বর্মন সমস্ত কাম্বোজ দেশের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি ৮০২ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সময়ের মধ্যেই অঙ্কোর অঞ্চল প্রসিদ্ধি লাভ করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই ঘটনাবহুল কালের বিস্তৃত কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু পরবর্তী চারি শতাব্দী ধরিয়া কাম্বোজ রাজগণ কর্তৃক দ্বিতীয় জয়বর্মন মহৎ ও ক্ষমতাশালী রাজারূপে উল্লিখিত হইয়াছেন এবং ইহা হইতে বুঝা যায় তাঁহার রাজ্যকাল ও ব্যক্তিত্ব পরবর্তীযুগে কিরূপ গভীর শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছিল। কাল্পনিক কেতুমালের উপাখ্যানে তাঁহার স্মৃতি এখনও সংরক্ষিত আছে এবং কাম্বোডিয়ার প্রচলিত লৌকিক কাহিনীতে তাঁহাকে অঙ্কোর ভাট হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বৃহৎ মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া প্রচার করা হয়। বলা হয় যে প্রকৃতপক্ষে তিনি ইন্দ্রের পুত্র এবং তাঁহার পিতা তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিবার সময় তাঁহার সহিত একজন স্থপতিকে লইয়া আসেন। এই স্থপতি একজন অপ্সরার পুত্র ছিল এবং ইন্দ্রের সভায় দেবপুত্রদের কাছে স্থাপত্যবিদ্যা শিক্ষা করে। সেই কাম্বোজের সমস্ত সৌধগুলি নির্মাণ করে।

এখন পর্যন্ত রাজপ্রাসাদে রক্ষিত তরবারিটির সহিত জয়বর্মনের নাম সংশ্লিষ্ট এবং অভিষেককালে প্রত্যেক রাজা এই তরবারিটি ধারণ করেন। প্রাচীন ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত এক শ্রেণীর লোক ইহাকে দিবারাত্র পাহারা দেয়। ইহা খুবই সম্ভব যে দ্বিতীয় জয়বর্মন কতকগুলি উল্লেখযোগ্য সৌধ নির্মাণ করিয়াছিলেন, কারণ জাভায় অবস্থানকালে বড় বড় সৌধ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যে সমস্ত প্রসিদ্ধ সৌধগুলি এখন দেখা যায় তাহাদের কোনোটিকেই তাঁহার আমলের নির্মিত বলিয়া নির্দেশ করা যায় না।

সাধারণতঃ ঐতিহাসিকগণের ধারণা এই যে দ্বিতীয় জয়বর্মন সমস্ত কাম্বোজ দেশ জয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অধীনে অঙ্কোর অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া এক শক্তিশালী রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রচলিত কিংবদন্তী ছাড়া এই ধারণার সপক্ষে আর কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ যাবৎ যে সকল তথ্যাদি পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে এই অনুমান হয় যে তাঁহার রাজ্য পশ্চিমে অঙ্কোর অঞ্চল ও বাট্টামবাঙ্গের কিছু অংশ ও পূর্বে মেকং নদী অর্থাৎ ইন্দ্রপুর অঞ্চল অবধি ছিল। উত্তরে ইহার সীমানা ডংরেক পর্বত পর্যন্ত ছিল কিন্তু দক্ষিণে ইহা মেকং উপত্যকায় কোম্‌পং চাম (Compong Cham)-এর অক্ষাংশ (latitude) ছাড়াইয়া ওধারে বিস্তৃত হয় নাই। দ্বিতীয় জয়বর্মনের রাজ্যের ন্যায় কাম্বোডিয়ায় সেই সময় আরও কয়েকটি রাজ্য ছিল বলিয়া মনে করাই যুক্তিযুক্ত।

বিস্তৃত রাজ্য স্থাপন বা সুন্দর সুন্দর সৌধ নির্মাণে নহে, কিন্তু যে সময়ে সমস্ত কাম্বোডিয়া রাজ্য জাভা সাম্রাজ্যের পদানত ছিল সেই সময়ে সেইখানে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই পরবর্তীকালে জয়বর্মনের প্রসিদ্ধি লাভের কারণ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় জয়বর্মন ফুনানের পরিবর্তে কাম্বোজের প্রাচীন কিংবদন্তী প্রচলিত করেন। তিনি তাঁহার বংশকে সূর্যবংশ ও কম্বু হইতে উদ্ভূত বলিয়া দাবী করেন,—সোমবংশ বা কৌণ্ডিন্য হইতে নহে। তাঁহাকে রাজা কম্বু হইতে জাত সূর্যবংশের 'সম্মান-রক্ষক' এবং কম্বুজ-রাজেন্দ্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার রাণীর নাম বা উপাধি ছিল কম্বুজ-রাজলক্ষ্মী। তাঁহার পর হইতে রাজগণের উপাধি হইল কম্বুজেন্দ্র ও কম্বুজেশ্বর, এবং বিদেশীরাও এই দেশকে কম্বুজ বলিয়া উল্লেখ করিত।

৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় জয়বর্মনের মৃত্যু হয় ও তাঁহার পুত্র জয়বর্ধন জয়বর্মন নামে সিংহাসন আরোহণ করেন। তাঁহার সম্বন্ধে কেবল একটি বিষয় নিশ্চিত রূপে জানা যায়—তাঁহার হস্তি শিকারে অস্বাভাবিক আসক্তি। ৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় জয়বর্মনের বংশের সমাপ্তি হয়।

যদিও দ্বিতীয় ও তৃতীয় জয়বর্মনের রাজ্যকাল এক শতাব্দীরও কম ছিল তথাপি ইহা কাম্বোজের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। ৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত চীনা ইতিহাস হইতে জানা যায় যে চীনের দক্ষিণে অবস্থিত ইউনানের সীমানা পর্যন্ত সমস্ত মধ্য ইন্দোচীন খ্‌মের (khmer) রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। আরব লেখকরাও খ্‌মের রাজ্য বিশাল ও ক্ষমতাশালী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং এই রাজ্যের রাজা অন্যান্য রাজাদের উপর আধিপত্য করিতেন।

এইরূপে যে কম্বুজ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হইল, এক সময় সমস্ত ইন্দোচীন সেই সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল। বিজয়ী বীর হিসাবে দ্বিতীয় জয়বর্মনের যে খ্যাতি, তাহা হইতে অনুমান হয় যে এই রাজ্য বিস্তৃতি করণের অধিকাংশ কৃতিত্ব তাঁহারই প্রাপ্য, তবে তৃতীয় জয়বর্মনের অবদানও ইঁহাতে কিছু পরিমাণে আছে বলিয়া মনে হয়। ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ও অধীন কাম্বোজ দেশকে ইন্দোচীনের

সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতাশালী রাজ্যে পরিণত করা এই দুইজন রাজার পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নহে।

দ্বিতীয়তঃ এই সময়ে অঙ্কোর অঞ্চলে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়াতেই বিখ্যাত রাজধানী অঙ্কোর থোম প্রতিষ্ঠার সূচনা হইয়াছিল। পৃথিবীতে ইহার পূর্বে যতগুলি সাম্রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে অঙ্কোর থোমের তুল্য সৌষ্ঠবপূর্ণ রাজধানী তাহাদের মধ্যে অল্পই দেখা যায়।

তৃতীয়তঃ রাজধর্মরূপে দেবরাজ ধর্মপদ্ধতির প্রতিষ্ঠা এবং দ্বিতীয় জয়বর্মন দ্বারা রাজপুরোহিত বংশের প্রাধান্য দান রাজদরবারের একটি বৈশিষ্ট্য, এবং ইহার ফলস্বরূপ রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি কাম্বোজ দেশকে সুদূর প্রাচ্যের অন্যান্য হিন্দু উপনিবেশ হইতে পৃথক সত্তা দান করিয়াছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

কাম্বোজ সাম্রাজ্য

১। ইন্দ্রবর্মনের রাজবংশ

তৃতীয় জয়বর্মনের পরে ৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দ্রবর্মন সিংহাসন আরোহণ করেন। তিনি পৃথিবীন্দ্রবর্মনের পুত্র এবং মাতার দিক দিয়া নৃপতীন্দ্রবর্মনের বংশধর। রাজবংশ তালিকায় তাঁহাকে দ্বিতীয় জয়বর্মনের রাণীর দূর সম্পর্কের আত্মীয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার রাণী ইন্দ্রদেবীর সহিত পিতা ও মাতার দিক দিয়া ব্যাধপুর, শম্ভুপুর ও অনিন্দিতপুর এই তিনটি রাজ্যের রাজবংশের সম্পর্ক ছিল বলিয়া জনা যায়। এই রাণী পুস্করাক্ষের বংশধর ছিলেন এবং ইহার জন্যই ইন্দ্রবর্মন শম্ভুপুরের রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। রাজার কুলাচার্যের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ইন্দ্রবর্মন তৃতীয় জয়বর্মনের আইন-সংগত উত্তরাধিকারী ছিলেন একথা স্বীকার করা কঠিন। কি উপায়ে তিনি সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না তবে তিনি যে রাজবংশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নাই তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কারণ তাঁহার নিজের ও উত্তরাধিকারীদের প্রচারিত লেখগুলিতে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় জয়বর্মনের উল্লেখ যথেষ্ট সম্ভ্রম সহকারেই করা হইয়াছে এবং ইন্দ্রবর্মন দ্বিতীয় জয়বর্মনের মাতুলের পৌত্রকে নিজের গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন।

রাজা ও রাণীর বহুসংখ্যক আত্মীয়ের উল্লেখ হইতে সেই সময়ে কাম্বোডিয়ায় যে অনেকগুলি রাজ্যের অবস্থান ছিল তাহার আভাষ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় জয়বর্মন এইগুলি একত্রিত করিবার চেষ্টায় নিজেকে নিযুক্ত করেন। হরিহরালয়ে স্থাপিত রাজধানী হইতে রাজ্য শাসন আরম্ভ করিয়া ইন্দ্রবর্মন পূর্ববর্তীদের আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করিতে ব্রতী হ'ন। এই একত্রীকরণ অপেক্ষাও তিনি আরও অধিক

সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রবর্মনের বিবরণীতে দাবী করা হইয়াছে যে তাঁহার আদেশ চীন, চম্পা ও যবদ্বীপের রাজারা সসম্ভ্রমে পালন করিতেন। অবশ্য এই দাবি কতদূর সত্য তাহা নির্ণয় করিবার কোনও উপায় নাই।

ইন্দ্রবর্মন একজন বড় সৌধনির্মাতা ছিলেন। তাঁহার লেখতে বলা হইয়াছে যে সিংহাসন আরোহণ কালে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে পাঁচদিনের মধ্যেই সৌধনির্মাণ কার্য শুরু করিবেন। তিনি বহু মন্দির নির্মাণ করিয়া তাহাদের মধ্যে মুর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং অনেক পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্মিত মন্দিরগুলিতে একটি বিশেষ ধরনের স্থাপত্য কলার বিকাশ দেখা যায় এবং ইহাকে 'ইন্দ্রবর্মনের শিল্প' এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

ইন্দ্রবমনের পরে যশোবর্ধন ৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে যশোবর্মন নামে সিংহাসন আরোহণ করেন। বলা হইয়াছে যে শিবকৈবল্যের পৌত্র বামশিবের কাছে তিনি শিক্ষালাভ করেন এবং বহু শাস্ত্র ও কাব্য অধ্যয়ন করেন। তাঁহার রাজ্যকালে উৎকীর্ণ অনেকগুলি সংস্কৃত লেখ পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি সুদীর্ঘ ও উচ্চাঙ্গের কাব্য পদ্ধতিতে লেখা। ইহা হইতে ধর্মসংক্রান্ত ও সাধারণ এই উভয় ধরনের সংস্কৃত সাহিত্যই যে তাঁহার আনুকূল্য লাভ করিয়াছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাদের একটিতে রাজাকে বৈয়াকরণিক পাণিনির সহিত তুলনা করা হইয়াছে এবং তিনি পাণিনি রচিত মহাভাষ্যের একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি বহু মন্দির ও আশ্রম নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার লেখগুলিতে আশ্রম-বাসীদের প্রতি প্রযোজ্য নিয়ম কানুনগুলির বিস্তৃত নির্দেশ এবং হিন্দু আদর্শে গঠিত কাম্বোজ দেশের ধম বিষয়ক ও সাংসারিক জীবন যাত্রার সুস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়।

স্থল ও জলপথে উভয় ক্ষেত্রেই এই রাজা বীর যোদ্ধা বলিয়া

খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। আরও বলা হইয়াছে যে তিনি বহু বিতাড়িত রাজাকে পুনরায় নিজ নিজ দেশে স্থাপন করিয়াছিলেন ও তাঁহাদের কন্যাদের বিবাহ করিয়াছিলেন। ধর্মসংক্রান্ত ও সাহিত্য বিষয়ে উৎসাহ থাকা সত্ত্বেও তিনি বিস্তৃত পৈত্রিক রাজ্য রক্ষায় কৃতকার্য হইয়াছিলেন।

যশোবর্মন একটি নূতন স্থাপিত নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ইহা প্রথমে কম্বুপুরী ও পরে যশোধরপুর নামে পরিচিত হয়। রাজপ্রাসাদ যশোধরগিরি নামক পর্বতে অবস্থিত ছিল। এখন এই পর্বত ফ্‌নোম বাখেন (Phnom Bakhen) নামে পরিচিত; ইহা ঠিক অঙ্কোর থোমের দক্ষিণ প্রাচীরের বাহিরে অবস্থিত। বহুদিন পর্যন্ত পণ্ডিতগণের বিশ্বাস ছিল যে এই বিখ্যাত নগরটিই যশোবর্মন স্থাপিত নূতন রাজধানী। এই ধারণা এখন ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে অঙ্কোর থোমের অনেক অংশই ফ্‌নোম বাখেনের চতুষ্পার্শে বিস্তৃত যশোধরপুরের অন্তর্গত ছিল। যশোবর্মন-স্থাপিত নূতন রাজধানীর চতুষ্পার্শ্বস্থিত অঞ্চলেই কম্বুজ সাম্রাজ্যের ক্ষমতাপূর্ণ যুগের কেন্দ্র ছিল। এই কারণেই কম্বুজ রাজ্যের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় স্বরূপ অঙ্কোর সভ্যতার প্রতিষ্ঠার সম্মান তাঁহারই প্রাপ্য। সমস্ত রাজাদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্বের দিক দিয়া যশোবর্মন সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করেন; সকল দিক হইতে বিচার করিলে তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ রাজা বলিয়া গণ্য করা যায়। মৃত্যুর পরেও দেশবাসীরা 'প্রমোদে, শয়নে ও ভ্রমণে' সকল সময় যশোবর্মনের জয়গান গাহিত, সভাকবির এই উক্তি সম্ভবতঃ অতিরঞ্জিত নহে। ইন্দ্রবর্মন ও যশোবর্মনের রাজত্বকালে দ্বিতীয় জয়বর্মনের আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ হয়। কাম্বোজের রাজ্যগুলি একত্রিত ও সুসংবদ্ধ হয় এবং কাম্বোজ নামের দ্বারা একটি দেশ ও দেশবাসীকে নির্দেশ করার রীতি প্রচলিত হয়।

আঃ ৯০০ খ্রীষ্টাব্দে যশোবর্মনের মৃত্যু হয় ও তাঁহার দুই পুত্র প্রথম হর্ষবর্মন ও দ্বিতীয় ঈশানবর্মন পরপর সিংহাসন আরোহণ করেন। কিন্তু যশোবর্মনের এক ভগ্নীপতি চতুর্থ জয়বর্মন দ্বিতীয় ঈশানবর্মনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন ও তাঁহার জীবিত কালেই স্বাধীন রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত হন। এই ঘটনা ৯২১ খ্রীষ্টাব্দের কিছুকাল পূর্বে ঘটে। সাত বৎসর ধরিয়া এই দুইজনের মধ্যে রাজ্য বিভক্ত ছিল এবং ৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় ঈশানবর্মনের মৃত্যু হইলে চতুর্থ জয়বর্মন সমস্ত কাম্বোজ রাজ্যের রাজা হইলেন।

রাজত্বের শুরু হইতেই চতুর্থ জয়বর্মন অঙ্কোরের ৫০ মাইল উত্তর পূর্বে কোকের নামক এক অনুর্বর স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। দ্বিতীয় ঈশানবর্মনের মৃত্যুর পরেও কোকেরই কাম্বোজের রাজধানী ছিল এবং চতুর্থ জয়বর্মন এখানে অনেক মন্দির, কৃত্রিম জলাশয় ও অন্যান্য সৌধ প্রভৃতি নির্মাণ করেন। ৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয় ও তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় হর্ষবর্মন রাজা হ'ন। তাঁহার রাজ্যকাল অল্পদিন স্থায়ী হয়। এই সময়কার বিশেষ কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা জানা যায় না এবং ৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে যশোবর্মনের এক কনিষ্ঠা ভগ্নীর পুত্র রাজেন্দ্রবর্মন সিংহাসন লাভ করেন। যদিও বিশিষ্ট কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, তথাপি অনুমান করা হয় যে রাজেন্দ্রবর্মন পুনরায় যশোধরপুরে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন এবং প্রায় পঁচিশ বৎসরকাল যাবৎ পরিত্যক্ত নগরটি পুনরায় সুসজ্জিত করেন। রাজার দীর্ঘ প্রশস্তি সহ এই সময়কার অনেক লেখ পাওয়া যায় কিন্তু তাহাতে ঐতিহাসিক তথ্য বিশেষ কিছু নাই। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম, চতুর্দিকে তাঁহার জয়যাত্রার কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু এইসব বিজয় অভিযানের কোনও বিবরণ দেওয়া হয় নাই। তবে এইসব উক্তিকে শুধুমাত্র আস্ফালন বলা যায় না, কারণ তিনি চম্পা আক্রমণ করেন এবং কিছু পরিমাণে সফলতাও লাভ করেন বলিয়া জানা যায়।

৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রবর্মনের মৃত্যু হয় ও তাঁহার পুত্র পঞ্চম জয়বর্মন রাজা হন। তিনিও চম্পার বিরুদ্ধে আক্রমণমূলক নীতি অবলম্বন করেন এবং সমপরিমাণে সফলতা লাভ করেন। তাঁহার রাজ্যকালের বৈশিষ্ট্য বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য লাভ। পূর্বের ন্যায় শৈব ধর্মই রাজধর্ম রূপে প্রচলিত ছিল, কিন্তু এই রাজা বৌদ্ধশাস্ত্র বিস্তারের উদ্দেশ্যে বহু বিধি নির্দেশ প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য সৌধ নির্মাণ করেন। হেমশৃঙ্গগিরি তাহাদের অন্যতম। কিন্তু ইহার সঠিক সনাক্তকরণ এখনও হয় নাই। ১০০১ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চম জয়বর্মনের মৃত্যু হয়।

ইন্দ্রবর্মন ও তাহার পরবর্তী সাতজন রাজার একশত পঁচিশ বৎসর (৮৭৭—১০০১ খ্রীঃ) রাজত্বকাল কাম্বোজ সাম্রাজ্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। চীনা ইতিহাস হইতে ৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দোচীনের রাজনৈতিক অবস্থার যে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা হইতে কাম্বোজ রাজশক্তির বৃদ্ধি ও সাম্রাজ্য বিস্তারের কথা পরিষ্কার রূপে জানা যায়। উত্তরে টংকিন ও চীনের সীমান্ত অবধি লাওসের সমস্ত অংশ ইহার অধীনস্থ ছিল এবং ইহার নিরাপত্তার জন্য দুর্গ ও সামন্ত রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। এই রাজবংশের লেখগুলিতে চীন দেশকে রাজ্যের সীমানা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং ইন্দ্রবর্মন চীনের উপরে প্রাধান্যের দাবিও করেন। সম্ভবতঃ এই উক্তি প্রকৃত চীন দেশের প্রতি প্রযোজ্য নহে এবং দক্ষিণ চীনে ইউনানে অবস্থিত থাই রাজ্যের নির্দেশ করে। ইহা খুবই স্বাভাবিক যে এই রাজ্যের বিরুদ্ধে কম্বুজের রাজগণ কিছু পরিমাণে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। শ্যাম দেশেও কাম্বোজের প্রভুত্ব বিস্তৃত হইয়াছিল। দক্ষিণে শ্যাম উপসাগর ও উত্তরে কামফেং ফেট (Kampheng Phet) পর্যন্ত বিস্তৃত লোপবুরি (Lopburi) নামক অঞ্চল কাম্বোজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই অঞ্চলের উত্তরে অবস্থিত ছোট ছোট রাজ্যগুলিতেও কাম্বোজ রাজাদের প্রভুত্ব বিস্তৃত হইয়াছিল। এই রাজ্যগুলির একেবারে

উত্তর সীমায় অবস্থিত রাজ্যের নাম ছিল খ্‌মের রাষ্ট্র। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে প্রায় সমস্ত মেনাম উপত্যকায় কাম্বোজ প্রভুত্ব বিস্তার লাভ করিয়াছিল। মলয় উপদ্বীপের উত্তর অংশে ক্রা (Kra) প্রণালী পর্যন্ত কাম্বোজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই বিস্তৃত সাম্রাজ্য পরিচালনার শাসনভার বহু অভিজাত বংশের হস্তে ন্যস্ত ছিল। এই সব বংশের লোকেরা বিভিন্ন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন, কিন্তু সর্বোচ্চপদগুলিতে রাজবংশের ব্যক্তিরা নিযুক্ত হইতেন।

২। প্রথম ও দ্বিতীয় সুর্যবর্মন

পঞ্চম জয়বর্মনের মৃত্যুর পর দশ বৎসর যাবৎ গৃহযুদ্ধ ও সিংহাসনের অধিকার লইয়া বিরোধ চলিতে থাকে। উদয়াদিত্যবর্মন, সূর্যবর্মন ও জয়বীরবর্মন, সিংহাসনের এই তিনজন দাবিদারের মধ্যে মনে হয় কেহই আইনতঃ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ছিলেন না, কিন্তু তিনজনেই নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে তিনজনেই রাজ্যের বিভিন্ন অংশে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। অল্পদিনেই উদয়াদিত্যবর্মন অপসারিত হইলেন, কিন্তু ১০১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অপর দুইজনের মধ্যে সংগ্রাম চলিতে লাগিল এবং ইহার পরে সূর্যবর্মন রাজ্যে নিজের অপ্রতিহত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি ১০০২ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন বলিয়া দাবি করেন। সম্ভবতঃ এই সময় উদয়াদিত্যবর্মনের মৃত্যু হয় বা তিনি সিংহাসনের দাবি ত্যাগ করিয়া সরিয়া যান।

সূর্যবর্মনের জীবনের প্রথমদিককার কথা নিশ্চিতরূপে কিছু জানা যায় না। সরকারী বংশ তালিকা হইতে জানা যায় যে তিনি ইন্দ্রবর্মনের মাতার বংশে এবং তাঁহার রাণী বীরলক্ষ্মী যশোবর্মনের বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। অন্যান্য প্রাচীন রাজবংশগুলির সহিতও তাঁহার সম্পর্কের উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু ইহা হইতে তাঁহাকে সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া মনে করা যায় না। অপরপক্ষে শ্যামদেশে প্রাপ্ত পরবর্তীকালের ইতিহাস হইতে জানা

যায় যে তিনি উত্তর মলয় উপদ্বীপের এক রাজার পুত্র ছিলেন, এবং প্রথমে মেনাম উপত্যকার নিম্নাংশে অবস্থিত লোপবুরি এবং পরে কাম্বোডিয়া রাজ্য অধিকার করেন। যাহা হউক একথা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে তাঁহার রাজত্বের প্রথম দিকে বহুদিনব্যাপী গৃহযুদ্ধ চলিয়াছিল এবং বহু যুদ্ধে তাঁহাকে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। নিজেকে সুরক্ষিত ও ভবিষ্যতে বিদ্রোহ বন্ধ করিবার জন্য রাজা এক অভিনব প্রথা প্রচলিত করেন। তিনি চারি হাজারের অধিক জিলা-শাসনকর্তাদিগকে যজ্ঞীয় অগ্নি, ব্রাহ্মণ ও আচার্যদের সাক্ষী করিয়া শপথ গ্রহণ করাইলেন যে তাহারা আজীবন রাজার প্রতি অবিচল ভক্তি ও আনুগত্য রক্ষা এবং রাজকার্যে জীবন উৎসর্গ করিবে। এই সমস্ত কর্মচারীরা ঈশ্বরের নামে শপথ করিল যে তাহারা 'অন্য কোনও রাজাকে মানিবে না, এই রাজার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না এবং কোনও শত্রুকে সাহায্য করিবে না।' এখানে উল্লেখযোগ্য যে বর্তমানকালেও রাজার অভিষেকের সময় কাম্বোডিয়ার রাজকর্মচারীরা প্রায় এই একই ধরনের শপথ গ্রহণ করে।

অনুমান হয় যে প্রথম সূর্যবর্মন দৃঢ় রূপেই উত্তর শ্যামে কাম্বোজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং একজন কাম্বোজ প্রধানকে ঐ দেশের শাসক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে মেনাম উপত্যকায় খ্মের (khmer) শিল্প ও সংস্কৃতি দৃঢ়রূপে স্থাপিত হইল এবং খ্মের সভ্যতা উত্তরে সুখোদয় ও সভঙ্কলোক পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। কতকগুলি প্রমান হইতে ধরিয়া লওয়া যায় যে সূর্যবর্মন সমস্ত শ্যাম ও বর্মা দেশের নিম্নাংশ জয় করেন। তবে এই যুদ্ধযাত্রা বা তাহার ফলাফল সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না।

যুদ্ধে ও রাজ্যশাসনে সূর্যবর্মনের সমান দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ভাষ্য, কাব্য, ষড়দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্মে অনুরাগী ছিলেন কিন্তু কুলধর্ম পরিত্যাগ করেন

নাই এবং শৈব ও বৈষ্ণব উভয় ধর্মের উদ্দেশ্যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আশ্রমের নিয়ম কানুন সম্বন্ধে তিনি অনেকগুলি লেখ প্রচার করেন এবং ইহাতে স্পষ্টভাবে লিখিত আছে যে সাধু ও বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তাহাদের পুণ্যকার্যের ফল রাজার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিবে।

১০৫০ খ্রীষ্টাব্দে সূর্যবর্মনের মৃত্যু হইলে তাঁহার মন্ত্রীরা দ্বিতীয় উদয়াদিত্য বর্মনকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে সিংহাসনে উদয়াদিত্যের প্রকৃত কোনও দাবি ছিল না, কিন্তু রাজ্যের এক বিশেষ দলের প্রভাবে তিনি রাজ্যলাভ করেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই এই রাজার সমস্ত রাজ্যকাল ধরিয়া অনবরত বিদ্রোহ দেখা দেয়। একটি বিবরণী হইতে এই সব বিদ্রোহগুলির মধ্যে তিনটি বিদ্রোহের ও প্রধান সেনাপতি সংগ্রামের দ্বারা তাহাদের দমনের বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। কৃতজ্ঞ রাজা বিশ্বস্ততার জন্য সংগ্রামকে উপযুক্তরূপে পুরস্কৃত করেন। বারবার চামদের আক্রমণের জন্য রাজাকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। চাম সেনাপতি যুবরাজ মহাসেনাপতি কাম্বোজ সৈন্যদের পরাস্ত করে, মেকং-এর তীরে অবস্থিত শম্ভুপুর অধিকার করে এবং মন্দিরগুলি ধ্বংস করে। কিন্তু এই সকল গোলমাল সত্ত্বেও রাজা উদয়াদিত্য রাজধানীর পশ্চিম দিকে যশোধরতটাক অপেক্ষাও বৃহৎ এক সরোবর খনন করেন। ইহা প্রায় পাঁচ মাইল দীর্ঘ এবং অর্ধমাইল প্রশস্ত। ইহাই বর্তমান কালের পশ্চিম বরয় (Western Baray)।

এই রাজা একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া মনে হয়। রাজপুরোহিত জয়েন্দ্র পণ্ডিত তাঁহাকে জ্যোতিষ, গণিত, ব্যাকরণ, ধর্মশাস্ত্র ও অন্যান্য সকল শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। শংকর পণ্ডিত নামে রাজার আরও একজন গুরু ছিলেন। কথিত আছে যে রাজা জম্বুদ্বীপে (ভারতবর্ষ) দেবতাদের আবাস স্থল সুমেরু পর্বতের অনুরূপ একটি স্বর্ণ পর্বত রাজধানীতে নির্মাণ করেন ও পর্বতের চূড়ায়

একটি সোনার মন্দির তৈয়ারি করিয়া সেখানে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। শংকরপণ্ডিত রাজসভায় বিশেষ প্রভাব লাভ করিয়াছিলেন, কারণ বলা হইয়াছে যে ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে উদয়াদিত্য বর্মনের মৃত্যু হইলে শংকর পণ্ডিত ও মন্ত্রীদের সম্মতিক্রমে রাজার অনুজ হর্ষবর্মনকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

তৃতীয় হর্ষবর্মনের সহিত তাঁহার রাজ্যের পূর্বে অবস্থিত দুই শক্তিশালী রাজ্য আনাম ও চম্পার সহিত যুদ্ধ বাধে। প্রথমোক্ত রাজ্যটি টনকিন ও বর্তমান আনাম (ভিয়েৎনাম) দেশের উত্তরাংশের দুইটি প্রদেশ লইয়া গঠিত ছিল, এবং ইহা দশম শতাব্দে চীনদেশের অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করে। ১০৭৬ খ্রীষ্টাব্দে চীন সম্রাট আনামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে চম্পা ও কাম্বোজের রাজাকে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ জানান। তাঁহারা সৈন্য পাঠান কিন্তু চীনাদের পরাজয় হওয়াতে ইহারা ফিরিয়া আসে। ইহার অল্পদিন পরেই কাম্বোজ ও চম্পা রাজ্যের মধ্যে বিবাদ দেখা দেয়। ১০৮০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্বে সোমেশ্বরের রণক্ষেত্রে গুরুতর যুদ্ধ হয়। কাম্বোজ সৈন্য পরাজিত হয় এবং তাহাদের সেনাপতি কুমার শ্রী নন্দনবর্মদেব বন্দী হ'ন।

তৃতীয় হর্ষবর্মনের পরে ১০৮০ খ্রীষ্টাব্দে ষষ্ঠ জয়বর্মন রাজা হন। পূর্ববর্তী রাজাগণের সহিত তাঁহার কি সম্পর্ক ছিল তাহার কিছুই জানা যায় না। পরবর্তী কালের লেখগুলিতে তাঁহাকে মহীধর-পুরের উচ্চবংশজাত বলিয়া বলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ তিনি একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন এবং রাজ্যের আভ্যন্তরিক গোলযোগ ও কেন্দ্রীয় ক্ষমতার দুর্বলতার সুযোগে সিংহাসন অধিকার করেন। অঙ্কোরে জয়বর্মন রাজত্ব করিয়াছিলেন কিনা তাহা নিশ্চিত জানা যায় না। বরং, এই অঞ্চলে ১১১৩ খ্রীষ্টাব্দ অবধি নৃপতীন্দ্রবর্মন রাজত্ব করিতেন বলিয়াই মনে হয়। ১১০৭ খ্রীষ্টাব্দে ষষ্ঠ জয়বর্মনের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার অগ্রজ প্রথম ধরণীন্দ্রবর্মন রাজা হন। ইহাকে

ইহার ভাগিনেয়ীর পুত্র দ্বিতীয় সূর্যবর্মন পরাজিত করিয়া ১১১৩ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

দ্বিতীয় সূর্যবর্মন কাম্বোজের শ্রেষ্ঠ রাজাদের অন্যতম ছিলেন। খুব সম্ভব তৃতীয় হর্ষবর্মনের বংশধর প্রতিদ্বন্দ্বী নৃপতীন্দ্রবর্মনকে পরাজিত করিয়া আবার তিনি রাজ্যের একতা প্রতিষ্ঠিত করেন। অষ্টম শতাব্দের পর হইতে চীনের সহিত সকল রকম রাজনৈতিক সম্বন্ধের অবসান হইয়াছিল। তিনি পুনরায় ইহা প্রচলিত করেন এবং ১১১৬ ও ১১২০ খ্রীষ্টাব্দে দুইবার সম্রাটের দরবারে দূত পাঠান। চীন সম্রাট কাম্বোজের রাজাকে নানাবিধ সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত করেন। এই উপলক্ষে চীনা গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে এই সময় ব্রহ্মদেশের নিম্নাংশ ও মলয় উপদ্বীপের উত্তরাঞ্চল কাম্বোজ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। চীনাদের গ্রন্থে উচ্চ রাজহর্ম্যের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা ও রাজার ২০০,০০০ সংখ্যক যুদ্ধের হাতি ছিল বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়।

সূর্যবর্মন গুরু দিবাকর পণ্ডিতের আদেশ অনুযায়ী কোটিহোম, লক্ষহোম, মহাহোম, ও আরও নানা ধরনের যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তিনি বিষ্ণুভক্ত ছিলেন এবং বিশ্বের বিস্ময়কর সৃষ্টির মধ্যে অন্যতম বিখ্যাত অঙ্কোর ভাট নির্মান করিয়া অবিস্মরণীয় খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। এই চমৎকার বৃহদায়তন সৌধটি ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশে নির্মিত এবং ইহার প্রাচীর গাত্রে রাজা ও রাজসভা, তাঁহার বিজয় অভিযান, শিকারের দৃশ্য ইত্যাদি খোদিত হইয়াছে।

কাম্বোজ লেখগুলিতে সূর্যবর্মনের জয়যাত্রা ও শত্রুপক্ষের রাজাদের বিরুদ্ধে জয়লাভের কথা গৌরব সহকারে বর্ণিত হইয়াছে। আরও বলা হইয়াছে যে অন্যান্য যে সব দ্বীপ রাজা জয় করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেইসব দ্বীপের রাজগণ স্বেচ্ছায় তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করেন।

কিন্তু আনাম ও চম্পার বিরুদ্ধে এই রাজার যুদ্ধযাত্রা বিপত্তিতে পরিণত হয়। তিনি ১১২৮ খ্রীষ্টাব্দে আনামের বিরুদ্ধে একটি

সেনাদল ও নৌবাহিনী পাঠান কিন্তু প্রথম প্রথম কিছু সাফল্য লাভ করিলেও তাহারা শেষ পর্যন্ত ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। পরে ১১৩২ ও ১১৩৭ খ্রীষ্টাব্দে আরও দুইবার অনুরূপ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

সূর্যবর্মন প্রথম দিকে চম্পায় বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন এবং ইহার উত্তরাংশে অবস্থিত বিজয় রাজ্য প্রায় কাম্বোজের অধীনস্থ রাজ্য রূপে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু দক্ষিণ চম্পার নূতন রাজা জয়হরিবর্মন যে কাম্বোজ সৈন্যদের পরাজিত এবং সমস্ত চম্পা রাজ্যে তাঁহার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। হরিপুঞ্জের (Lampun) মোন রাজবংশীয় এক রাজা লোবো (Lobo) নামে কাম্বোজ সাম্রাজ্যের অধীনস্থ অঞ্চল আক্রমণ করেন। এই রাজার বিরুদ্ধে যে সূর্যবর্মন দুইবার সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ আছে, কিন্তু খ্মেরে সৈন্যেরা এই রাজ্যের রাজধানী পর্যন্ত অগ্রসর হইলেও মোন রাজা, সম্ভবতঃ আদিত্যরাজ, তাহাদের বাধা দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে চীনা বিবরণ অনুসারে দ্বাদশ শতাব্দের মধ্যভাগে কাম্বোজ সাম্রাজ্য বর্মাদেশের পাগান ও মলয় উপদ্বীপে ব্যণ্ডোন উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

১১৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সূর্যবর্মন সম্বন্ধে শেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহার পরেও কয়েক বৎসর তিনি রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার পরে দ্বিতীয় ধরণীন্দ্রবর্মন রাজা হ'ন, কিন্তু ইঁহার সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। পরবর্তী রাজার নান দ্বিতীয় যশোবর্মন। ইঁহাকে একটি বিদ্রোহের সম্মুখীন হইতে হয়। স্পষ্টই বুঝা যায় যে এই বিদ্রোহ এক সময়ে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হইয়াছিল, কারণ বলা হইয়াছে যে বিদ্রোহীরা রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত আক্রমণ করে এবং রাজধানীতে অবস্থিত রাজপক্ষের সৈন্যরা পলায়ন করে। ভবিষ্যৎ রাজা সপ্তম জয়বর্মনের পুত্র কুমার শ্রীন্দ্রকুমার রাজার উদ্ধারার্থে

অগ্রসর হ'ন। তিনি নিজে বিদ্রোহীদের সহিত যুদ্ধ করেন এবং তাহাদের পরাজিত করেন।

এই যুদ্ধ উপলক্ষেই প্রথম 'সঞ্জক' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ইহা রাজা বা রাজপুত্রের দেহরক্ষা কার্যে নিযুক্ত এবং তজ্জন্য বিশেষ শপথ বা অঙ্গীকার দ্বারা আবদ্ধ কোন প্রধান ব্যক্তিকে নির্দেশ করে। যখন কুমার শ্রীন্দ্রকুমার বিদ্রোহীদের সহিত যুদ্ধ করিতে যান তখন দুইজন সঞ্জক তাঁহার দেহরক্ষা করিতেছিল এবং রাজপুত্রের সম্মুখেই এই দুইজনের মৃত্যু হয়। তাহাদের উপকারের প্রতিদানে রাজা উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশে নানারূপ সম্মান সূচক উপাধি দান করা হইল ও মন্দিরে তাহাদের মূর্তি স্থাপন করা হইল। লেখতে দেবতা বলিয়া এই দুই মূর্তির উল্লেখ থাকাতে মনে হয় যে রাজাদের ন্যায় ইহাদিগের উপরেও দেবত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। তাহাদের পরিবারবর্গকে যে রাজা ধনসম্পত্তি, সম্মান ও প্রীতিতে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, সেকথা বলা বাহুল্য।

এই বিদ্রোহ রাজ্যের ঐক্যের বিশেষ ক্ষতি করে নাই। কারণ যশোবর্মনের ইহার পরেও চম্পার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সামর্থ্য ছিল এবং শ্রীন্দ্রকুমারই এই যুদ্ধে নেতৃত্ব করেন। প্রথমে তিনি সাফল্য লাভ করেন। চম্পার রাজা জয় ইন্দ্রবর্মন কর্তৃক নির্মিত ভেক (Vek) পর্বতের উপরে অবস্থিত দুর্গটি তিনি দখল করেন এবং সেই রাজ্যে তাঁহার মনোনীত একজন চাম সেনাপতিকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু পুনর্গঠিত চাম সেনাদল শ্রীন্দ্রকুমারকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলে। এবারেও দুইজন সঞ্জক নিজেদের জীবন দান করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করে এবং পূর্বের ন্যায় রাজা এই দুই মৃত বীরকে সম্মান দান করেন ও তাহাদের মূর্তি তৈয়ারী করিয়া মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। কুমার সসৈন্যে নিরাপদে রাজ্যে ফিরিয়া আসেন, কিন্তু এই যুদ্ধযাত্রা শোচনীয় ব্যর্থতায় পরিণত হয়।

কুমার শ্রীন্দ্রকুমারের অল্প বয়সেই মৃত্যু হয় এবং তাঁহার মূর্তি তাঁহার চারিজন অনুগত সঙ্গকের মূর্তির সহিত একই মন্দিরে স্থাপিত হয়।

চম্পার সহিত যুদ্ধ শেষ হইল না, এবং ভবিষ্যৎ রাজা সপ্তম জয়বর্মনের অধিনায়কত্বে আর একটি অভিযান বিজয়ের (মধ্যচম্পা) বিরুদ্ধে পাঠানো হইল। এই রময় রাজসেনাদলের চম্পায় অবস্থিতির সুযোগে ত্রিভুবনাদিত্যের নেতৃত্বে কাম্বোজে আর একটি বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই খবর পাইবামাত্র জয়বর্মন সেনাদল লইয়া কাম্বোজে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু তাহার পূর্বেই দিতীয় যশোবর্মন পরাজিত ও নিহত এবং ত্রিভুবনাদিত্য সিংহাসন আরোহণ করিয়াছেন। ইহা ১১৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ঘটে।

কাম্বোজের নূতন রাজার সহিত অনেকদিন ধরিয়া চম্পার যুদ্ধ চলে ও ইহার পরিণাম অতিশয় শোচনীয় হয়। ১১৭০ খ্রীষ্টাব্দে চম্পার রাজা জয় ইন্দ্রবর্মন কাম্বোজ আক্রমণ করেন এবং সাত বৎসর ধরিয়া এই যুদ্ধ চলে। কিন্তু ইহার কোনরূপ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় না। অবশেষে চামরাজ একটি নৌবাহিনী সুসজ্জিত করিয়া ১১৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কাম্বোজের বিরুদ্ধে জলপথে যুদ্ধযাত্রা করেন। মেকং নদী দিয়া নৌবাহিনী রাজধানীতে পৌঁছায় এবং জয় ইন্দ্রবর্মন রাজধানী লুঠপাট করিয়া বহু লুণ্ঠিত দ্রব্যসহ ফিরিয়া আসেন। কাম্বোজের লেখ অনুসারে এই যুদ্ধে ত্রিভুবনাদিত্য বর্মনের মৃত্যু হয় কিন্তু জয়বর্মনের বীরত্বের জন্য কাম্বোজ দেশ রক্ষা পায়। একটি নৌযুদ্ধে তিনি চামদের পরাজিত করেন এবং চারি বৎসর পরে নিজে কাম্বোজ রাজ্য অধিকার করেন। জয়বর্মন দ্বিতীয় ধরণীন্দ্রবর্মন ও তৃতীয় হর্ষবর্মনের কন্যা চূড়ামনির পুত্র।

৩। মহান সম্রাট সপ্তম জয়বর্মন

১১৮১ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তম জয়বর্মনের সিংহাসন আরোহণ কাল হইতে কাম্বোজ দেশের ইতিহাস আবার স্পষ্ট ভাবে জানা যায়।

তিনিই কাম্বোজের শেষ বিখ্যাত রাজা এবং তাঁহার বিভিন্ন যুদ্ধযাত্রা, ধর্মসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান ও জনহিতকর কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়।

কাম্বোজের চিরকালের শত্রু চম্পার বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি বিশেষ সাফল্য লাভ করেন। আগেই বলা হইয়াছে যে তিনি চম্পা আক্রমণ করেন ও সেখানকার রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার স্থানে নিজের মনোনীত এক ব্যক্তিকে স্থাপিত করেন। ইহার পরে বহুদিন পর্যন্ত চম্পা কাম্বোজের অধীন ছিল।

সপ্তম জয়বর্মন আর একটি পুরাতন শত্রু আনামাইটদের সহিতও যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি আনাম আক্রমণ করেন। ১২০৭ হইতে ১২১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ চলিতে থাকে কিন্তু কোনরূপ চূড়ান্ত মীমাংসা হয় না। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যে কাম্বোজ সেনাদল আনামে যুদ্ধে নিয়োজিত ছিল তাহাদের মধ্যে চম্পা ছাড়া শ্যাম ও পুগান অর্থাৎ বর্মাদেশের সেনাদলও ছিল।

সপ্তম জয়বর্মনের সাম্রাজ্য সমৃদ্ধিশালী ছিল, কিন্তু ১১৯০ খ্রীষ্টাব্দে হইতে চম্পা ও আনামের সহিত দীর্ঘদিনব্যাপী সংগ্রামের ফলে রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়িল এবং জনসাধারণের পক্ষেও ইহা অসহ্য হইয়া উঠিল। এই সময়ে থাইরা শ্যামে দ্রুত শক্তি সঞ্চার করায় কাম্বোজের পক্ষে ভয় ও আশঙ্কার কারণ হইল এবং ইহাতে এই রাজ্যের অবস্থা আরও শোচনীয় হইল। এই সমস্ত কারণে শেষ পর্যন্ত কাম্বোজ সৈন্য ১২২০ খ্রীষ্টাব্দে চম্পা পরিত্যাগ করিল ও দুই বৎসর পরে দুই দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। চম্পা হইতে কম্বুজ সৈন্যদের চলিয়া আসা পর্যন্ত সপ্তম জয়বর্মন জীবিত ছিলেন কিনা তাহা জানা যায় না, কারণ তাঁহার মৃত্যুর ঠিক সময় নির্দেশ করিবার মত কোনও উপাদান পাওয়া যায় নাই। তবে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ অবধি যে তিনি জীবিত ছিলেন তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায়, কারণ এই বৎসর তিনি চীনে দূত পাঠান। সম্ভবতঃ তিনি ১২১৮ খ্রীষ্টাব্দ

অবধি রাজত্ব করেন। তবে চম্পা জয়ের কৃতিত্ব তাঁহারই প্রাপ্য। বহুকালব্যাপী সংগ্রামের পরে জয়লাভের ফলে তাঁহার সাম্রাজ্যের পূর্বদিকের সীমানা চীন সাগর অবধি বিস্তৃত হইয়াছিল। রাজ্যের পশ্চিমদিকে অভিযানের ফলেও জয়বর্মন যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন এবং মলয় উপদ্বীপ ও নিম্ন বর্মা অঞ্চলের বেশ কিছু অংশ জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যকালেই কাম্বোজ সর্বাপেক্ষা বিস্তৃতি লাভ করে এবং বর্মার উপরের অংশ, টনকিন, ও মলয় উপদ্বীপের দক্ষিণ অঞ্চল ব্যতীত সমস্ত ইন্দোচীন তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

সপ্তম জয়বর্মন তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের উপযুক্ত একটি রাজধানী স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। ইহাই বিখ্যাত অঙ্কোর থোম (নগর ধাম?)। সমস্ত শহরটি একটি উচ্চ প্রস্তরের প্রাচীর দিয়া বেষ্টিত এবং তাহার বাহিরে ১১০ গজ চওড়া পরিখা অবস্থিত। প্রাচীরের ন্যায় এই পরিখার চতুর্দিকের মিলিত দৈর্ঘ্য প্রায় সাড়ে আট মাইল এবং পরিখার ধারগুলি বিশাল প্রস্তরখণ্ড দ্বারা বাঁধানো। নগরে প্রবেশের জন্য পাঁচটি বিরাট তোরণ ছিল এবং প্রত্যেক তোরণ হইতে একটি ১০০ ফিট প্রশস্ত সোজা রাস্তা নগরের একধার হইতে অন্যধার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রত্যেকটি তোরণ ৩০ ফিট উচ্চ ও ১৫ ফিট চওড়া খিলান যুক্ত। খিলানের উপরে চারিদিকে মুখ করিয়া চারিটি দেবতা বা মনুষ্য মূর্তির মস্তক স্থাপিত। নগরটি চতুষ্কোণ ও প্রতিটি পার্শ্বের দৈর্ঘ্য প্রায় দুই মাইল। প্রশস্ত পথগুলি প্রায় নগরের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত বেয়ন মন্দিরাভিমুখে গিয়াছে। এই মন্দিরটিকে কাম্বোজের স্থাপত্য শিল্পের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া গণ্য করা হয়। বেয়ন মন্দিরের উত্তরে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য একটি প্রাঙ্গণ অবস্থিত, ইহা দৈর্ঘ্যে ৭৬৫ গজ ও প্রস্থে ১৬৫ গজ এবং ইহার চতুর্দিকে কতকগুলি বিখ্যাত গৃহ যথা বফুওন (Baphuon), ফিমেনাক (Phimeanakas),

নাই। তবে এই বিবরণগুলি হইতে কাম্বোজ সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। মনে হয় যে রাজ্যের উত্তর ও পশ্চিম অংশে দক্ষ সেনানায়কদের অধীনে সম্মিলিত হইয়া থাইরা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শ্যামে বিদ্রোহ করে। আঃ ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দ্রদিত্য নামে এক থাই প্রধান সুখোদয় নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১২৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গল কুবলাই খাঁ কতৃক থাই রাষ্ট্র ইউনান অধিকৃত হওয়ায় বহুসংখ্যক থাই ইউনান হইতে পলাইয়া নব প্রতিষ্ঠিত সুখোদয় রাজ্যে ও অন্যান্য থাই রাষ্ট্রে আশ্রয় লয়। ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে সুখোদয়ের রাজা রাম কামহেঙ্গ একজন বিজয়ী বীর ছিলেন। তিনি পশ্চিমে নিম্নবর্মা ও পূর্বে কাম্বোজের মধ্যভাগ পর্যন্ত আক্রমণ করেন। ইহারই অল্পদিন পরে চেউ-তা-কুয়ান (Cheu-ta-Kuan) কাম্বোজে আসেন এবং তাঁহার বিবরণী হইতে জানা যায় যে শ্যামবাসীদের সহিত যুদ্ধের ফলে অঙ্কোর অঞ্চল বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। তবে চীনা ইতিবৃত্ত হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে তখন পর্যন্ত কাম্বোজ একটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল এবং রাজ্য জয় করা অপেক্ষা লুঠপাট করাই থাই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল। থাইদের সুখোদয়ের রাজ্য অল্পদিনেই বিলুপ্ত হয় এবং আঃ ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে এক নূতন থাই বংশ অযোধ্যা (Ayuthia) রাজ্য স্থাপন করে এবং অল্পদিনের মধ্যেই প্রায় সমস্ত শ্যাম ও লাওস দখল করে। কাম্বোজ রাজ্যের পূর্ব দিকে আনামাইটরা পঞ্চদশ শতাব্দের মধ্যে প্রায় সমস্ত চম্পা রাজ্য জয় করে। রাজ্যের দুই পার্শ্ব হইতে দুইটি শক্তিশালী থাই রাজ্য কাম্বোজ রাজ্যকে আক্রমণ করিয়া ক্রমশঃ এই রাজ্যের অন্তর্গত প্রদেশগুলি দখল করিতে থাকে। এইরূপে রাজ্যের দুইদিক হইতে একই সময়ে আক্রমণের ফলে কাম্বোজ রাজ্যের ধ্বংস হয়। ইহার দুর্বল অসহায় রাজারা দুই শক্তিশালী শত্রুকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিলেন

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই চেষ্টার ফলে নিজেদেরই সর্বনাশ ঘনাইয়া আসিল। কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত কাম্বোজ রাজ্য তাহার এই দুইটি নিষ্ঠুর প্রতিবেশী রাজ্যেরই লক্ষ্যস্থল হইয়া রহিল। ক্রমশঃ কাম্বোজ একটি ছোট রাজ্যে পরিণত হইল। অবশেষে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহার ক্ষমতা ও সম্মানহীন রাজা আঙ্গডুওঙ্গ ফরাসীদের শরণাপন্ন হইলেন এবং ভূতপূর্ব বিখ্যাত শক্তিশালী কাম্বোজ সাম্রাজ্য ফরাসীদের অধীনস্থ সামান্য রাজ্যরূপে পরিণত হইল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কাম্বোজ আবার এক স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়

কাম্বোজের হিন্দু সংস্কৃতি

কাম্বোজের হিন্দু ঔপনিবেশকরা ভারতীয় আদর্শ অনুযায়ী কাম্বোজে অতি সুশৃঙ্খল শাসন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি রাজনৈতিক গ্রন্থ এখানে নিয়মিত পঠিত হইত এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রায়ই অনুসরণ করা হইত।

রাজার অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল এবং তাঁহাকে দেবতার অংশ বলিয়া দাবি করা হইত। রাজার অধীনে মন্ত্রীগণ ও একদল সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারী রাজকার্যের জন্য নিযুক্ত ছিল। লেখগুলিতে এইসব কর্মচারীর একটি দীর্ঘ তালিকা পাওয়া যায়। তবে তাহাদের কার্যের বিষয় বা পদমর্যাদা নিরূপণ করা সব সময়ে সম্ভব হয় না। চীনা বিবরণগুলিতে রাজসভার জাঁকজমক ও বিচিত্র অনুষ্ঠানাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতের মত এখানে মন্ত্রীদের ও অন্যান্য উচ্চ রাজকর্মচারীদের পদ প্রায় বংশানুক্রমিক ছিল।

সমস্ত রাজ্য এক একটি শাসকের অধীনে অনেকগুলি জেলায় বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক শাসকের আবাসস্থল এক একটি শহরে স্থাপিত ছিল। এখানে বহু নগর অবস্থিত ছিল এবং ইহাদের অনেকগুলির নাম ভারতবর্ষের নগরের অনুকরণে ছিল, যথা—তাম্রপুর, আঢ্যপুর, ধ্রুবপুর, জ্যেষ্ঠপুর, বিক্রমপুর, উগ্রপুর প্রভৃতি। অনেক নগরের নামকরণ তাহাদের প্রতিষ্ঠাতা রাজার নামানুসারে হইত যথা শ্রেষ্ঠপুর, ভবপুর, ঈশানপুর, প্রভৃতি।

নগরগুলি প্রাচীর ও পরিখা দ্বারা বেষ্টিত থাকিত, এবং ইহাদের মধ্যে বড় বড় সরোবর থাকিত। অনেক নগরেই জনসাধারণের হিতকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ ছিল যথা বিপ্রশালা (পণ্ডিতসভা ?), সরস্বতী (বিদ্যালয়), পুস্তকাশ্রম (লাইব্রেরি), সত্র (অতিথিশালা),

ও আরোগ্যশালা (হাসপাতাল)। রাজ্যের প্রধান প্রধান পথের ধারে যাত্রীদের সুবিধার জন্য বহিঃগৃহ (ধর্মশালা) স্থাপিত ছিল।

পৌরাণিক হিন্দুধর্ম কাম্বোজে বিশেষ প্রধান্য লাভ করিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগী রাজা বা মন্ত্রীদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম এইখানে যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু হিন্দুধর্মের তুলনায় ইহার প্রসার অনেক কম ছিল। শৈবধর্মই সর্বপ্রধান ছিল কিন্তু বিষ্ণু পূজাও যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। বিভিন্ন নামে শিব-বিষ্ণুর যুগ্ম-মূর্তি বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। পৌরাণিক হিন্দুধর্মের অন্তর্গত সমস্ত দেবতারাই কাম্বোজে পূজিত হইতেন এবং এখানে ভারতবর্ষে প্রচলিত হিন্দু দেবতাদের বিভিন্ন নাম ও আকার সমস্তই পরিচিত ছিল। এমন কি উপনিষদের গূঢ় দার্শনিক তত্ত্বসমূহ ও তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতিও প্রচলিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ হিন্দুধর্মের সকল বিষয়ই কাম্বোজে এমন ভাবে অনুসৃত হইত যে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দিতে গেলে ভারতবর্ষের ধর্মের ইতিহাসের পুনরুল্লেখ করিতে হয়। ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন ধর্মের মূল উপাদান ছিল। লেখগুলি হইতে জানা যায় যে ব্রাহ্মণেরা বেদ, বেদাঙ্গ, সামবেদ, ও বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং রাজগণ ও মন্ত্রীরা ধর্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দের একটি লেখে কুরুক্ষেত্র তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে সহস্র অশ্বমেধ ও একশত বাজপেয় যজ্ঞ এবং লক্ষ গোদানে যে পুণ্য হয়, কুরুক্ষেত্রে স্নান করিলে তত পুণ্য হয়। নৈমিষ ও পুষ্কর তীর্থ অপেক্ষাও কুরুক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বেশি। এই লেখটিতে মহাভারতের কয়েকটি শ্লোক পাওয়া যায়। এই নূতন কুরুক্ষেত্র তীর্থ কাম্বোডিয়ার উত্তরে লাওসে অবস্থিত ছিল। প্রত্যহ রামায়ণ, মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণ পাঠের বন্দোবস্ত ছিল এবং এই পুথিগুলি মন্দিরে দান করা পুণ্যকর্ম বলিয়া মনে করা হইত। ধর্মসাহিত্য ব্যতীত অন্যান্য সাহিত্যও পঠিত হইত। নবম শতাব্দের পূর্বেকার লেখগুলিতে এইরূপ

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার উল্লেখ পাওয়া যায় যথা শব্দ, বৈশেষিক, ন্যায়, সমীক্ষা ও অর্থশাস্ত্র। সংস্কৃত কাব্যও অধ্যয়নের একটি প্রিয় বিষয় ছিল।

নবম ও দশম শতাব্দে কাম্বোজের সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা উন্নতি হয়। এই সময় উৎকীর্ণ বহুসংখ্যক সংস্কৃত লেখগুলি ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এইগুলি সুন্দর ও প্রায় নির্ভুল কাব্যরীতিতে রচিত, এবং ইহাদের কতকগুলি আকারে বেশ বৃহৎ। যশোবর্মনের চারিটি লেখর প্রত্যেকটিতে যথাক্রমে ৫০, ৭৫, ৯৩ ও ১০৮টি শ্লোক আছে এবং পঞ্চাশটির কম শ্লোকযুক্ত লেখ অনেকগুলি পাওয়া যায়। রাজেন্দ্রবর্মনের একটি লেখতে ২১৮ ও অন্য আর একটিতে ২৯৮টি শ্লোক দেখা যায়।

এইসব লেখগুলির রচয়িতারা উত্তমরূপে প্রায় সকল রকমের সংস্কৃত ছন্দগুলি ব্যবহার করিয়াছেন এবং ইহা হইতে বুঝা যায় যে তাঁহারা সংস্কৃত অলংকার ও ছন্দশাস্ত্রের রীতিনীতিগুলির সহিত ভালভাবেই পরিচিত ছিলেন। ইহা ছাড়াও বুঝা যায় যে ভারতীয় মহাকাব্য দুইটি, কাব্যগুলি, বিভিন্ন পুরাণ ও সাহিত্যের অন্যান্য শাখাগুলি, এবং ভারতীয় দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক মতবাদ সম্বন্ধে তাঁহাদের গভীর জ্ঞান ছিল; ইহা ছাড়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম ও আখ্যানগুলির সহিত তাঁহাদের বিশেষ পরিচয় ছিল। ভারতবর্ষ হইতে হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত এই হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সকল বিষয়ে এইরূপ গভীর জ্ঞান খুবই আশ্চর্যের বিষয় বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। পাণিনির ব্যাকরণে তাঁহারা বিশেষরূপে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। মহাভাষ্যেরও পঠন পাঠন ছিল এবং একটি লেখতে দেখা যায় যে রাজা যশোবর্মন নিজেই ইহার একটি টীকা রচনা করেন। এই রাজার এক মন্ত্রী হোরা-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। আইনপ্রণেতা হিসাবে মনুর উল্লেখ পাওয়া যায় এবং মনু স্মৃতির একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। কামসূত্রের রচয়িতা

হিসাবে বাৎস্যায়ন ও নীতিশাস্ত্রকার হিসাবে বিশালাক্ষর উল্লেখ পাওয়া যায়। চিকিৎসা শাস্ত্রের বিখ্যাত পুস্তক সুশ্রুতের উল্লেখও আছে।

প্রি-রূপ লেখর চারিটি শ্লোকে রঘুবংশের চারিটি শ্লোকের সুস্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায় এবং ইহার মধ্যে মহাকবি কালিদাসের ব্যবহৃত শব্দগুলি পর্যন্ত ব্যবহার করা হইয়াছে। যশোবর্মনের লেখতে সেতুবন্ধ ও সূর্যশতক গ্রন্থ দুইটির প্রণেতা প্রবরসেন ও ময়ূরের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাকৃত ভাষার লেখক গুণাঢ্যের উল্লেখ এবং এই সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধে কথাসরিৎসাগরে উল্লিখিত কাহিনীর উল্লেখও দেখা যায়। ত্রয়ী বা বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, বৌদ্ধ ও জৈনদের ধর্মশাস্ত্র ও বিভিন্ন ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ ও দার্শনিক সম্প্রদায়ের উল্লেখ এইসব লেখগুলিতে অনবরতই দেখা যায়। পৌরাণিক ধর্মমত ও উপাখ্যান, রামায়ণ, মহাভারত ও হরিবংশের অন্তর্গত কাহিনীগুলি, এবং সাধারণতঃ সংস্কৃত সাহিত্যে যে সব অনুপ্রাস ও উপমাগুলির ব্যবহার দেখা যায় তাহার সবগুলি এই লেখগুলিতে বর্তমান।

যদিও এই সময়ে রচিত কোনও সংস্কৃত পুস্তক পাওয়া যায় না তথাপি এই লেখগুলি হইতে অনায়াসে অনুমান করা যায় যে এই যুগে কাম্বোজে সংস্কৃত সাহিত্য দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

সাহিত্যিক গুণাগুণ ছাড়াও কাম্বোজে সকল বিষয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা কিরূপে গৃহীত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ হিসাবে এই লেখগুলির মূল্য খুব বেশি। ধর্ম ও আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে এই উক্তিটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। লেখগুলি হইতে এই দেশবাসীদের ধর্ম, বিশেষতঃ শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম, সম্বন্ধে প্রচলিত সকল রকম রীতিনীতি ও পূজা পদ্ধতির পরিচয় পওয়া যায় এবং দেখা যায় যে তাঁহারা এই ধর্মসম্প্রদায় দুইটির দেবদেবী, এবং তাঁহাদের বিভিন্ন নাম ও মূর্তির সহিতই কেবল পরিচিত ছিলেন না, উঁহাদের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদও ইঁহাদের জানা ছিল। ধর্ম যে এইখানকার

অধিবাসীদিগের জীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল, বহু রাজাদের ও অন্যান্য ব্যক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মন্দির ও দেবমূর্তি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বেশির ভাগ লেখগুলিতে এইসব ধর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলির উল্লেখ পাওয়া যায় এবং ইহাদের ভগ্নাবশেষ সারা দেশে ছড়ানো আছে। কাম্বোজে ভারতীয় ধর্মের বাহ্যিক আকারের প্রকাশ ছাড়াও নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন দর্শনের অভিব্যক্তি দেখা যায়, এবং ইহাই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। কাম্বোজের লেখগুলিতে বিষয় বাসনা পরিত্যাগ পূর্বক ধর্মজীবন আশ্রয়ের আদর্শ, পুনর্জন্ম ও পৃথিবীর দুঃখকষ্ট হইতে নিষ্কৃতি লাভের আকাঙ্ক্ষা, এবং পরলোকে ব্রহ্মের সহিত মিলিত হওয়াই জীবনের পরম ও চরম লক্ষ্য—এই বিষয়গুলিই সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে।

রাজগণ, উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা ও রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও এই মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক এই দুই বিষয়ের নায়কদের ঘনিষ্ঠ সম্মেলন কাম্বোজ রাজসভার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রথম জীবনে রাজারা বিখ্যাত ধার্মিক আচার্যদিগের অধীনে শিক্ষালাভ করিতেন। রাজপুত্র ও রাজবংশের অন্যান্য ব্যক্তি প্রধান পুরোহিত ও আচার্যের পদ লাভ করিয়াছেন এরূপ অনেক উদাহরণও পাওয়া যায়। রাজপরিবার ও পুরোহিত পরিবারের মধ্যে বিবাহের বিশেষ ভাবে প্রচলন ছিল। পূর্বোল্লিখিত শিবকৈবল্যর বংশের বংশপরম্পরায় রাজপুরোহিতের আসন প্রাপ্তি এবং পুরোহিত বংশের প্রাধান্য রাজা ও জনসাধারণের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক ও প্রধান কারণ। বংশপরম্পরায় রাজ্যের প্রধান পুরোহিতদিগের উপর রাজ্যের উপাস্য দেবতা দেবরাজের ভার ন্যস্ত থাকায় ও এই পুরোহিতগণই আবার রাজাদের গুরুর আসন অধিকার করায় তাঁহারা সমস্ত রাজ্যের নূতন জীবনাদর্শ গঠনে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিলেন।

যদিও উল্লিখিত বিষয়গুলি এইখানকার ধর্ম ও আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষের হেতু তথাপি ভারতবর্ষের সহিত নিয়মিত ও ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শই যে ইহার মূল কারণ এবিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা কেবল অনুমান মাত্র নয়, কাম্বোজের লেখ হইতে এই ধারণার সমর্থক অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। ৭১৩ খ্রীষ্টাব্দের একটি লেখ হইতে জানা যায় যে রাজা প্রথম জয়বর্মনের কন্যার সহিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ শক্রস্বামীর বিবাহ হইয়াছিল। রাজেন্দ্রবর্মনের কন্যা ও পঞ্চম জয়বর্মনের অনুজা রাজলক্ষ্মীর সহিত দিবাকর ভট্ট নামে এক ব্রাহ্মণের বিবাহ হয়। 'শ্রীকৃষ্ণের বাল্যস্মৃতি-বিজড়িত পবিত্র কালিন্দী কূলে' এই ব্রাহ্মণের জন্ম। আরও দুইজন ব্রাহ্মণ পঞ্চম জয়বর্মনের রাজত্ব-কালে বিদেশ (সম্ভবতঃ ভারতবর্ষ) হইতে এখানে আসেন বলিয়া জানা যায়। তাঁহারা এখানে জমি কিনিয়া একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। যশোবর্মনের মাতার পূর্বপুরুষদিগের মধ্যে একজন বেদ ও বেদাঙ্গে অভিজ্ঞ আর্যদেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। চতুর্বেদ ও সকল আগমগুলিতে পণ্ডিত, শিবভক্ত, আর্যদেশীয় সর্বজ্ঞ-মুনি নামে এক ব্রাহ্মণ কাম্বোজ দেশে আসেন এবং তাঁহার বংশধরগণ ধর্মপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কাম্বোজ দেশের সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণদের ভারতবর্ষ পরিদর্শনে যাওয়ার প্রমাণও পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ইন্দ্রবর্মনের গুরু শিবসোমের যাত্রা। একটি লেখ হইতে জানা যায় যে শিবসোম দ্বিতীয় জয়বর্মনের মাতুল রাজা শ্রীজয়েন্দ্রাধিপতি বর্মনের পৌত্র ছিলেন এবং তিনি ভগবৎ শংকরের নিকট শাস্ত্র শিক্ষা করেন। এই ভগবৎ শংকরের পাদপদ্মে সকল জ্ঞানী গুনী ব্যক্তিরাই প্রণতি জানাইতেন। এই লেখটি যিনি উদ্ধার করেন সেই সম্পাদক সত্যই অনুমান করিয়াছেন যে ইহাতে বিখ্যাত দার্শনিক শংকরাচার্যকেই উল্লেখ করা হইয়াছে এবং তাহা হইলে শিবসোম নিশ্চয়ই ভারতবর্ষে আসিয়া পূজনীয় শংকরের কাছে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। এখানে

উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ইন্দ্রবর্মন নবম শতাব্দের শেষ ভাগে রাজত্ব করিতেন. সুতরাং শিবসোম নবম শতাব্দের মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন এরূপ অনুমান করা যায় ; এবং সাধারণতঃ শংকরাচার্যের জীবিত কালের যে তারিখ প্রচলিত তাহার সহিত ইহার সংগতি আছে।

কাম্বোজ হইতে পণ্ডিতদিগের ভারতে আগমনের পরোক্ষ প্রমাণও পাওয়া যায়। ভাটথিপেডি (Vat Thipedi) লেখ সম্পাদনের কালে ফরাসী পণ্ডিত সয়ডেস (Coedes) প্রমাণ করিয়াছেন যে সংস্কৃত আলংকারিকেরা যে রীতিকে গৌড়ীরীতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই রীতিতেই এই লেখ রচিত এবং এই সাদৃশ্য এতই সুস্পষ্ট যে ইহা হইতে নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে ইহার রচয়িতা গৌড় দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন অথবা ঐ অঞ্চলে বাস করিতেন।

জ্ঞানী ও শাস্ত্রজ্ঞ ভারতীয় ব্রাহ্মণদের কাম্বোজে গিয়া বসবাস করার বা এই দেশের সুপণ্ডিত পুরোহিতদিগের ভারতে আগমনের উদাহরণ যদিও বেশি পাওয়া না, তথাপি কাম্বোজবাসীদিগের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় সাহিত্যিক ও আধ্যাত্মিক ও ধার্মিক ভাব-সকলের প্রচলন ইহা হইতেই সম্ভব হইয়াছিল এরূপ অনুমান করা যায়।

কাম্বোজ লেখগুলি হইতে বুঝা যায় যে রাজাদের ও অন্যান্য ব্যক্তিদের দানে যে সমুদয় 'আশ্রম' কাম্বোজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেইগুলিই সেইখানকার ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্রস্বরূপ ছিল এবং এই সমুদয় কেন্দ্র হইতেই ভারতীয় ধর্ম সমস্ত দেশে প্রচারিত হইয়াছিল। এই আশ্রমগুলি সাধু ও ভক্তদের আবাসস্থল ছিল এবং তাঁহারা অধ্যয়ন ও ধ্যানে জীবন উৎসর্গ করিতেন। এই আশ্রমগুলি রাজাদের ও জনসাধারণের অর্থ দ্বারা নির্মিত হইত ও দাতাগণই আশ্রমবাসীদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের বন্দোবস্তও করিতেন। কেবল যশোবর্মনই তাঁহার রাজ্যের বিভিন্ন অংশে একশতটি আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন

বলিয়া কথিত আছে। ইহাদের সংখ্যা সম্বন্ধে বিতর্ক না করিয়াও ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে কাম্বোজে বহুসংখ্যক আশ্রম প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এইখানকার ধর্ম ও সামাজিক ক্ষেত্রে এইগুলি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। এই আশ্রমগুলির পরিচালনার জন্য রাজা যে সকল নিয়মাবলী তৈয়ারি করিয়াছিলেন বহু লেখ হইতে তাহা জানা যায়। এইগুলি হইতে এইসব প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যধারার একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায় এবং দেখা যায় যে কার্যক্ষেত্রে তাহারা কিরূপ উচ্চ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ ও মানবহিতৈষীভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল। রাজ্যের ও সমাজের সর্বোচ্চ স্তর হইতে সর্ব নিম্নস্তরের প্রাণী প্রাচীন ভারতবর্ষের মুনি ঋষিদের যে সকল আশ্রমের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল সেই আশ্রমগুলির কথাই কাম্বোজের এই আশ্রমগুলি আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়। এই সকল আশ্রমের প্রধান প্রধান অনেক ব্রাহ্মণ ঋষি রাজ্যে ও সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং এই সব মুনিদের অনেকের বংশের দীর্ঘ বিবরণী পাওয়া যায়।

ভারত-জাভা সাহিত্যের ন্যায় কাম্বোজে কোনওরূপ সাহিত্যিক বিকাশের প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু এই এক বিষয় ছাড়া ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা অন্যান্য সমস্ত উপনিবেশগুলি হইতে কাম্বোজে সর্বাপেক্ষা গভীররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং শিল্পক্ষেত্রে কাম্বোজ দেশবাসীরা ভারতবর্ষকেও অতিক্রম করিয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

কাম্বোজের সৌধ ও ভাস্কর্য-শিল্পকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা হয়, আদিম ও পরিণত (Classic)। শেষোক্তটি দশম শতাব্দ হইতে অঙ্কোরের সহিত সংশ্লিষ্ট। আদিম শিল্প ফুনানের যুগে আরম্ভ হয় এবং খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে কাম্বোজের প্রথম যুগের রাজাদের কালেও ইহার অনুকরণ চলিতে থাকে। ফুনানের শিল্পকলার বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নাই কারণ এইখানকার সৌধগুলি

সাধারণতঃ কাঠ বা ইটের ন্যায় ক্ষয়শীল বস্তুর দ্বারা নির্মিত হইত। প্রধানতঃ ইটের তৈয়ারি মন্দিরগুলিতে একটি চতুষ্কোণ বা আয়তাকৃতি গর্ভগৃহ (Cella) থাকিত, ইহার চারিপার্শ্বের অনলংকৃত দেওয়ালের উপরে ছাদ অবস্থিত থাকিত. এবং বাহিরের দিকে এই ছাদটির উপরিভাগ ধাপে ধাপে সংকুচিত করা হইত। এইটি গুপ্তযুগের শিল্পের একটি বৈশিষ্ট্য। ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে গুপ্তযুগের শিল্পের সাদৃশ্য বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। অল্পকাল পূর্বে শ্যাম ও কম্বোডিয়ার কতকগুলি ভাস্কর্যের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহাদের শৈলীর সহিত গুপ্তশিল্পের আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য দেখা যায়। কাজেই কাম্বোজের আদিম শিল্পের সহিত ভারতীয় শিল্প প্রণালীর যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নাই। বস্তুতঃ গ্রোসলিয়ে (Groslier) এমনও মনে করেন যে মন্দির ও দেবদেবীর মূর্তি প্রস্তুত করিবার জন্য প্রথম যুগের ভারতীয় ঔপনিবেশকরা ভারত হইতে শিল্পী ও কারিগর আনাইত। এক কথায় বলিতে গেলে সমস্ত পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে ফুনানের শিল্পরীতি সম্পূর্ণ ভারতীয় এবং ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ের সহিত একযোগে গুপ্তযুগের ভারতীয় শিল্পও ফুনান হইতে ইন্দোচীনের বিস্তৃত অঞ্চলে প্রবর্তিত হইয়াছিল।

ফুনানের এই আদিম শিল্পের স্বাভাবিক বিবর্তনের ফলেই কাম্বোজের পরিণত (Classic) শিল্পের উদ্ভব হয়। এই শিল্পের প্রকৃষ্ট নিদর্শন অঙ্কোর ও তাহার আসে পাশের অঞ্চলেই প্রধানতঃ দেখা যায়, তবে এইরূপ নিদর্শন এখান হইতে দূরে অবস্থিত বান্তায় চ্‌মর (Bantay Chmar) প্রভৃতি স্থানেও আছে। এই সমস্ত সৌধের বৃহদায়তন ও অতুলনীয় শোভা যে সভ্যতার গৌরব প্রচার করিতেছে তাহার অতি সামান্য পরিচয়ই লেখগুলি হইতে পাওয়া যায়।

এই সমস্ত সৌধগুলির প্রকৃত তারিখ নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে

এবং এই কারণে কাম্বোজ শিল্পের বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর সঠিক রূপে অনুসরণ করা যায় না। কিছুকাল পূর্বে ইহাদের তারিখ সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল তাহার আমূল পরিবর্তন হইয়াছে, তবে ইহাদের মধ্যে কতকগুলির তারিখ মোটামুটি নির্ণয় করা সম্ভব।

কাম্বোজের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত সৌধ অর্থাৎ অঙ্কোর ভাট দ্বিতীয় সূর্যবর্মন কর্তৃক নির্মিত হয় এবং ইনি ১১১৩ হইতে ১১৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। বফুয়ন (Baphuon) নামে আর একটি বিখ্যাত সৌধ নবম কি দশম শতকে নির্মিত বলিয়া আগে বিশ্বাস ছিল, কিন্তু এখন ইহা দ্বিতীয় উদয়াদিত্য বর্মনের (১০৫০-১০৬৬ খ্রী) আমলে নির্মিত বলিয়া ধরা হয়। আগে বিশ্বাস ছিল যে সুবিখ্যাত অঙ্কোর থোম ও ইহার শিখরযুক্ত তোরণ, প্রাচীর ও পরিখা, এবং এই শহরের মধ্যে অবস্থিত বেয়ন মন্দির এই সমস্তই যশোবর্মন (৮৮৯-৯০০ খ্রী) কর্তৃক নির্মিত, কিন্তু এখন একদল পণ্ডিতদের মতানুসারে এই শহর নির্মানের কীর্তি সপ্তম জয়বর্মনের প্রাপ্য এবং ইনি ১১৮১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহন করেন। বান্তায় চ্‌মর (Bantay Chmar) নামে আর একটি প্রসিদ্ধ সৌধ কিছুকাল আগে দ্বিতীয় জয়বর্মনের (নবম শতাব্দ) কীর্তি বলিয়া মনে করা হইত। কিন্তু এখন একদল পণ্ডিত মনে করেন যে ইহা সপ্তম জয়বর্মনের আমলে, আবার অন্য আর একদল পণ্ডিতগণ মনে করেন যে ইহা আঃ ১১৬০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা দ্বিতীয় যশোবর্মনের আমলে নির্মিত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, কাম্বোজের বেশির ভাগ সুন্দর সৌধগুলিকে পূর্বে নবম ও দশম শতাব্দীতে নির্মিত বলিয়া মনে করা হইত, কিন্তু এখন তাহাদের নির্মাণকাল আরও দুইশত বৎসর পরে মনে করা হয়; এবং দ্বিতীয় জয়বর্মন ও প্রথম যশোবর্মনের পরিবর্তে দ্বিতীয় সূর্যবর্মন, দ্বিতীয় ধরণীন্দ্রবর্মন, দ্বিতীয় যশোবর্মন, ত্রিভুবনাদিত্য বর্মন ও সপ্তম জয়বর্মন, পর পর এই পাঁচজন রাজার রাজ্যকালে অর্থাৎ প্রায় সমস্ত দ্বাদশ শতক জুড়িয়া এই সৌধগুলি

নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। কাজে কাজেই পূর্ববর্তীদের যে ধারণা ছিল যে দ্বাদশ শতাব্দে কাম্বোজের ইতিহাসে পতনের সূচনা দেখা যায় তাহার পরিবর্তে এই শতাব্দীকে কাম্বোজের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় অধ্যায় বলা যায়।

কাম্বোজের অধিকাংশ সৌধগুলি বাদ দিয়া কেবল প্রসিদ্ধগুলির বিস্তৃত বিবরণ দ্বারা তাহাদের প্রকৃতি ও শিল্পক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে আভাষ দেওয়াও এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সম্ভব নহে। কাজেই যে সব লক্ষণগুলি ইহাদের বিশেষত্ব সেইগুলির মোটামুটি ভাবে বর্ণনা করা হইতেছে। অঙ্কোরের প্রথমদিকের সৌধগুলি সাধারণতঃ পৃথক পৃথক ভাবে অবস্থিত মন্দির সমূহ, এবং এইগুলির সহিত ভারতবর্ষের মন্দির-গুলির সাদৃশ্য খুব প্রকট। একাদশ এবং দ্বাদশ শতাব্দে ক্রমশঃ নূতন গঠন রীতির প্রবর্তন হয় ও ইহার দ্বারা প্রথমে দরদালানের (Gallery) প্রচলন ও আরও কিছুকাল পরে বিভিন্ন ধাপে বিভক্ত পিড়ামিডের ন্যায় গঠনের আবির্ভাব দেখা যায়। এই দুইটি বিশেষ ধরনের গঠনের মিলনে যাহা উদ্ভব হইল তহোর দ্বারা পিড়ামিডের প্রতিটি ধাপ ঘিরিয়া দরদালান, এবং ছাদের বা সর্বোচ্চ ধাপের ঠিক মধ্যস্থলে একটি উচ্চ শিখর অবস্থিত থাকিত। এই শিখরের অনুরূপ ক্ষুদ্রাকৃতি শিখর পিড়ামিডের প্রতি ধাপের চারি কোণায় নির্মিত হইত, এবং সর্বশেষে একদিকে কিংবা চতুর্দিকেই গোপুরমের আবির্ভাব দেখা যায়। গোপুরমের প্রত্যেকটিই একটি কক্ষাকৃতি (Vestibule) তোরণ, ইহার উপরিভাগে ধাপে ধাপে গঠিত পিড়ামিডের ন্যায় অলংকারযুক্ত চূড়া অবস্থিত, অর্থাৎ যেমন দক্ষিণ ভারতে দেখা যায়। মূল মন্দিরের মধ্যবর্তী ও কোণার শিখরগুলি উত্তর ভারতের শিখর রীতি অনুযায়ী গঠিত। এই গঠন শৈলীর সর্বোৎকৃষ্ট ও সম্পূর্ণ নিদর্শন দেখা যায় অঙ্কোর ভাটে। বেয়নে এই আকারের কিছু পরিবর্তন দেখা যায়, এখানে শিখরের চারিদিকে চারিটি মানুষের মুখের প্রতিকৃতি অবস্থিত দেখা যায়।

পূর্বোল্লিখিত দরদালানগুলি সরু অথচ সুদীর্ঘ কক্ষের আকার। ইহার এক পার্শ্বে দেওয়াল ও অন্য পার্শ্বে স্তম্ভ শ্রেণীর উপরে খিলানের ছাদ। এই কক্ষের সম্মুখে একটি বারান্দা। ইহার ছাদ দরদালানের ছাদ হইতে কম উঁচু, অর্ধখিলানের আকৃতি এবং এক সারি ছোট ছোট স্তম্ভের উপর অবস্থিত। দরদালানের দেওয়ালগুলি ঈষদুচ্চ উৎকীর্ণ নকশা (bas-relief) ও অন্যান্য ভাস্কর্যের দ্বারা অলংকৃত।

মন্দির ও নগরের চারিদিকে পরিখা ও তাহার উপরে পাথরের সেতু এইখানকার স্থাপত্য শিল্পের একটি বৈশিষ্ট্য। সেতুর দুই পার্শ্বে ছোট ছোট স্তম্ভশ্রেণীযুক্ত দেওয়ালের (balustrade) পরিবর্তে এক বৃহৎ সর্পের সুদীর্ঘ দেহ আকর্ষণে রত একসারি বৃহদাকার দৈত্যের মূর্তি দেখা যায়। এই নূতন ধরনের স্থাপত্য শিল্পের নমুনা খুবই উল্লেখযোগ্য এবং পৃথিবীর আর কোথাও ইহার দৃষ্টান্ত দেখা যায় না।

এই সমস্ত সৌধগুলির বিশাল আয়তন সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা অঙ্কোর ভাটের পরিমাপ হইতে পাওয়া যাইতে পারে। ইহার চতুর্দিকের প্রাচীরের চারিপার্শ্বে যে পরিখা অবস্থিত তাহার প্রস্থ ৬৫০ ফিট এবং পশ্চিম দিকে এই পরিখা পার হইবার পাথরের বাঁধানো সেতু ৩৬ ফিট চওড়া। চতুর্দিক ঘিরিয়া এই পরিখার মোট দৈর্ঘ্যের পরিমাপ প্রায় সাড়ে তিন মাইল। পশ্চিমদিকের তোরণ হইতে প্রথম দরদালান পর্যন্ত বাঁধানো রাস্তাটি ১৫৬০ ফিট লম্বা এবং ভূমি হইতে সাত ফিট উচ্চ। প্রথম দরদালানের পরিমাপ পূর্ব হইতে পশ্চিমে ৮০০ ফিট এবং উত্তর হইতে দক্ষিণে ৬৭৫ ফিট, সুতরাং চারিদিক ঘিরিয়া ইহার মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০০০ ফিট। তৃতীয় বা সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ ধাপে মধ্যস্থলের মন্দিরের প্রধান শিখরের চূড়া সমতল ভূমি হইতে ২১০ ফিট উচ্চে অবস্থিত।

এই সামান্য বিবরণ হইতে কাম্বোজের স্থাপত্য শিল্পের বিশাল

আকারের একটা ধারণা করা যায়। কিন্তু কেবল বিশাল আকারের বলিয়াই এইগুলি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, ইহাদের সুবিন্যস্ত গঠন ও পরিকল্পনার সংগতি ও সামঞ্জস্য, এবং সর্বোপরি ইহাদের শোভাবর্ধক ভাস্কর্যশিল্প—সব মিলাইয়া এই সৌধগুলিকে অপূর্ব মহিমাময় করিয়া তুলিয়াছে।

কাম্বোজের ভাস্কর্যশিল্প অর্ধোত্থিত উৎকীর্ণ নকশা (bas-relief) ও মূর্তি গঠনে শ্রেষ্ঠতা অর্জন করিয়াছে। এই ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে প্রথম আমলের ভাস্কর্যের নমুনাগুলির সহিত ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ গুপ্তশিল্পের, আদর্শের যথেষ্ট মিল আছে, কিন্তু ক্রমশঃ ইহার সহিত নূতন উপাদান যুক্ত হইয়া কাম্বোজের ভাস্কর্য শিল্পকে একটি বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। অঙ্কোরের অর্ধ-নিমীলিত-নেত্র দেবমূর্তিগুলির মুখে বিশেষ ধরনের এক প্রকার হাসি দেখা যায়। ইহার নানারূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, এবং ইহার সৌন্দর্য সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অনেকের মতে এই হাসিতে দেবতার অন্তর্নিহিত নির্বাণের দ্যুতি প্রতিফলিত হইয়াছে এবং বৌদ্ধধর্মের মোক্ষলাভের এই অভিব্যক্তি খ্মের (Khmer) শিল্পের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। কিন্তু অঙ্কোরের মূর্তিগুলির মুখের হাসি কেবল বৌদ্ধমূর্তিগুলিতেই সীমাবদ্ধ নহে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেবমূর্তিগুলিতেও ইহা দেখা যায়। কাজেই ইহাকে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ কোনও ভাবের অভিব্যক্তি মনে না করিয়া ইহা দ্বারা সাধারণ ভাবে দিব্যভাবের অভিব্যক্তির প্রকাশ হইয়াছে এইরূপ মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। বেশির ভাগ মূর্তিগুলিতে খ্মের দেশীয় মুখের সাদৃশ্য দেখা যায়, কিন্তু অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গঠনশৈলীযুক্ত কতকগুলি প্রসিদ্ধ মূর্তির মুখের আকারের সহিত আর্যজাতির মুখের সাদৃশ্য অতি সুস্পষ্ট। কাম্বোজের যে সমস্ত উৎকীর্ণ নকশা মন্দিরগুলি অলংকৃত করিয়াছে, কাম্বোজের ভাস্কর্য শিল্পে সেইগুলি একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রথম আমলের যে নমুনাগুলি পাওয়া যায় সেগুলি ভারতবর্ষ ও জাভার ন্যায় বেশ গভীর ভাবে খোদাই

করা। কিন্তু ক্রমশ: এই গভীরতা কমিয়া নকশাগুলি প্রায় রেখার আকার ধারণ করিয়াছে, অনেকটা কাপড়ের উপর কারুকার্য যেমন দেখা যায় ঠিক সেই রকম, (tapestry)। এক্ষেত্রে এগুলিকে পাথরের উপর সূক্ষ্ম রেখার কারুকার্য মনে হয়। এই এক বিষয়ে পার্থক্য ছাড়া অন্যান্য সকল দিক দিয়া এই ভাস্কর্যের মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট ধরনের শিল্পকলার নিদর্শন দেখা যায়। ইহাতে শিল্পীর বর্ণনাশক্তির অপূর্ব বিকাশ দেখা যায় এবং মানব ও পশুপক্ষীর জীবনের প্রায় সকল রকম অভিব্যক্তিই ইহার দ্বারা বিবৃত হইয়াছে। মূর্তিযুক্ত দৃশ্যগুলি প্রধানতঃ ভারতীয় মহাকাব্য হইতে গৃহীত এবং জীবন্ত, গতিশক্তি সম্পন্ন ও কমনীয়, কিন্তু বাহুল্য বর্জিত। দীর্ঘ দরদালানগুলি জুড়িয়া এই ধরনের অসংখ্য দৃশ্যের অবতারণা করা হইয়াছে, এবং এইগুলি দ্বারা কাম্বোজ শিল্পের অলংকরণ-প্রতিভার নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু উৎকৃষ্ট শিল্পের ন্যায় অলংকারগুলি স্থাপত্যশিল্পের বোঝা হইয়া উঠে নাই, প্রকৃতভাবে শোভাবর্ধন করিয়াছে।

আরও বিশদ বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক। কিন্তু ইহা মনে রাখা উচিত যে সুবিন্যস্ত গঠনযুক্ত বৃহদাকার মন্দিরগুলি, এবং যে ভাস্কর্য্য সম্ভার দ্বারা ইহাদের অলংকৃত করা হইয়াছে, এ উভয়েরই বিশুদ্ধ শিল্প প্রতিভা সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান প্রাপ্তির উপযোগী।

পঞ্চম ভাগ

বর্মা ও থাইদেশ

প্রথম অধ্যায়

বর্মাদেশে হিন্দু উপনিবেশের আরম্ভ

১। স্থানীয় কিংবদন্তী

প্রায় ২৩৭,০০০ বর্গমাইল পরিমিত বর্মা ইন্দোচীনের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ দেশ; ইহার সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য ১২০০ মাইল ও প্রস্থের পরিমাপ ৫০০ মাইল। প্রাকৃতিক বিভাগ অনুসারে বর্মাদেশ উর্ধ্বতন ও নিম্ন এই দুই অংশে বিভক্ত, এবং ইহাদের মধ্যবর্তী সীমা ২০ সমাক্ষরেখা।

বর্মার পশ্চিম অংশ আরাকানকে দক্ষিণ-পূর্ব বংলাদেশের বিস্তৃতি বলা যাইতে পারে। ইহার উত্তরে সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী অবস্থিত, যথা আরাকান-ইয়োমা, চিন পর্বত, নাগা পর্বত ও পাতকোই পর্বত; এবং যদিও এইগুলি দ্বারা যথেষ্ট অবরোধের সৃষ্টি হইয়াছে, তথাপি ইহা একেবারে অনতিক্রম্য নহে। ইতিহাসের প্রথম আমল হইতেই দেখা যায় যে মণিপুর ও আসাম হইতে উর্ধ্বতন বর্মায় যাইবার রাস্তা ছিল। পূর্বসীমায় অবস্থিত যে সমুদয় পর্বতশ্রেণী দ্বারা বর্মা চীনের দক্ষিণ প্রান্তের প্রদেশগুলি ও ইন্দোচীনের অন্যান্য দেশগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যাইতে পারে। বর্মাদশের মধ্য দিয়া বরাবরই পূর্বভারত হইতে চীন ও টনকিন যাইবার স্থল পথ ছিল।

বর্মাদেশের প্রধান অঞ্চল ইরাবতী নদীর উর্বরা উপত্যকা ও ব-দ্বীপ লইয়া গঠিত। এই বিশাল নদীটির মোহনা হইতে দেশের অভ্যন্তরে প্রায় ৮০০ মাইল পর্যন্ত নৌচলাচলের উপযোগী। এবং সকল যুগেই প্রধান প্রধান শহর ও বন্দরগুলি ইহার দুই তীরে-বা

মোহনার কাছে নির্মিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভামো, আভা, মান্দালয়, প্রোম, রেঙ্গুন ও বেসিন। সলউইন নদী ইরাবতী অপেক্ষাও দীর্ঘতর, কিন্তু নৌচলাচলের অনুপযুক্ত। তবে ইহার নিম্নাংশের প্রশস্ত উপত্যকা উর্বরা হওয়ার দরুণ প্রাচীনকালে সমুদ্রপথে আগত হিন্দুদের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ উপনিবেশ এখানে স্থাপিত হইয়াছিল। ইরাবতীর তীরে অবস্থিত রেঙ্গুন ও বেসিন ব্যতীত আরও যে কয়টি প্রধান বন্দর বর্মা দেশে আছে, তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আরাকানের প্রধান শহর আকিয়াব, সলউইনের মোহনায় মৌলমিন ও টেনাসেরিম উপদ্বীপের উপকূলে মেরগুই ও টাভয়। ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা নিকটে অবস্থিতির দরুণ ও সোজাসুজি জল ও স্থলপথে যাতায়াতের সুবিধা থাকায় বর্মাদেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতীয় ব্যবসায়ী, বণিক, ধর্মপ্রচারক, এবং উচ্চকাঙ্ক্ষী বীর যোদ্ধাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে, এবং সম্ভবতঃ তাহার বহু পূর্ব হইতেই, বর্মার উপকূলবর্তী অঞ্চলে ও দেশের অভ্যন্তর ভাগে বহুসংখ্যক হিন্দু বসতি স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইন্দোচীনের অন্যান্য স্থানের ন্যায় বর্মার হিন্দু উপনিবেশের প্রথম যুগের বিশেষ কোনও তথ্য পাওয়া যায় না, কেবল স্থানীয় লোকগাথায় ইহার কিছু আভাষ পাওয়া যায়। বর্মায় প্রথম যুগের ভারতীয় আগন্তুকদের সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। স্থানীয় বিবরণীতে এইগুলির মধ্যে অনেকগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং সময়ে সময়ে একই কাহিনীর নানা রূপান্তর দেখা যায়। বর্মায় ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপনের যে সব কাহিনী অধিক প্রচলিত সেগুলির সারাংশ নিম্নে দেওয়া হইল।

"কপিলবস্তু নগরের শাক্যবংশের অভিরাজ নামে এক রাজপুত্র একদল সৈন্যসহ উর্ধ্বতন বর্মায় আসেন এবং ইরাবতী নদীর পারে সঙ্কিশ (তগয়ুঙ্গ) নামে নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া হইার নিকটবর্তী অঞ্চল

সমূহ লইয়া একটি রাজ্য গঠন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে এই রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়। জ্যেষ্ঠপুত্র আরাকানে ও কনিষ্ঠপুত্র তগয়ুঙ্গে রাজত্ব করিতে থাকেন। তগয়ুঙ্গে এই বংশের একত্রিশ পুরুষ রাজত্ব করিবার পর পূর্বদিক হইতে আগত এক জাতি দ্বারা এই রাজ্য ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়। গৌতমবুদ্ধ যখন জীবিত ছিলেন সেই সময় দজ (দশ বা দাস) রাজার অধীনে ভারতবর্ষের গাঙ্গেয় উপত্যকা হইতে দ্বিতীয় একদল ক্ষত্রিয় উর্ধ্বতন বর্মায় আসেন। তিনি পুরাতন রাজধানী অধিকার করেন ও শেষ রাজার বিধবা পত্নীকে বিবাহ করেন। এই দ্বিতীয় রাজবংশের ষোলপুরুষ রাজত্ব করার পরে তগয়ুঙ্গ রাজ্য বিদেশী আক্রমণকারীদের দ্বারা বিধ্বস্ত হয় ও তাহারা রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে।

"এই রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র আশ্চর্যজনক উপায়ে রক্ষা পায় ও বর্তমান প্রোমের নিকটে রাজধানী নির্মান করিয়া একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করে। তাহার পুত্র দুত্তবউঙ্গ থরে ক্ষেত্তর (শ্রীক্ষেত্র) নামে একটি বড় নগর প্রতিষ্ঠা করে ও এইখানে রাজধানী স্থাপন করে। তাহার পরে ৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আঠারোজন রাজা রাজত্ব করেন ও এই সময়ে গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়। প্যু, কনরন ও ম্রম্ম নামে যে তিন জাতি এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত দুই দল প্রাধান্য লাভের জন্য এগারো বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ করে। প্যু জাতি কৌশলের সাহায্যে জয়লাভ করে ও কনরন জাতি আরাকানে চলিয়া যায়। কিছুদিন পরে প্যু জাতিও দক্ষিণদিক হইতে আগত মোন অথবা তলইং জাতি দ্বারা পরাজিত হয় ও নানা স্থানে ঘুরিয়া শেষ পর্যন্ত পাগান শহর প্রতিষ্ঠা করিয়া সেইখানে বসবাস করিতে থাকে। ইহার পরে এই কাহিনীগুলিতে আর বিভিন্ন জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় না, শুধু ম্রম্ম নামেই এই দেশের অধিবাসীরা পরিচিত হয় এবং এই ম্রম্ম হইতেই বর্মা নামের উৎপত্তি।"

নিম্ন বর্মার উপকূল প্রদেশের অধিবাসী মোন অথবা তলইংদের

মধ্যে তাহাদের আদিযুগের ইতিহাস সম্বন্ধে কতকগুলি কাহিনী প্রচলিত আছে। পেগু অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী অনুসারে অতি প্রাচীনকালে কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর নিম্ন অঞ্চল হইতে সমুদ্র পার হইয়া ভারতীয় ঔপনিবেশকরা ইরাবতীর নদীর ব-দ্বীপ ও তাহার নিকটবর্তী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। কথিত আছে যে বুদ্ধদেব স্বয়ং এই দেশে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। করনক দেশের অন্তর্গত থুবিন্ন নগরের রাজা তিস্‌স (Tissa)-র দুই পুত্রের অধীনে এই বর্বর জাতির দেশে প্রথম ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়। এই দুই রাজপুত্র সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিত ও সমুদ্রের তীরে জাত এক রাক্ষসের (ড্রাগন) শিশুপুত্রকে পালন করিত। এই শিশু বড় হইয়া থটন (Thaton) নগর নির্মান করে ও সিহরাজ (সিংহরাজ) নামে রাজত্ব করে। এই কাহিনীতে থটনে (সুধর্ম্মবতী) অধিষ্ঠিত উনষাটজন রাজার নামের একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে থটনের রাজার দুই পুত্র থমল (শ্যামল) ও বিমল সিংহাসনের উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়ায় আশে পাশের অঞ্চল হইতে কিছু লোক সংগ্রহ করিয়া উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বোগো বা পেগু নামে নগর প্রতিষ্ঠিত করে। এই নগরটি হংসাবতী নামেও পরিচিত ছিল।

পেগুর রাজা শ্যামল কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিমলকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করিবার প্রতিজ্ঞা করেন। কিন্তু বিমল অধ্যয়নের জন্য তক্ষশিলায় গমন করিলে পর শ্যামলের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বিমল যখন ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে তাঁহার ভ্রাতা পূর্ব প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়াছেন তখন ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন। ষোল বৎসর পরে একদল অজ্ঞাত হিন্দু জাহাজে করিয়া আসিয়া পেগু অবরোধ করে। শ্যামলের পুত্র গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া আক্রমণকারীদিগের সহিত যুদ্ধ করে এবং

তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের সাতটি জাহাজ ও তাহাদের দলের সাড়ে তিন হাজার হিন্দুকে বন্দী করে। বিমলের পরে সে রাজা হয়। এই বংশে সর্বশুদ্ধ সতরজন রাজা রাজত্ব করেন এবং ইহাদের মধ্যে সর্বশেষ তিস্‌স (Tissa) ৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন। কিরূপে এই রাজা একজন স্ত্রীলোকের ধর্মপরায়ণতায় মুগ্ধ হইয়া বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন ও এই স্ত্রীলোকটি তাঁহার প্রধান রাণীরূপে গৃহীত হ'ন তাহার বর্ণনা একটি কাহিনীতে পাওয়া যায়।

স্থানীয় কিংবদন্তী অনুসারে থটন ও পেগু সহ ব-দ্বীপের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত অঞ্চলটি ভারতীয় বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লিখিত সুবর্ণভূমি এবং এই অঞ্চলেই অশোক প্রেরিত ধর্মপ্রচারক সোন ও উত্তর বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। এমন কি বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অনুসারে তপুস ও ভল্লুক নামে যে দুইজন বণিক বুদ্ধের দর্শন লাভ করে ও সর্বপ্রথম তাঁহার প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ করে, তাহাদের জন্মস্থানও এই অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া নির্দেশ করা হয়। কথিত আছে যে তাহারা বুদ্ধের মাথার আটটি চুল লইয়া আসে ও এইগুলি রেঙ্গুনের কাছে একটি প্যাগোডাতে রাখে, এবং তদবধি এই প্যাগোডা সোয়ে দাগন প্যাগোডা নামে পরিচিত।

এই সমুদয় কাহিনীর সন তারিখ ও জনসাধারণের বৌদ্ধধর্মানুরাগ হইতে উদ্ভূত বুদ্ধ ও শাক্যবংশ প্রভৃতির উল্লেখ বাদ দিলে যে মর্ম বুঝা যায় তাহা এই যে আরাকান ও বর্মায় হিন্দু উপনিবেশকারীরা ঐ অঞ্চলের অধিবাসী একই জাতির বিভিন্ন শাখা প্যু, ম্রম্ম ও করণ এবং দক্ষিণে মোন বা তলইং নামে ভিন্ন এক জাতির মধ্যে বসতি স্থাপন করে; আরাকান, তগউঙ্গ, শ্রীক্ষেত্র, থটন ও পেগুতে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়; শ্রীক্ষেত্রে হিন্দু সভ্যতায় অনুপ্রাণিত প্যু রাজ্য পেগুবাসী মোন বা তলইং জাতি দ্বারা ধ্বংস হয়; তাহার ফলে হিন্দু সভ্যতায় অনুপ্রাণিত ম্রম্ম বা বর্মণদের দ্বারা

পাগান রাজ্যের সূত্রপাত হয় ও ক্রমে ইহারাই শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে।

এইসব ঐতিহাসিক তথ্যগুলি নির্ভরযোগ্য প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। যে সমস্ত লিখিত কাহিনী ও স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায় তাহার দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে বর্মার সংস্কৃতি ও সভ্যতার উদ্ভব ভারতবর্ষ হইতে, এবং যদিও চীনদেশ বর্মার নিকটতর প্রতিবেশী এবং এই দুই দেশের জাতি ও ভাষার মধ্যে অধিকতর সাদৃশ্য দেখা যায়, তথাপি চীনারা সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বর্মার উপর উল্লেখযোগ্য কোনওরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ইহা হইতে পরোক্ষভাবে অতি প্রাচীনকাল হইতে বহু সংখ্যক ভারতীয় উপনিবেশকারীদের বর্মায় বসতি স্থাপনের কথা প্রমাণ করে এবং এই দেশের বিভিন্ন অংশে সেই প্রাচীনকাল হইতে তাহাদের যে সব স্মৃতিচিহ্ন ছড়ানো আছে তাহা দ্বারা এই ধারণার যথার্থতা উপলব্ধি করা যায়। হিন্দু উপনিবেশকারীদের সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যায় কিন্তু খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্বেকার বর্মার ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিবার পক্ষে ইহা যথেষ্ট নহে। সুতরাং এই সময়ের পূর্বেকার হিন্দু ঔপনিবেশিকদের সম্বন্ধে কেবল একটি সাধারণ চিত্র অনুমান করাই সম্ভবপর এবং ইহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া পরে পৃথক পৃথক ভাবে হিন্দু ঔপনিবেশিকদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত ও হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতা গ্রহীতা বিভিন্ন জাতি, যথা মোন, প্যু, ম্রন্ম ও আরাকানবাসীদিগের বিবরণ দেওয়াই সুবিধাজনক।

২। প্রাচীন যুগের হিন্দু সভ্যতা

সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে মনে হয় যে বর্মা দেশেই ভারতীয়েরা সর্বপ্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে, কারণ পূর্বভারত হইতে পাতকোই পর্বতমালা ও আরাকান ইয়োমার ভিতর দিয়া বর্মায়

যাওয়ার স্থলপথ প্রচলিত ছিল এবং পূর্বভারতের বন্দরগুলি হইতে সমুদ্রপথে ইহার উপকূল ভাগে যাওয়ারও সুবিধা ছিল। বর্মায় প্রচলিত উপরোক্ত কাহিনীগুলি ও অন্যান্য যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায় তাহা পর্যালোচনা করিলে এই ধারণার সত্যতা উপলব্ধি করা যায়।

প্রথমতঃ সিংহলের বৌদ্ধ কাহিনী হইতে জানা যায় যে অশোকের নিযুক্ত ধর্মপ্রচারকেরা সুবর্ণভূমিতে গিয়াছিল। সুবর্ণভূমিকে নিম্ন বর্মার অঞ্চল বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে। এই সনাক্তীকরণ, এমন কি মূল কাহিনীটির যথার্থতা, অভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করা যায় না, তবে বিখ্যাত পালি ধর্মশাস্ত্রের টীকাকার বুদ্ধঘোষের বিবৃতি হইতে যাহা জানা যায় তাহা প্রণিধানযোগ্য। ইনি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম দিকে জীবিত ছিলেন, এবং বর্মায় অশোকের নিযুক্ত ধর্ম-প্রচারকদের কার্যের বিবরণ ছাড়াও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে বুদ্ধদেব গয়ায় বোধি লাভ করিবার অল্পকাল পরে এই দেশের অধিবাসী দুইজন বণিক তাঁহার কাছে দীক্ষা লাভ করে। বুদ্ধ ঘোষের এই বিবৃতি অসম্ভব বলিয়াই মনে হয় কিন্তু ইহা দ্বারা এই প্রমাণ হয় যে পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে বর্মায় হিন্দু সংস্কৃতি বহু প্রাচীন কাল হইতে, এমন কি বুদ্ধদেবের জীবিতকালেই প্রচলিত হইয়াছিল।

তবে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্বেই যে বমায় ভারতীয় উপনিবে স্থাপিত হইয়াছিল তাহা টলেমি উল্লিখিত কয়েকটি স্থানের সংস্কৃত নাম হইতে প্রমাণিত হয়, কারণ এই স্থানগুলি যে বর্মার বিভিন্ন অঞ্চলের তাহার মোটামুটি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বর্মীয় কয়েকটী পাথরের উপর খোদিত ভারতীয় ব্রাহ্মীলিপিও ইহাই নির্দেশ করে। তৃতীয় শতাব্দের চীনা বিবরণ হইতে জানা যায় যে লিন-য়াঙ্গ রাজ্যে প্রায় এক লক্ষ বৌদ্ধ পরিবার বাস করিত এবং ইহাদের মধ্যে কয়েক সহস্র বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিল। লিন-য়াঙ্গ রাজ্য

মধ্য বর্মায় অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। এই সমস্ত প্রমাণ হইতে অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে যে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্বে, হয়তো বহু পূর্বেই, বর্মায় ভারতীয় উপনিবেশ প্রথম স্থাপিত হয়।

পুরাতত্ত্ববিদদের দ্বারা অনুসন্ধান কার্য বর্মায় বেশি দিন আরম্ভ হয় নাই এবং এ পর্যন্ত কেবলমাত্র অল্প কয়টি স্থান হইতেই ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। এই সমুদয় স্থানে যে সব জিনিস পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে লিখিত বিবরণী, মূর্তি, ভক্ত প্রদত্ত ফলক (Votive tablets) (ইহার বেশিরভাগ মৃত্তিকা নির্মিত অর্থাৎ terra-cotta), এবং মন্দির প্রভৃতিই প্রধান। বিবরণগুলি সাধারণতঃ পাথরে ও পোড়া মাটির ফলকে, মাঝে মাঝে সোনার পাতে বা দেহভস্ম আধারে খোদাই করা। ইহাদের ভাষা সংস্কৃত, পালি, মোন ও প্যু, এবং যে অক্ষর ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা হয় ভারতীয় কিংবা উহা হইতে উদ্ভূত। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতবর্ষে প্রচলিত ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরের ব্যবহার হইতে বুঝা যায় যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের অধিবাসীরা বর্মায় বসতি স্থাপন করিয়াছিল। অক্ষরের আকৃতি হইতে অনুমান করা যায় যে তৃতীয় বা চতুর্থ হইতে দশম শতাব্দের মধ্যে এই বিবরণগুলি লিখিত হইয়াছিল।

বিবরণগুলি হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে অতি প্রাচীনকালে, খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর আরম্ভে বা তাহারও কিছুকাল পূর্বে, এই স্থানের অধিবাসীরা ভারতীয় সাহিত্য, সংস্কৃত ও পালি ভাষা, এবং ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অন্তর্গত শৈব ও বৈষ্ণব এই দুই ধর্মমত এখানে পরিচিত ছিল এবং শেষোক্তটি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের হীনযান ও মহাযান, এমন কি নিকৃষ্ট ধরনের তান্ত্রিক মতও এখানে প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টাব্দের প্রথম সহস্র বৎসরের মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ ভারত হইতে আগত

ঔপনিবেশিকদের দ্বারা প্রচলিত ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাধান্য লাভের বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ধর্মসংক্রান্ত সৌধ, বিশেষতঃ পঞ্চম হইতে সপ্তম খ্রীষ্ট শতাব্দে নির্মিত স্তূপগুলি, গুপ্তশিল্প শৈলীতে নির্মিত ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মে পূজিত বহু দেবদেবীর মূর্তি, এবং বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দে প্রচলিত ভারতীয় অক্ষরে সোনার পাতে খোদাই করা শ্লোক। ইহা ছাড়া বহু সংখ্যক পোড়া-মাটি-নির্মিত ফলক (terra-cotta votive tablets) পাওয়া গিয়াছে—এইগুলিতে বুদ্ধের জীবনের নানা কাহিনী ও গুপ্তযুগের শেষের দিকে প্রচলিত ভারতীয় অক্ষরে সুবিদিত বৌদ্ধবচন 'যে ধর্মা হেতু প্রভবা' প্রভৃতি খোদিত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিভাগের এই সকল আবিষ্কারের ফলে প্রোম, পেগু, থটন ও পাগান প্রভৃতি স্থানে বা ইহাদের নিকটে ভারতীয় সংস্কৃতির কয়েকটি প্রধান কেন্দ্র অবস্থিত ছিল, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বর্মাদেশে প্রথম যুগের হিন্দু রাজ্য

১। রমঞ্ঞ দেশ

প্রাচীন কাহিনী ও প্রত্নতত্ত্বের প্রমাণ হইতে অনুমান করা যায় যে খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকে হিন্দু সংস্কৃতি দ্বারা অনুপ্রাণিত প্যু ও মোন জাতি নিম্ন বর্মায় সমস্ত বর্মাদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ইহার প্রধান কারণ এই যে ভারতবর্ষ হইতে দুর্গম স্থলপথে যে সব উপনিবেশকারীরা উর্ধ্বতন বর্মায় যাইত তাহাদের অপেক্ষা অনেক বেশি সংখ্যক সমুদ্রপথে নিম্নবর্মায় আসিত। যে সব আদিম অধিবাসীদিগের সংস্পর্শে এই ঔপনিবেশিকরা আসিয়াছিল তাহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্ভবতঃ এই বৈষম্যের আর একটি কারণ। যে কোনও কারণেই হউক মোনরা সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং রাজনীতিক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিল।

মোনরা তলইং নামেও পরিচিত ছিল। এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। ইহার মধ্যে যেটি সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় তাহা এই যে, যে সব ঔপনিবেশিকগণ ভারতবর্ষের তেলিঙ্গানা (বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী তেলেগু ভাষা-ভাষী অঞ্চল) হইতে আসিয়াছিল, প্রথমে এই নাম কেবল তাহাদেরই নির্দেশ করিত এবং ক্রমে ক্রমে দেশের সমস্ত অধিবাসীরাই এই নামে অভিহিত হইত। তবে এ কথা মনে রাখা দরকার যে মোনরা কখনও এই নাম তাহাদের জাতির নাম রূপে ব্যবহার করে নাই। তলইং নামের এই ব্যাখ্যা স্বীকার করিলেও বর্মার ব-দ্বীপ অঞ্চলে যে সব ভারতীয় উপনিবেশকারীরা বসতি স্থাপন করিয়াছিল তাহারা

সকলেই যে কলিঙ্গ বা অন্ধ্রদেশ হইতে আসিয়াছিল এরূপ মনে করা ঠিক হইবে না। সাধারণভাবে সাংস্কৃতিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ ছাড়াও বিভিন্ন স্থানের নামকরণ হইতেও এই ধারণা ভুল বলিয়া মনে হয়।

১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ কল্যাণী লেখ অনুসারে যখন অশোকের ধর্মপ্রচারকেরা এই রাজ্যে আসিয়াছিল তখন ইহার রাজধানী সমুদ্রোপকূলে গোলমত্তিক নগর বা গোলনগরে (অধুনা আইথেমা, থটনের কুড়ি মাইল উত্তরে) অবস্থিত ছিল। বলা হইয়াছে যে শহরের এইরূপ নাম হইবার কারণ 'এখানে গোলদেশের ন্যায় বহু মাটি ও কঞ্চির গৃহ ছিল।' পণ্ডিতগণ গোলকে গৌড় বলিয়া সনাক্ত করিয়াছেন এবং ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে কালক্রমে পশ্চিম হইতে আগত সকল বিদেশীরাই মোন ও বর্মবাসীদ্বারা এই নামে আখ্যাত হইত। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে গৌড় বা বঙ্গদেশের অধিবাসীরা নিম্নবর্মায় হিন্দু উপনিবেশ স্থাপনে একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহন করিয়াছিল। বঙ্গদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রথম খ্রীষ্টীয় সহস্রকে ইহার সমুদ্রবন্দরগুলির, বিশেষ করিয়া তাম্রলিপ্তির, প্রাধান্য এই সিদ্ধান্তের সমর্থক।

কয়েকটি শহর ও স্থানের পালি নামকরণ করা হইয়াছিল। থটন ও পেগু যথাক্রমে সুধম্ম (বতী) ও হংসবতী নামে পরিচিত ছিল এবং থটন যথার্থই সুধম্মের অপভ্রংশ।

রেঙ্গুন হইতে পেগু পর্যন্ত সমস্ত হিন্দু উপনিবেশগুলিকে উৎকল দেশ নামে অভিহিত করা একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। বৌদ্ধ পালি ধর্মশাস্ত্রের পাঠক মাত্রেরই তপুস ও ভল্লুক নামে দুই বণিকের গল্প জানা আছে। গৌতমের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির সপ্তম সপ্তাহ পরে এই দুই বণিক বুদ্ধদেবের দর্শনলাভ করে এবং তাঁহাকে খাদ্যদ্রব্য দান করে; এবং এই দুইজনই তাঁহার প্রথম গৃহী শিষ্য হয়। কথিত আছে যে বুদ্ধদেব বণিক দুইজনকে নিজ মস্তকের কয়েকটি চুল দান করেন ও

তাহারা মাতৃভূমিতে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া চুলগুলি স্মৃতিচিহ্ন-রূপে তথায় রক্ষা করে। পালি ধর্মশাস্ত্রে এই বণিকদ্বয়ের দেশ উৎকল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। খুব সম্ভব এই নাম দ্বারা বর্তমানে ভারতে উড়িষ্যা নামে পরিচিত অঞ্চলকে নির্দেশ করা হইয়াছে, কিন্তু নিম্নবর্মার বৌদ্ধরা এই বণিকদ্বয়কে বর্মার অন্তর্গত উৎকলদেশবাসী বলিয়া মনে করে এবং রেঙ্গুনের নিকট অবস্থিত বিখ্যাত সোয়েডাগন প্যাগোডাতে বুদ্ধদেবের চুলগুলি রক্ষিত আছে বলিয়া বিশ্বাস করে। ইহা সম্ভব হইতে পারে যে উড়িষ্যা উপকূল হইতে আগত উপনিবেশকারীরা নিম্নবর্মার ব-দ্বীপ অঞ্চলের কোনও অংশকে উৎকল বলিয়া অভিহিত করিত, এবং তপুস ভল্লুকের দেশের নামের সহিত এই দেশের নামের সাদৃশ্য থাকায় এই কাহিনীতে এই দেশের উল্লেখ করা হইয়াছে এইরূপ বিশ্বাস জন্মে। এই দেশের উপর উক্ত গল্পটি প্রযুক্ত করিবার জন্যই যে এই স্থানের নাম উৎকল দেশ রাখা হইয়াছিল এইরূপ যুক্তি সংগত মনে হয় না। লেখ ও গ্রন্থ হইতে নিম্নবর্মার আরও অনেকগুলি হিন্দুবসতির নাম জানা যায়। দৃষ্টান্ত—যথা, রামাবতী ও অসিতাঞ্জন নগর (রেঙ্গুনের কাছে), কুসিম-নগর বা মণ্ডল (বেসিন), রামপুর (মৌলমিন) এবং মুক্তিমমণ্ডল (মার্তাবান)।

হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পন্ন মোনজাতির নিম্নবর্মায় সমগ্র বসতি রমন্নদেশ নামে পরিচিত ছিল। একাদশ শতাব্দীর একটি লেখতে রমেন জাতির নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই নাম হইতে প্রথমে মধ্যযুগে র্মন এবং পরে বর্তমান মন বা মোন—এই জাতীয় নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

বিভিন্ন কাহিনীতে উল্লেখ ব্যতীত সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত মোন জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে আর কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। হিউ-য়েন-সাঙ্গের বিবরণীতে সমতটের (নিম্নবঙ্গ) সীমার পরের রাজ্যগুলির নাম হইতে বর্মার রাজনৈতিক বহু মূল্যবান তথ্যাদি জানা যায়।

এইগুলি (১) সমতটের উত্তর-পূর্বে সমুদ্রোপকূলে সি-লি-চ-ট-লো ; (২) পূর্বোক্ত দেশের দক্ষিণ-পূর্বে ক-মো-লংক, (৩) ইহার পূর্বে তো-লো-পো-তি ; (৪) ইহরে পূর্বে ইসং-ন-পু-ল ; (৫) ইহার পূর্বে মো-হো-চেন-পো অথবা লিন্ য়ি এবং (৬) পূর্বোক্তর দক্ষিণ-পশ্চিমে য়েন-মো-ন-চউ। ইৎসিং ও ১-৩ ও ৫ সংখ্যাক দেশগুলির উল্লেখ করিয়াছেন, তবে দ্বিতীয় দেশটির নাম লঙ্কসু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

এই সমস্ত স্থানগুলির সনাক্তীকরণ লইয়া বহু বিতর্কের সৃষ্টি হইরাছে, সেগুলির বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নাই। কাম্বোজ দেশ ঈশানপুর নামে পরিচিত ছিল। চতুর্থ ও পঞ্চম সংখ্যক স্থান দুইটি যে কাম্বোজ ও চম্পা সম্বন্ধে প্রযোজ্য সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তৃতীয় সংখ্যক দেশটি সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ইহা নিম্ন মেনাম উপত্যকায় দ্বারবতী নামক স্থানকে নির্দেশ করিয়াছে। প্রথম সংখ্যক দেশটি বর্মার শ্রীক্ষেত্র বা প্রাচীন প্রোমের নাম—ইহা সত্য যে সমতটের উত্তর-পূর্বে ইহা অবস্থিত নহে, কিন্তু এইদিকে সমুদ্রের পারে কোনও দেশ থাকা সম্ভব নহে। আবার ইৎসিং শ্রীক্ষেত্রকে তিব্বত ও চীনের মধ্যবর্তী পর্বতমালার দক্ষিণে এবং সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। এই দেশগুলির সনাক্তীকরণ যথার্থ বলিয়া ধরিয়া লইলে দ্বিতীয় সংখ্যক দেশটি নিম্নবর্মার মোন দেশে অবস্থিত টেনাসেরিমের সহিত সনাক্ত করাই যুক্তিসংগত মনে হয়। যদিও মোন রাজ্যের প্রকৃত নাম কি ছিল তাহা উদ্ধার করা যায় না, তথাপি হিউ-য়েন-সাঙের বিবৃতি হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে প্রোমের চতুষ্পার্শ্বের অঞ্চল লইয়া প্যু রাজ্য ও ইহার দক্ষিণপূর্বে মোন রাজ্য একই সময়ে পাশাপাশি অবস্থিত ছিল। আরও জানা যায় যে এই দুইটি রাজ্য ভারতবর্ষে, অন্ততঃপক্ষে পূর্বভারতে, পরিচিত ছিল এবং দুই দেশের ও পূর্বভারতের মধ্যে যাতায়াতের পথ ছিল। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে

কথাসরিৎসাগরে কলশপুর নামে একটি রাজ্যের উল্লেখে পাওয়া যায় এবং চীনের ইতিহাসেও এই রাজ্যটির উল্লেখ আছে। ইহা প্রোমের দক্ষিণ-পূর্বে সিট্যাং নদীর মুখে অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

হিউ-য়েন-সাঙ্গ কর্তৃক উল্লিখিত মেনাম উপত্যকায় দ্বারবতী রাজ্যটি যে একটি মোন রাজ্য ছিল এইরূপ অনুমান করার ন্যায়সংগত কারণ আছে। এই রাজ্যটি মেনাম নদীর উপত্যকার নিম্ন অঞ্চল লইয়া গঠিত ছিল এবং ইহার রাজধানী দ্বারবতী ব্যাঙ্ককের চল্লিশ মাইল পশ্চিমে নাকোন পাথমের (Nakon Pathom) কাছে অবস্থিত ছিল। এই রাজ্যটি কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড়টির রাজধানীর নাম ছিল লবপুরী (অধুনা লোপভুরি)। এই দুই স্থানে সম্ভবতঃ সপ্তম বা অষ্টম শতকে উৎকীর্ণ কয়েকটি মোন লেখ পাওয়া গিয়াছে এবং লেখগুলিতে পালি ভাষায় 'যে ধম্মা' প্রভৃতি বৌদ্ধ সূত্রের উল্লেখ হইতে অনুমান করা যায় যে এইখানকার লোকেরা মোন জাতীয় এবং হীনযান বৌদ্ধধর্মের অনুগামী ছিল। চামদেবীবংস ও জিনকালমালিনী নামে দুইখানি পালি গ্রন্থও এই মতকেই সমর্থন করে। হরিপুঞ্জয় রাজ্যের (আধুনিক উত্তর শ্যামের লম্ফুন ও চিয়েঙ্গমাই) এই দুইটি আখ্যায়িকা স্থানীয় ভাষায় প্রচলিত পুস্তকের ভিত্তিতে, যথাক্রমে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে রচিত। ইহাতে এই সমস্ত অঞ্চলে প্রথম আমল হইতে বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতির মনোরম বিবরণী পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব ও তাঁহার ঠিক পরবর্তী অনুগামীদের সম্বন্ধে কাল্পনিক উপাখ্যানগুলি বাদ দিলে মধ্যযুগের যে সমস্ত ঐতিহাসিক বিবরণ এইগুলিতে লিখিত আছে তাহা যে অনেকটা নির্ভরযোগ্য তাহার প্রমাণ লেখ ও অন্যান্য তথ্যাদি হইতে পাওয়া যায়। এই বিবরণগুলি অনুসারে ঋষি বাসুদেব ৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে হরিপুঞ্জয় নগর প্রতিষ্ঠা করেন। দুই বৎসর পরে তাঁহার আমন্ত্রণে

প্যুদিগকে উর্ধ্বতন বর্মার হিন্দু উপনিবেশগুলি হইতে উদ্ভুত অপেক্ষা একটি ভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী, এবং শ্রীক্ষেত্রের রাজ্যকে একটি ভিন্ন হিন্দু উপনিবেশ বলিয়া ধারণা করাই স্বাভাবিক মনে হয়। একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে হিন্দুধর্মে অনুপ্রাণিত প্যু-গণ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মর্ম্মদের অপেক্ষা অনেক উন্নত জাতি ছিল। কারণ বহু প্রাচীন কাল হইতে প্যু-দের নিজস্ব লিপি ছিল, কিন্তু একাদশ শতাব্দীর আগে লিখিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে মর্ম্মদের কোনও ধারণাই ছিল না। প্রোমের নিকটবর্তী অঞ্চলে বহুসংখ্যক খণ্ডিত বৌদ্ধ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। মৌংগুণ নামক স্থানে প্রাপ্ত দুইখানি সোনার পাতে বৌদ্ধশাস্ত্রের কয়েকটি বচন প্রথম শতকের অক্ষরে উৎকীর্ণ হইয়াছে। মোজা এবং নিকটবর্তী স্থানে বৌদ্ধ পালি গ্রন্থের কয়েকটি বচন উৎকীর্ণ কুড়িটি সোনার পাত এবং বিভঙ্গ নামক বৌদ্ধগ্রন্থের উদ্ধৃতি-যুক্ত মাটির ফলকে উৎকীর্ণ তিনটি লেখ পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য খোদিত লিপিতে প্যু-দের যে সব বিবরণ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা দ্বারা তাহাদের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে মোটামুটি কোনও ধারণা করা সম্ভব হয় না, কিন্তু এইগুলি হইতে তাহাদের কতকগুলি রাজার নাম জানা যায় ও তাহাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধেও কিছু অনুমান করা যায়। এই সমস্ত বিবরণগুলি প্রাচীন প্যু রাজধানী মওজা (প্রাচীন প্রোম) ও তাহার নিকটে পাওয়া গিয়াছে এবং নিম্নে তাহাদের কয়েকটি উল্লেখ করা হইল।

(১) একটি বুদ্ধমূর্তির পাদপীঠে সুন্দর সংস্কৃত শ্লোকে রচিত একটি লেখ—ইহার মধ্যে মধ্যে প্যু-ভাষায় ব্যাখ্যা। লিপির আকৃতি ও মূর্তির গঠনশৈলী উভয়ই পূর্বভারতের সপ্তম খ্রীষ্ট শতকের অনুরূপ। লেখ হইতে জানা যায় যে এই মূর্তিটি গুরুর আদেশে রাজা জয়চন্দ্রবর্মন তাঁহার ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিবিক্রমের মধ্যে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আরও জানা যায় যে জয়চন্দ্র পাশাপাশি দুইটি নগর নির্মাণ করিয়াছিলেন।

(২) পয়গি প্যাগোডায় প্রাপ্ত পাঁচটি ভস্মাধারের গাত্রে সাতটি লেখতে সূর্যবিক্রম, হরিবিক্রম ও সিহ (সিংহ) বিক্রম এই তিনজন রাজার নাম পাওয়া যায়। এই লেখগুলিতে যে বর্মা সনের উল্লেখ আছে, যদি তাহার আরম্ভকাল খ্রীষ্টীয় ৬৩৮ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে এই রাজাদের মৃত্যুকাল যথাক্রমে ৬৮৮, ৬৯৫, ও ৭১৮ খ্রীষ্টাব্দ বলা যাইতে পারে। উৎকীর্ণ লিপিগুলি প্যু ভাষায় প্রাচীন দক্ষিণ ভারতীয় লিপিতে লিখিত; এই কারণে এগুলি অনেক আগেকার বলিয়া মনে হয়।

(৩) একটি স্তূপের উপর প্যু লেখতে ইহার নির্মাতার নাম বা উপাধি হিসাবে শ্রীপ্রভুবর্ম ও প্রভুদেবীর উল্লেখ আছে। খুব সম্ভব এই দুইটি একজন রাজা ও তাঁহার রাণীর নাম।

প্যুদের প্রাচীনত্ব ও প্রাধান্যের প্রমাণ হিসাবে বলা যাইতে পারে যে চীনা বিবরণে বর্মার প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম ইহার অধিবাসীদের পিয়াও (Piao) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং পিয়াও নিঃসন্দেহ প্যুদের নির্দেশ করে। ইহাদের সম্বন্ধে তৃতীয় শতাব্দের এই সব বিবরণী হইতে বুঝা যায় যে প্যু-রা তখন ইরাবতীর উপত্যকা দখল করিয়াছিল। এইখানে প্যুদের অব্যাহত থাকার প্রমাণ তৃতীয় হইতে সপ্তম শতাব্দ পর্যন্ত চীনা বিবরণীতে তাহাদের উল্লেখ হইতে পাওয়া যায়। উপরে উল্লিখিত হিউ-য়েন-সাঙ্গের বিবরণী হইতে দেখা যায় যে পূর্বভারতের সীমানার পরেই সর্বপ্রথম বৃহৎ হিন্দুরাজ্য শ্রীক্ষেত্র হিন্দুধর্মে অনুপ্রাণিত প্যুদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পূর্বোক্ত লেখগুলি সম্ভবতঃ এই যুগের অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দের।

ইউনানের ক্ষমতাশালী থাইদের নান-চাও রাজ্যের প্রতিষ্ঠা প্যু-দের পক্ষে বিপদের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। অষ্টম ও নবম শতাব্দে উধ্বতন বর্মায় নান-চাও-এর থাইরা প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। রাজা কো-লো-ফং ৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে চীনাদের পরাজিত করেন এবং ইহার অল্পদিন পরেই চীন সাম্রাজ্যে আভ্যন্তরিক

গোলযোগ হওয়ায় ঐদিক হইতে তাঁহার কোনও বিপদের আশঙ্কা থাকে না। অতঃপর পশ্চিম দিক তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও তিনি প্যু রাজ্য আক্রমণ করেন। প্যু ও নান-চাও রাজ্যের সীমানা ও বর্তমান ভামো অঞ্চলে অবস্থিত চীন-বর্মা সীমানা একই ছিল। ৭৫৭ হইতে ৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে কো-লো-ফং ইরাবতী নদীর উর্ধ্বতন উপত্যকা অঞ্চল জয় করেন এবং প্যু রাজা ক্ষমতাশালী প্রতিবেশী রাজার আনুগত্য স্বীকার করেন বলিয়াই অনুমান হয়। কো-লো-ফঙ্গের পৌত্র ই-মিউ-সিন যখন অষ্টম শতাব্দের শেষভাগে চীন সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করেন ও দরবারে দূত প্রেরণ করেন প্যু রাজাও তখন তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। ৮০২ খ্রীষ্টাব্দে প্যু রাজা তাঁহার ভ্রাতা (বা পুত্র) শ্রী-প্রদেশের (সম্ভবতঃ ভামো বা তগউং) শাসক সুনন্দনকে দূতরূপে চীনের দরবারে পাঠান ও চীন সম্রাটকে উপহার দিবার জন্য এই সঙ্গে রাজসভা হইতে একদল সংগীতজ্ঞদেরও পাঠানো হয়। ৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে আর একবার এই দেশ হইতে দূত পাঠানো হয়। এই দেশ সম্বন্ধে চীনা বিবরণীতে যে উল্লেখ পাওয়া যায় সম্ভবতঃ এই দূতদের নিকট হইতেই তাহা প্রাপ্ত। চীনা বিবরণ অনুসারে প্যু দেশের আয়তন পূর্ব-পশ্চিমে ৫০০ মাইল ও উত্তর-দক্ষিণে ৭০০ কি ৮০০ মাইল ছিল। এই দেশের পূর্বে কাম্বোজরাজ্য এবং দক্ষিণে সমুদ্র অবস্থিত ছিল। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিমে (সম্ভবত: দক্ষিণ-পূর্বে) ছিল দ্বারবতী ও পশ্চিমে পূর্বভারত। ইহা উত্তরদিকে নান-চাও পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্যু-রা দাবি করিত যে আঠারটি রাজ্য তাহাদের আনুগত্য স্বীকার করে এবং ইহাদের বেশির ভাগ বর্মার দক্ষিণে অবস্থিত, কিন্তু অধীন রাজ্যগুলির তালিকায় পালেমবাঙ্গ, জাভা, শ্রাবস্তী প্রভৃতি নাম অন্তর্ভুক্ত থাকায় ইহার যথার্থতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ হয়। একটি তালিকায় আট বা নয়টি সুরক্ষিত নগর ও ২৯৮টি জাতি বা বসতির মধ্যে ৩২টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বসতির নামও দেওয়া আছে।

টাং রাজবংশের প্রাচীন ইতিহাসে প্যু-রাজ্য সম্বন্ধে যে বিবরণী পাওয়া যায় তাহার সারাংশ নিম্নে দেওয়া হইল :

"রাজার নাম মহারাজা। মহাসেন তাঁহার প্রধান মন্ত্রী। মসৃণ (glazed) ইটের তৈয়ারি নগর প্রাকারের পরিধি ছিল ২৭ মাইল। পরিখার ধারও ইট দ্বারা বাঁধানো ছিল। নগর প্রাকারের মধ্যে বহু সহস্র পরিবার বাস করিত। এখানে শতাধিক বৌদ্ধ আশ্রম ছিল এবং ইহাদের অঙ্গন ও ঘরগুলি সোনা ও রূপা দ্বারা অলংকৃত ছিল। হত্যাকার্যকে ঘৃণা করা ও জীবিতকে ভালোবাসাই তাহাদের রীতি ছিল। তাহাদের আইনে কোনওরূপ শাস্তি বা শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার উল্লেখ ছিল না। সাত বৎসর বয়স হইলে বালক বালিকা মাত্রেই মস্তক মুণ্ডিত করিয়া আশ্রমে আসিত এবং সঙ্ঘের শরণাপন্ন হইত। কুড়ি বৎসর বয়সেও বৌদ্ধধর্মনীতি সম্বন্ধে তাহাদের কোনওরূপ আকর্ষণ না জন্মিলে তাহারা আবার মাথায় চুল রাখিত এবং সংসারে ফিরিয়া আসিত। তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র রেশম-সূতী (Silk cotton) দ্বারা তৈয়ারি হইত। তাহারা কখনও রেশমের বস্ত্র ব্যবহার করিত না, কারণ রেশমবস্ত্র প্রস্তুত করিতে বহু রেশম-কীটের প্রাণনাশ হয়।"

মান-স্যু নামে আর একটি চীনা বিবরণীতে প্যু-দের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে "তাহারা বিনয় ও ভদ্রতাকে সম্মান করে। তাহাদের স্বভাব সৎ ও শান্তিপূর্ণ। তাহারা বেশি কথা বলা পছন্দ করে না। তাহাদের মধ্যে বহু জ্যোতিষী ও ভাগ্যগণনাকারী দেখা যায়।"

টাং রাজবংশের নূতন ইতিহাসে প্যু-দের সম্বন্ধে যে বিস্তৃত বিবরণ আছে, তাহার সারাংশ নিম্নে দেওয়া হইল :

"এখানে বারটি প্রবেশদ্বার আছে এবং ইহাদের প্রতি কোণে একটি করিয়া মোট চারিটি প্যাগোডা (মন্দির) অবস্থিত। অধিবাসীরা সকলেই প্রাকারের ভিতরে বাস করে। তাহারা সীসা

ও টিন দ্বারা টালি নির্মাণ করে এবং লিচি (Lychee) গাছের কাঠ ব্যবহার করে। তাহারা জ্যোতিষশাস্ত্র জানে ও বৌদ্ধধর্ম ভালবাসে। এইখানে একটি ১০০ ফুট উচ্চ সাদা মূর্তি আছে (মান-স্থু অনুসারে ইহা রাজপ্রাসাদের প্রবেশদ্বারের ঠিক সম্মুখভাগে অবস্থিত ছিল)। তাহাদের মুদ্রা অর্ধাচন্দ্রাকারে সোনা ও রূপা দ্বারা তৈয়ারি হইত (মান-স্থু অনুযায়ী খালি রূপার)। ইহারা প্রতিবেশী জাতিগুলির সহিত অনেক রকম জিনিসের, বিশেষতঃ মসৃণ বাসনপত্র ও মাটির পাত্রের, বাণিজ্য করিত। বিবাহিতা স্ত্রী-লোকদিগের চুল মাথার উপরে খোপা করিয়া বাঁধা এবং রূপা ও মুক্তার মালায় সজ্জিত থাকিত। তাহারা নীল রং-এর রেশম সুতীর কাপড় ও পাতলা সিল্কের চাদর ব্যবহার করিত। ভ্রমণকালে তাহাদের হাতে একটি পাখা থাকিত। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের পাশে পাশে পাখা হাতে পাঁচ-ছয় জন চাকর চলিত। তাহাদের মধ্যে বাইশ রকম বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন ছিল ও এইগুলি আটটি বিভিন্ন পদার্থ হইতে নির্মিত হইত—ধাতুর দুই রকম; সামুদ্রিক জীবের খোলের এক; তারের সাত; বাঁশের দুই; লাউ খোলের দুই; চামড়ার দুই; হাতির দাঁতের এক; জানোয়ারের শিং হইতে দুই (বাদ্যযন্ত্র, বাদ্যকার ও নর্তকদিগের পোশাকের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে)। যে বারটি সংগীত তাহারা চীন দরবারে গাহিয়াছিল তাহার সবগুলিই বৌদ্ধ-বিষয়ক।"

বাদ্যযন্ত্রগুলি ভারতে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্রের অনুরূপ ছিল বলিয়াই মনে হয়। বাদ্যযন্ত্রের সংখ্যা ও বিভিন্নতা এবং সংগীত কলায় বিশেষ পারদর্শিতা দ্বারা চীন দরবারে তাহারা যে খুব প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল এই সব হইতে অনুমান করা যায় যে হিন্দুধর্মে অনুপ্রাণিত প্যু-রা সভ্যতার ক্ষেত্রে বেশ উচ্চস্থান পাইবার যোগ্য ছিল। তাহাদের লেখগুলি, শিল্পনিদর্শন ও চীনাদের বিবৃত তাহাদের রীতিনীতি হইতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়।

কখন ও কিভাবে প্যু-দের গৌরবময় সভ্যতার অবসান হইল সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা যায় না। ৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে নান-চাওর রাজা প্যু-রাজ্য আক্রমণ করেন। মান-সু অনুসারে আক্রমণকারীরা "প্যুর-র রাজধানী লুটপাট করে ও প্রায় তিন হাজারেরও অধিক লোক বন্দী করে, এবং তাহাদিগকে ইউনানফুতে দাসরূপে নির্বাসিত করে"। ইউনানফু নান-চাওর পূর্ব অংশের রাজধানী। একদল পণ্ডিতের মতে ইহাই প্যু সভ্যতার হঠাৎ অবসানের কারণ। কিন্তু পেলিও (Pelliot) প্রমাণ করিয়াছেন যে ইহার পরেও প্যু রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল এবং ৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে এখান হইতে চীন রাজ্যে দূত পাঠানো হয়।

চীনা বিবরণ হইতে মনে হয় নবম শতাব্দে উর্ধ্বতন বর্মা ও মধ্যবর্মা—অন্ততঃ ইহাদের একটি বৃহৎ অংশ—প্যু রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু নবম শতাব্দের পরে এই রাজ্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। মনে হয় যে এই সময়ে তাহারা দক্ষিণের মোনদের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হয় এবং তাহাদের রাজধানী ইরাবতীর তীরে আরও উত্তরে, সম্ভবতঃ পাগানে, স্থানান্তরিত হয়।

যখন একাদশ শতাব্দের মধ্যভাগে ব্রহ্মগণ (বর্মন) পাগানে প্রাধান্য লাভ করে তখন তাহারা মোনদের ধর্ম ও লিপি গ্রহণ করে। ইহা দ্বারা প্রচলিত কাহিনীর সমর্থন পাওয়া যায় যে মোনরা প্যু রাজ্য অধিকার করে ও প্রোম সহ প্যু রাজ্যের দক্ষিণ অংশ মোন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। দক্ষিণ হইতে মোন ও উত্তর হইতে ব্রহ্মদের আক্রমণের ফলে প্যু-জাতি ক্রমশঃ সকল প্রকার রাজনৈতিক অধিকার হারায় ও শেষপর্যন্ত ক্ষমতাশালী প্রতিবেশীদের মধ্যে মিশিয়া যায়। পরবর্তীকালে বর্মার ইতিহাসে প্যু-দের সম্পূর্ণরূপে অনুল্লেখ থাকিবার ইহাই একমাত্র সন্তোষজনক কারণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

৩। তাম্রপট্টন ও বৈশালী (আরাকান)

আরাকান বঙ্গোপসাগরের উপকূলে প্রায় ৩১০ মাইল বিস্তৃত এবং বর্মা হইতে আরাকান-ইয়োমা নামে পর্বতমালা দ্বারা বিচ্ছিন্ন। ইহার উত্তর অংশকে পূর্বভারতের বিস্তৃতি বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এই অংশ সারি সারি পর্বতমালা দ্বারা বিচ্ছিন্ন ও এখানে ম্যু ও কলদন নামে দুইটি নদী প্রবাহিত। ইহার দক্ষিণ অংশের, বিশেষতঃ সাণ্ডোয়ে (Sandoway) প্রদেশের, ইতিহাস অনেকটা পৃথক।

বর্মার মত আরাকানেও প্রথম যুগের ভারতীয় উপনিবেশকারী-দের সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে, এবং কয়েকটি বর্মা কাহিনীতে বলা হইয়াছে যে আরাকানের রাজবংশ উর্ধ্বতন বর্মার তগউঙ্গের ভারতীয় রাজবংশেরই একটি শাখা। কাহিনীগুলিতে 'কনরান', প্যু, শান ও অন্যান্য বর্মী জাতি দ্বারা আরাকান আক্রান্ত হইবার কথাও আছে। এইসব কাহিনীর সত্যতা যাহাই হউক, এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই যে জাতি ও ভাষার দিক দিয়া আরাকানবাসীদের সহিত বর্মীদের সম্বন্ধ ছিল।

ভৌগোলিক অবস্থানের নিমিত্ত ইহা খুবই সম্ভব যে আরাকানে ভারতীয় উপনিবেশ এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রচার বর্মা অপেক্ষা অনেক পূর্বে—সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় অব্দের অনেক আগেই—প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু এই প্রথম যুগের কোনওরূপ নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না।

আরাকানে প্রচলিত কাহিনী অনুসারে বারাণসীর এক রাজার পুত্র আরাকানে প্রথম ভারতীয় রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন ও রামাবতী নামে নগরে রাজধানী স্থাপিত করেন। দ্বিতীয় রাজবংশ আরাকান প্রদেশের এক ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পূর্ববর্তী রাজবংশের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বংশের এক কন্যা হইতে তৃতীয় রাজবংশের উৎপত্তি হয়। এই বংশীয় রাজারা ধন্যবতী

নামক নগর হইতে রাজত্ব করেন ও এই নাম হইতে সমস্ত আরাকান ধন্যবতী নামে পরিচিত হয়। উর্ধ্বতন বর্মার তগউঙ্গের এক ক্ষত্রিয় রাজা ছোট ভাইকে পূর্বপুরুষের রাজত্ব দান করিয়া আরাকানে আসেন ও এই বংশের রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া চতুর্থ রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজবংশ প্রথমে ক্যয়ুক-পণ্ডুযং (Kyauk-panduang) নামে পর্বতে ও পরে ধন্যবতীতে—বর্তমানে রখইঙ্গম্যু (Rakhaingmyu) নামে পরিচিত—রাজত্ব করে। ১৪৬ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্র সূর্য নামে এক রাজার রাজত্বকালে মহামুনি নামক বিখ্যাত বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হয় এবং ইহাই আরাকান রাজ্যের গৃহদেবতার আসন গ্রহণ করে।

অষ্টম শতাব্দে বেসালিতে (বৈশালী) নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রচলিত কাহিনী অনুসারে ৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মহা-তৈন চন্দ্র এই নূতন রাজধানী নির্মাণ করেন। কারণ পুরাতন রাজধানী ধন্যবতীতে তাঁহার পিতা সূর্যকেতুর রাজ্যকালে কোনওরূপ যুদ্ধ বা বিদ্রোহ হয় এবং সেইজন্য তিনি উহা পরিত্যাগ করেন। যে তগউঙ্গ রাজপুত্র আরাকানে চতুর্থ রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন সূর্যকেতু সেই বংশের ত্রিপঞ্চাশোত্তম রাজা ছিলেন। দশম শতাব্দীর শেষভাগে এই রাজ-বংশের সমাপ্তি হয় এবং বেসালি পরিত্যক্ত হয়। স্থানীয় কাহিনীতে এই অবসানের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট বেথালি গ্রামের কাছে সোয়েডাউঙ্গ বা স্বর্ণপর্বত* (Golden Hillock) নামে একটি সৌধের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায় ও এখানেই প্রাচীন রাজধানী বেসালির রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল বলিয়া মনে হয়। কাহিনীতে আরও বলা হইয়াছে যে রাজা চুল-তৈন চন্দ্রের একদল খারাপ সঙ্গী জুটিয়াছিল ও রাজা ইহাদের সহিত রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং শেষ পর্যন্ত আর ফিরিয়া আসেন নাই। ইহা ৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ঘটে। ইহার কিছুকাল পরে আরাকানের পার্বত্য অঞ্চলের ম্রোন জাতির অধিপতি অম্রতু বিশ্বাসঘাতকতা

করিয়া বৈশালীর সিংহাসন অধিকার করে এবং মৃত রাজার রাণী চন্দদেবীকে বিবাহ করে। ম্রোন রাজার ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া প্যু-রাজা ৯০,০০০ লোক সহ আরাকান আক্রমণ করেন। বৈশালীর পরবর্তী রাজা অম্রতুর ভ্রাতুষ্পুত্র সোয়েডাউঙ্গের কাছেই প্যু রাজাকে বাধা দেয় ও তাহাকে পরাজিত করে। ৮০,০০০ প্যু সৈন্য নিহত হয় ও অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া প্যু রাজা পলায়ন করেন। যে স্থানে প্যু রাজার ও সৈন্যদের সোনা ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি প্রোথিত ছিল সেইস্থান সোয়েডাউঙ্গ দ্বারা চিহ্নিত। এই ঘটনা ৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বা কিছু পরে ঘটে। ১০১৮ খ্রীষ্টাব্দে বা কাছাকাছি সময়ে বৈশালী পরিত্যক্ত হয়।

বর্মায় প্রচলিত কাহিনীগুলির মত এই কাহিনীগুলিতেও কিছু সত্যের আভাষ পাওয়া যায়। গুপ্তযুগের অক্ষরে উৎকীর্ণ লিপি সহ একটি বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কারের দ্বারা এখানে খ্রীষ্টীয় অব্দের প্রথম দিকে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপনের ও বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথম যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না, কিন্তু কাহিনীতে যে সময়ের কথা বলা হইয়াছে সেই সময়ে চন্দ্র রাজবংশ যে এখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহার স্পষ্ট প্রমাণ মুদ্রা ও লেখগুলি হইতে পাওয়া যায়। ধর্মচন্দ্র, প্রীতিচন্দ্র, ধর্মবিজয়, নীতিচন্দ্র ও বীরচন্দ্র নামে রাজাদের বহুসংখ্যক মুদ্রা আরাকানের বিভিন্ন অংশ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। নীতিচন্দ্র ও বীরচন্দ্রের প্রস্তর-লেখ বেসালিতে পাওয়া গিয়াছে এবং তাঁহারা সম্ভবতঃ ষষ্ঠ শতকের প্রথম অর্ধে রাজত্ব করিতেন। এই স্থানের নিকটে এই যুগের একখানি তাম্র-শাসনও পাওয়া গিয়াছে।

ম্রোহোং নামক স্থানে শিথোং মন্দিরে রক্ষিত একটি স্তম্ভগাত্রে যে লেখটি উৎকীর্ণ আছে. ইতিহাসের দিক দিয়া তাহাকে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান মনে করা যাইতে পারে। ইহা 'দেবাণ্ডজান্বয়' অথবা 'শ্রীধর্মরাজাণ্ডজ' বংশজাত রাজা আনন্দচন্দ্রের প্রশস্তি। এই দুইটি

সংজ্ঞা হইতে অনুমিত হয় যে এই বংশ বিষ্ণুর বাহন গরুড় হইতে উদ্ভূত বলিয়া দাবি করিতেন। এই লেখটিতে তিন ভাগে এই বংশের রাজাদের নাম ও তাঁহাদের রাজ্যকাল দেওয়া হইয়াছে। প্রথম ভাগের তালিকাভুক্ত রাজাদের মোট রাজ্যকাল হাজার বছরেরও বেশি—ইহা সম্পূর্ণ কিংবদন্তী মূলক। দ্বিতীয় তালিকায় তেরজন রাজা—মোট রাজ্যকাল ২৩০ বৎসর। তৃতীয় তালিকাতে আনন্দচন্দ্রের পূর্ববর্তী আটজন রাজার নাম আছে—তাঁহাদের মোট রাজ্যকাল ১১৯ বৎসর। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালিকার এই একুশজন রাজা সম্ভবতঃ ৩৭০ হইতে ৭২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

এই লেখটি আনন্দচন্দ্রের রাজ্যকালের এবং ইহাতে বলা হইয়াছে যে ইনি বহু বিহার ও বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং অনেক সুন্দর সুন্দর তামার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রাজ্যের বিভিন্ন অংশ হইতে আগত সাধুদের তিনি প্রত্যহ লিনেনের বস্ত্র দান করিতেন এবং আর্যসংঘের ব্যবহারের জন্য রাজ্যের বহুস্থানে বাসগৃহ ও রাস্তা তৈয়ারি করিয়াছিলেন। তিনি পঞ্চাশজন ব্রাহ্মণকে ভৃত্যসহ জমি দান করিয়াছিলেন।

আনন্দচন্দ্রকে তাম্রপত্তনের রাজা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, সুতরাং ইহা আরাকানের প্রাচীন নাম বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। ঐতিহাসিক কাহিনীগুলিতে রাজধানীর নাম বৈশালী বলিয়া লিখিত আছে। সম্ভবতঃ উত্তর বিহারের প্রসিদ্ধ নগরের নামে এই নামকরণ হইয়াছিল। এই নগরের ধ্বংসাবশেষ ম্রো হৌং-এর আট মাইল উত্তর-পশ্চিমে বেথলি (বেসলি) গ্রামে ও ইহার নিকট এখনও দেখা যায়। প্রাচীন পরিখা ও রাজপ্রাসাদের প্রাকারের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। বর্তমানে বাঘ সিংহের আবাসস্থল ইহার চতুর্দিকের জঙ্গলে প্রাচীন অট্টালিকার ও ভাস্কর্যের যে ভগ্নাবশেষ ছড়ানো রহিয়াছে, তাহাতে মনে হয় এই নগর খুবই বড় ছিল। এগুলির উপর গুপ্তযুগের প্রভাবের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া

যায়। পূর্বোক্ত তিনখানি লেখ ব্যতীত বেসলি গ্রামে একটি ব্রঞ্জের ঘণ্টার উপর ষষ্ঠ শতকের অক্ষরে উৎকীর্ণ একটি সংস্কৃত লিপি এবং সম্ভবতঃ সপ্তম কি অষ্টম শতাব্দে খোদিত আর একটি লিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহা অসম্ভব নহে যে সম্পূর্ণ পৃথক না হইলেও একই রাজবংশের দুইটি শাখার চন্দ্র নামধারী রাজাদের একদল বেসলি ও অপর দল তাম্রপত্তনে রাজত্ব করিতেন। এই মতের সমর্থকরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে আনন্দচন্দ্র খুব সম্ভব বৌদ্ধ ছিলেন কিন্তু মুদ্রাগুলিতে শৈব ও বৈষ্ণব চিহ্ন দেখা যায়। কিন্তু এই প্রশ্ন বা পরবর্তীকালে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ চন্দ্র রাজবংশের সহিত ইহাদের কোনওরূপ সম্পর্ক ছিল কিনা তাহার মীমাংসা করা বর্তমানে সম্ভব নয়। ইহা অসম্ভব নহে যে পূর্বোক্ত চন্দ্র রাজগণ বাংলা দেশ হইতে নূতন একদল উপনিবেশকারীর আগমন সূচিত করে।

ঐতিহাসিক আখ্যানগুলির বিবরণ অনুসারে শান-রা (Shans) দশম শতাব্দে আরাকান আক্রমণ করে ও আঠারো বৎসর ইহা দখল করিয়া থাকে। ইহা সম্ভবতঃ প্যু আক্রমণকে নির্দেশ করে। কারণ এই সময়ে শানদের এতদূর অগ্রসর হওয়ার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। অবশ্য এরূপও হইতে পারে যে পরবর্তীকালের শান আক্রমণের সহিত গোলমালই এই ভুলের মূল।

আরাকানে এ পর্যন্ত যে সব ভাস্কর্যের নমুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা সবই বৌদ্ধধর্মীয়, কিন্তু আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে মুদ্রায় শৈব ও বৈষ্ণব চিহ্ন দেখা যায়। সম্ভবতঃ রাজা বা জনসাধারণ প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্মানুরাগী ছিল কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মেরও প্রভাব ছিল। আনন্দচন্দ্রের লেখ হইতেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়, কারণ তিনি যে নিজে বৌদ্ধ ছিলেন তাহা পরিষ্কার বুঝা যায়, তবু পঞ্চাশজন ব্রাহ্মণকে জমি দান করিয়াছিলেন।

উত্তর আরাকান বর্মী রাজা অনিরুদ্ধ দ্বারা বিজিত হইয়াছিল, কিন্তু দেশের দক্ষিণ অংশে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে

উত্তর আরাকানে বর্মী আধিপত্য নামে মাত্র ছিল, ইহার শাসনকার্য এই দেশের রাজাদের উপরই ন্যস্ত ছিল। পাগানের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই বর্মী আধিপত্যের অবসান হইল, কিন্তু দেখা যায় যে চতুর্দশ শতাব্দে এই দেশবাসীরা আভা রাজদরবারে দেশের রাজা নির্বাচন করিয়া দিবার প্রার্থনা জানাইত এবং মাঝে মাঝে বর্মী ও তলইঙ্গ এই উভয় জাতিই এই দেশে হানা দিত। ১৪০৪ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানের রাজা বর্মীদের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া বাংলাদেশে পলায়ন করেন এবং গৌড়ের মুসলমান সুলতানের সাহায্যে ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্য উদ্ধার করেন। ম্রোহৌং নগরে তিনি নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় হইতে আরাকানের বৌদ্ধ রাজারা তাহাদের নামের সহিত মুসলমান উপাধি যোগ করে। খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে কয়েকজন বাঙ্গালী মুসলমান এই রাজাদের সভায় ছিলেন এবং তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে আলাওল ও দৌলৎ কাজী সমধিক প্রসিদ্ধ।

লেম্রো (অঞ্জ নদী) ও কলদন নদীর মধ্যে যে জলবিভাজিকার (water-shed) সৃষ্টি হইয়াছে সেই শিলাময় সমতল ভূমিতে ম্রোহৌঙ্গ অবস্থিত। এখানে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দে স্থাপত্য-শিল্পের খুব অনুশীলন হইয়াছিল এবং বৌদ্ধধর্মীয় প্রধান প্রধান পাথরের মন্দির ও ভাস্কর্যের নমুনাগুলি এই সময়ে তৈয়ারি হইয়াছিল। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ম্রোহৌং আরাকানের রাজধানী ছিল। এই সময়ে বর্মী রাজা আরাকান জয় করিয়া স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

৪। অরিমর্দনপুরের উত্থান

সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে ভগবানের নামসূচক সংস্কৃত ব্রহ্মা শব্দ হইতে ব্রহ্মা বা বর্মী জাতির নামের উৎপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু

ইহাই খুব সম্ভব যে ম্রম (অথবা মাম্ম) নামে তিব্বত-দ্রাবিড় জাতির এক শাখা বর্মায় গিয়া বসতি স্থাপন করে এবং কালক্রমে তাহাদের নামে সমস্ত দেশ ও দেশের বিভিন্ন জাতির লোক পরিচিত হয়। আবার কেহ কেহ অনুমান করেন যে এই জাতি বহুকাল ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে বাস করিয়াছিল এবং ঐ নদের নাম হইতে এই জাতির নামের উৎপত্তি।

বর্মী আখ্যায়িকায় বলা হইয়াছে যে ম্রম্ম ও প্যু-রা একই জাতির দুইটি শাখা। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহের কারণ আছে। যদি কোনও সম্বন্ধ থাকে তাহা অতি সামান্য। যখন শ্রীক্ষেত্রে (প্রোমের নিকট) প্যু-রাজ্য ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত তখনও ম্রম্ম জাতিদের মধ্যে ভদ্র আচার ব্যবহার বা অক্ষর-পরিচয় ছিল না। একাদশ শতাব্দের আগে তাহারা কোনরূপ রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছিল এরূপ কোও প্রমাণও পাওয়া যায় না। আখ্যায়িকায় বর্ণিত প্যু ও ম্রম্মের মিলনের ফলে বর্মীদের উৎপত্তি তো দূরের কথা, প্রকৃতপক্ষে ম্রম্মরা সভ্যতার অতি প্রয়োজনীয় উপাদান সমূহ, যথা ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য প্রভৃতি বিজিত বিদেশী মোনদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিল, প্যু-দের নিকট হইতে নহে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে ম্রম্মদের সহিত হিন্দু ধর্মে অনুপ্রাণিত প্যু-দের বিশেষ কোনও সম্বন্ধ ছিল না এবং একাদশ শতাব্দে ম্রম্মরা যখন একদা প্যু অধিকৃত অঞ্চলে প্রাধান্য লাভ করে তখন প্যু-সভ্যতার সামান্যই অবশিষ্ট ছিল।

প্যু-দের সম্বন্ধে যাহা জানা যায় তাহাতে তগউঙ্গের হিন্দু রাজ্য সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনী ম্রম্ম অপেক্ষা প্যু-দের প্রতিই অধিকতর প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয়।

কোন্ সময়ে কি ভাবে ম্রম্মরা রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, সে বিষয়ে কিছু জানিতে পারা যায় না। সম্ভবতঃ ঊর্ধ্বতন বর্মায় নানচাওদের আক্রমণে প্যু-দের শাসন দুর্বল হইয়া পড়ার সুযোগে ম্রম্মরা স্বাধীনভাবে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে পরবর্তী

কালে দক্ষিণের প্রতিবেশী মোনদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্যু-রা যখন উত্তরদিকে সরিয়া আসে, সেই সময় ব্রহ্মরা ক্রমশঃ তাহাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী প্যু-রা শ্রীক্ষেত্র (প্রোম) হইতে বিতাড়িত হইয়া ইরাবতী নদীর তীরে আরও ঊর্দ্ধে পাগানে নূতন রাজধানী স্থাপন করে। ইহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে, অল্পকালের মধ্যেই পাগান ব্রহ্ম শক্তির কেন্দ্র স্বরূপ হইল এবং এখানে শক্তিশালী ব্রহ্মদের রাজধানী স্থাপিত হইল।

খুব সম্ভব বহু সংখ্যক ব্রহ্ম নবম বা দশম শতাব্দে বর্মায় আসে এবং তাহাদের প্রথম ও প্রধান বসতি ক্যায়ুকসে (Kyaukse) প্রদেশেই গড়িয়া উঠে। বর্মার জাতীয় অব্দ ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে শুরু হইয়াছে এবং আখ্যায়িকাগুলিতে ইহা একজন পাগান রাজার কীর্তি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে ঐ বৎসরে এই-শহরে ব্রহ্ম শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এরূপ মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু এই অব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না; এবং এই বিষয়ে পণ্ডিত-গণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। সর্বশেষ মতবাদ অনুসারে এই অব্দ উল্লিখিত প্রোমে প্রতিষ্ঠিত পূর্বোক্ত প্যু-জাতীয় বিক্রম রাজবংশ দ্বারা প্রচলিত হইয়াছিল।

কতকগুলি আখ্যায়িকা অনুসারে পাগান নগর ৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজা প্যাঞপ্য (Pyanpya) দ্বারা স্থাপিত হয়। ইহার প্রাচীন নাম অরিমর্দনপুর। এই রাজ্যের নাম ছিল তাম্রদিপ এবং ঐ অঞ্চলের নাম ছিল তত্ত-দেশ। অরি নামে একদল বিধর্মী ইহার নিকটবর্তী অঞ্চলে দশম শতাব্দে যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। আখ্যায়িকা লেখকেরা পাগানে অনুউরথের সিংহাসন আরোহণের পূর্বে আরও অনেক রাজার উল্লেখ করিয়াছে কিন্তু ইহাদের মধ্যে স-রহন নামে মাত্র

একজনের নাম লেখতে পাওয়া যায়। ইনি পাগানের আট মাইল পূর্বে তুরণ পর্বতে একটি বৌদ্ধ সীমা (দীক্ষাগৃহ) নির্মান করেন।

বর্মায় প্রচলিত কাহিনী অনুসারে থেইন্‌কে (সিংহ) নামে পাগানের এক রাজা বনের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্ষুধিত হইয়া এক কৃষকের ক্ষেত্র হইতে একটি শশা ভক্ষণ করেন এবং এই অপরাধের জন্য ঐ কৃষক তাঁহাকে হত্যা করে। আরও আশ্চর্যের কথা এই যে উক্ত কৃষক বিধবা রাণীর সহায়তায় রাজা হয়। কৃষক রাজা স-রহন ক্যউঙ্গপ্যু কর্তৃক পরাজিত হন। কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তি ও তাহার পুত্র অনউরথকে স-রহনের দুই পুত্র সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করিতে বাধ্য করে ও তাহারা দুইজন যথাক্রমে রাজ্য শাসন করিতে থাকে। ইহাদের মধ্যে কনিষ্ঠ-জনকে অনউরথ দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করিয়া হত্যা করে। ইহার পরে অনউরথ তাঁহার পিতার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

অন্যান্য অনেক কাহিনীর সমগোত্রীয় এই কাহিনীটিকে আরও প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না, তবে ইহা হইতে এটুকু বোঝা যায় যে পাগান রাজ্যের ক্ষমতা বা বিস্তৃতি খুব বেশি ছিল না।

অনউরথের সিংহাসন আরোহণের সময় হইতে ব্রহ্মদের ইতিহাসের ঘটনাবলী সম্বন্ধে পরবর্তী কালের যে বর্মী বিবরণ পাওয়া যায় তাহার সত্যতা লেখগুলির সাহায্যে নির্ণয় করা সম্ভব ও এইগুলি হইতে বহু ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। দেখা যায় যে পরবর্তী কালের বিবরণীতে যে সব তারিখের উল্লেখ আছে তাহাদের বেশির ভাগই ভুল। অবশ্য খাঁটি তারিখের সঙ্গে ইহাদের ব্যবধান খুব বেশি নয়, এবং রাজগণ যদিও ভারতীয় নামে পরিচিত ছিলেন তথাপি বিবরণীগুলিতে তাহাদের বর্মী উচ্চারণ ব্যবহার করার ফলে প্রকৃত ভারতীয় নাম নির্ণয় করা সব সময়ে সম্ভব নয়। বর্মী বিবরণ অনুসারে

অনউরথ ১০১০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হইয়াছিলেন। কিন্তু লেখ হইতে জানা যায় যে আসলে রাজার নাম ছিল অনিরুদ্ধ এবং তিনি ১০৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই কারণে বর্মার ইতিহাস আলোচনা কালে যে যে স্থলে সম্ভব লেখগুলির সাহায্যে রাজাদের ভারতীয় নাম ও তাঁহাদের রাজ্য কাল উল্লেখ করা হইবে। ম্রম্মদের সহিত প্যু-রা মিলিত হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই অনুমান হয় কারণ স্বতন্ত্র জাতি রূপে তাহাদের অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ নাই। অবশ্য মধ্যে মধ্যে ব্যক্তি বিশেষ বা ছোট ছোট দলের দ্বারা এই প্রাচীন জাতির নাম ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং এখন হইতে ম্রম্মদের আধুনিক বর্মী নামে নির্দেশ করা যাইতে পারে। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে বর্মার অধিকাংশ জায়গার স্থানীয় নাম ছাড়া একটি করিয়া ভারতীয় নাম ছিল। আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে পাগানকে অরিমর্দনপুর বলা হইত এবং তাহা ছাড়া সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত অন্যান্য নামেও ইহা পরিচিত ছিল। যেখানে যেখানে সম্ভব এই ভারতীয় নামগুলি সূচিত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

অরিমর্দনপুর সাম্রাজ্য

১। রাজশ্রেষ্ঠ অনিরুদ্ধ

অনিরুদ্ধের রাজত্ব বর্মীদের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে। তিনি পাগানের ক্ষুদ্র রাজ্যকে একটি বিশাল রাজ্যে রূপান্তরিত করেন। বর্তমান বর্মা দেশের অধিকাংশই ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং ইহার অশিষ্ট, নিরক্ষর লোকদের মধ্যে তিনি উচ্চ শ্রেণীর সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রচার করেন।

যে সময়ে অনিরুদ্ধ সিংহাসন আরোহণ করেন তখন অরি নামে এক বৌদ্ধ সম্প্রদায় উর্ধ্বতন বর্মার ধর্ম ও সামাজিক জীবনে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। অরিদের ধর্ম প্রণালী ছিল অতি নিকৃষ্ট ধরণের তান্ত্রিক ক্রিয়া কলাপে পূর্ণ এবং ইহার সহিত তাহারা এক নাগ ধর্মমত মিলিত করে—এই নাগধর্মে বুদ্ধদেব ও তাঁহার শক্তিগণের একটি বিশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। অরিরা লম্বা চুল ও দাড়ি রাখিত, কালো পোষাক পরিত, অত্যধিক পরিমাণে মদ্যপান করিত, অশ্বারোহণ, কুস্তি, যুদ্ধ প্রভৃতিতে লিপ্ত থাকিত, এবং মায়া ও যাদুমন্ত্রের অধিকারী বলিয়া ভান করিত। তাহারা নামে মহাযান বৌদ্ধধর্মমতের অনুগামী ছিল কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐ মতের তিব্বতী পদ্ধতিই তাহাদিগকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। পাগানের কয়েক মাইল দক্ষিণ-পূর্বে থমতি নামক স্থানে অরিদের 'ত্রিশ জন গুরু ও তাহাদের ৬০,০০০ শিষ্যের' প্রধান ঘাঁটি ছিল এবং তাহাদের শিক্ষা ও কর্তৃত্ব রাজা ও জনসাধারণ মানিয়া লইয়াছিল।

প্রাচীন বিবরণী হইতে জানা যায় কিরূপে অরহন বা ধর্মদর্শী নামে থটনের একজন ব্রাহ্মণ ভিক্ষু অনিরুদ্ধকে বৌদ্ধধর্মের বিশুদ্ধ থেরবাদে দীক্ষিত করেন। রাজার সহানুভূতিতে উৎসাহিত হইয়া অরহন দক্ষিণে মোন দেশ হইতে আরও কিছু ভিক্ষু সংগ্রহ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাহারা শক্তিশালী অরি সম্প্রদায়ের সহিত ধর্মযুদ্ধ আরম্ভ করে। অনিরুদ্ধ ও অরহনের চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়। অরিদের ক্ষমতার অবসান হয়; তাহাদের অনেকে পূর্বদিকে শান রাজ্যে আশ্রয় লয় ও অবশিষ্টেরা শান্তিপূর্ণ কৃষকের জীবন গ্রহণ করে। এইরূপে রাজার দ্বারা একটি বড় রকমের ধর্ম সংস্কার সাধিত হয়। তখন নূতন ধর্মের শাস্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজন দেখা দেয়; কারণ ইহার সাহায্য ব্যতীত ধর্মের উন্নতি বা দৃঢ়রূপে ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। থটনের মোন রাজ্য হইতে সম্পূর্ণ বৌদ্ধ ত্রিপিটক সংগ্রহ করিবার জন্য অরহন রাজাকে অনুরোধ করিলেন। এই উদ্দেশ্যে রাজা মোন রাজ্যে দূত পাঠাইলেন। কিন্তু মোন রাজা গ্রন্থ দিতে অস্বীকার করিলেন, উপরন্তু রাজার দূতকে অপমান করিলেন। অনিরুদ্ধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিফল হইয়া বলপূর্বক গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে মনস্থ করিলেন এবং একদল সৈন্য লইয়া থটন অবরোধ করিলেন। তিনমাস অবরোধের পরে থটন আত্মসমর্পন করিল। বিজয়ী অনিরুদ্ধ পাগানে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার সহিত সোনার শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাজবন্দী মনুহ, ঐ দেশের সকল ভিক্ষু ও বহু বন্দী লইয়া আসিলেন। বন্দীদের মধ্যে অনেক শিল্পী ও কারিগর ছিল। সমস্ত লুণ্ঠিত জিনিসের মধ্যে বিজিত রাজার বত্রিশটি শ্বেত-হস্তি-বাহিত বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ও প্রাচীন ধর্মীয় নিদর্শন (relics) গুলি রাজার কাছে অমূল্য সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইল। পথে অনিরুদ্ধ প্রাচীন প্যু-রাজ্যের রাজধানী শ্রীক্ষেত্রের (প্রোমের নিকট) প্রাকার ভাঙিয়া ফেলিলেন ও বহু

শতাব্দী ধরিয়া এখানকার মন্দিরে রক্ষিত ধর্মীয় নিদর্শনগুলি লইয়া আসিলেন। পেগু প্রদেশ ছাড়া সমস্ত বদ্বীপ অঞ্চল তাঁহার শাসনাধীন হইল ।

ইহার পরে অনিরুদ্ধ উত্তর আরাকানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন ও সেখানকার রাজাকে পরাজিত করিলেন। পূর্ব দিকের শান রাজারাও তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করিল। বর্মাদেশের সীমানার বাহিরে কোনও কোনও রাজ্য জয় করার কৃতিত্ব অনিরুদ্ধকে দেওয়া হয়। বলা হইয়াছে যে তিনি 'ভারতের অন্তর্গত বাংলা দেশ' দর্শন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ আরাকানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা কালে তিনি চট্টগ্রাম প্রদেশে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন ; কিন্তু সেই অঞ্চলে যে কোনওরূপ জয়লাভ করিয়াছিলেন এরকম কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। অবশ্য বর্মী বিবরণীগুলিতে তাঁহার রাজ্যের সীমানারূপে ত্রিপুরা প্রদেশের অন্তর্গত পট্টিকের নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। পূর্বদিকে অনিরুদ্ধ তাঁহার বিজয়ী সেনা-দলকে বর্মার বহুকালের শত্রু নানচাও-এর থাইদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করেন। বলা হইয়াছে যে তিনি ঐ রাজ্যের রাজধানী তলি অবরোধ করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সন্ধি স্থাপন হয় ও দুই রাজার মধ্যে উপহারের আদান প্রদান হয়। ফিরিবার পথে অনিরুদ্ধ শান রাজ্যগুলির মধ্য দিয়া আসেন এই দেশের রাজারা তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেন এবং তিনি ইঁহাদের একজনের কন্যাকে বিবাহ করেন। উত্তর শ্যামে অবস্থিত চিয়েঙ্গ মইর রাজা পেগু আক্রমণ করিলে অনিরুদ্ধ তাঁহার সৈন্যদলের মধ্য হইতে উৎকৃষ্ট একদল ভারতীয় সেনাদলকে তাহার বিরুদ্ধে পাঠান এবং এই সেনাদল আক্রমণকারীকে বিতাড়িত করে।

অনিরুদ্ধ বিস্তারিত ভাবে জল সেচ প্রণালীর ব্যবস্থা করেন

ও এই উপায়ে ক্যায়ুক্‌সে (Kyaukse) অঞ্চল বর্মার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উর্বরা ভূমিতে পরিণত হয়। ভারতবর্ষের বৈশালী দেশের রাজকুমারী পঞ্চকল্যাণীকে অনিরুদ্ধ বিবাহ করেন এবং তাঁহার ভারতবর্ষ হইতে বর্মায় যাইবার পথে বিচিত্র ঘটনার ইতিহাস প্রাচীন বিবরণগুলিতে পাওয়া যায়।

অনিরুদ্ধর দেশজয়ের ফলে বর্মা দেশে গুরুতর পরিবর্তন ঘটে। টেনাসেরিম বাদে প্রায় সমস্ত বর্মা দেশে তাঁহার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং এইরূপ রাজনৈতিক একতা বর্মার ইতিহাসে সম্ভবতঃ ইহার পূর্বে আর কখনও ঘটে নাই। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা মোনদের প্রভাবে বর্মী সংস্কৃতির আমূল পরিবর্তন। বর্মীরা তাহাদের ধর্ম, লিপি, ধর্মসাহিত্য সমস্তই গ্রহণ করে এবং মোন রাজ্য যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল তখন পাগানে মোন সংস্কৃতির এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। ইহার পূর্বে কখনও কোনও বিজয়ী শক্তিকে বিজিতদের দ্বারা এইরূপ প্রভাবিত হইতে দেখা যায় নাই। প্রাচীন রোম ও গ্রীসের উদাহরণকেও ইহা ছাড়াইয়া গিয়াছে। এই সময় হইতে পাগানের রাজারা বৌদ্ধধর্মের হীনযান মতবাদের পৃষ্ঠপোষক হইয়া উঠিলেন। এতদিন পর্যন্ত যে মতবাদ কেবল নিম্ন বর্মায় প্রচলিত ছিল, এই সময় হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত তাহা সমস্ত দেশে প্রতিষ্ঠিত আছে।

নূতন ধর্মে দীক্ষিতের প্রবল উৎসাহ অনিরুদ্ধর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। তিনি বহু সংখ্যক প্যাগোডা বা মন্দির ও আশ্রম নির্মান করেন। তাঁহার পরবর্তী রাজগণও তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। এই মহৎ রাজার ধর্ম বিশ্বাসে একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ দেখা যায়। পূজা-ফলকগুলির (Votive tablets) আরম্ভে সুপরিচিত বৌদ্ধ সূত্র "যে ধর্ম" প্রভৃতি খোদিত আছে, কিন্তু শেষ অংশে "মহাশ্রমণ অর্থাৎ বুদ্ধদেব এইরূপ বলিলেন"—

ইহার পরিবর্তে দেখা যায় "অনিরুদ্ধদেব এইরূপ বলিলেন"। নূতন ধর্ম গ্রহণকারীর উৎসাহের আতিশয্যের ইহা একটি বিচিত্র নিদর্শন।

অনিরুদ্ধর নাম ও যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং তিনি বৌদ্ধ ধর্মের রক্ষাকর্তা রূপে পরিচিতি লাভ করিয়াছিলেন। যখন চোল রাজা সিংহল দেশ আক্রমণ করেন তখন ঐ দেশের রাজা প্রথম বিজয়বাহু তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য অনিরুদ্ধকে আসিতে বলেন ও এই উদ্দেশ্যে জাহাজ পাঠাইয়া দেন। যখন বর্মা রাজার সাহায্য ছাড়াই সিংহলের রাজা আক্রমণকারীকে বিতাড়িত করিলেন তখন শত্রু কর্তৃক ধ্বংসের সংস্কার সাধনের জন্য কিছু ভিক্ষু ও ধর্মপুস্তক পাঠাইবার জন্য সিংহলের রাজা অনিরুদ্ধকে অনুরোধ করিলেন। অনিরুদ্ধ এই অনুরোধ রক্ষা করিলেন, কিন্তু ইহার পরিবর্তে সিংহলে রক্ষিত অমূল্য পবিত্র স্মারকচিহ্ন (Relic) বুদ্ধদেবের দাঁতটি চাহিলেন। সিংহলের রাজা ইহার একটি প্রতিরূপ (duplicate) তাঁহাকে পাঠাইলেন। যখন রত্নখচিত আধারে রক্ষিত এই স্মারক চিহ্নটি সহ জাহাজ পাগানের কাছে ইরাবতীর কূলে পৌছিল তখন ইহা গ্রহণ করিতে একটি বৃহৎ শোভাযাত্রা বাহির হইল। অনিরুদ্ধ নিজেই গলা পর্যন্ত জলে নামিয়া আধারটি গ্রহণ করিলেন ও ইহা মস্তকে করিয়া শোভাযাত্রাসহ স্মারক চিহ্নটি স্থাপন করিবার জন্য যে মন্দির নির্মাণ করা হইয়াছিল, সেইখানে গেলেন। এই মন্দিরটিই বিখ্যাত শোয়েজিগন প্যাগোডা ও এখানে এখন পর্যন্ত দলে দলে ভক্ত বর্মী পূজার উদ্দেশ্যে আসে।

২। ক্যানজিত্থ (Kyanzittha)

১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দে অনিরুদ্ধর মৃত্যু হয় ও তাঁহার পুত্র সলু (শল্য ?) রাজা হন। ইঁহার অপর নাম বজ্রাভরণ।

পেগুতে মোনরা বিদ্রোহ করে ও পাগান পর্যন্ত অগ্রসর হয়। রাজা তাঁহাদের হাতে বন্দী ও ১০৮৪ খ্রীষ্টাব্দে নিহত হন।

ক্যানজিথ নামে অনিরুদ্ধের বৈশালী দেশের কন্যার গর্ভজাত পুত্র দেশের উত্তর অঞ্চলে পলাইয়া গিয়াছিলেন। তিনি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া তাহাদের পরাজিত করেন। ১০৮৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অভিষেক হয় ও এই সময়ে তিনি শ্রীত্রিভুবনাদিত্য ধর্মরাজ নাম গ্রহণ করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীগণও সম্ভবতঃ এই উপাধি ব্যবহার করেন। জন্মগ্রহণ কাল হইতে তাঁহার জীবনের প্রথম দিককার বহু বিচিত্র ঘটনাবলীর কথা আখ্যায়িকাগুলিতে পাওয়া যায় কিন্তু তাহাদের উল্লেখ এখানে অনাবশ্যক। তিনি একটি নূতন প্রাসাদ ও বহু প্যাগোডা নির্মাণ করেন। তিনি তাঁহার কন্যাকে পট্টিকেরের রাজপুত্রের সহিত বিবাহ দিতে চা'ন কিন্তু তাঁহার মন্ত্রীরা ইহাতে বাধা দেয়। ক্যানজিথের কন্যাকে বিবাহ করিতে না পারিয়া পট্টিকেরের রাজপুত্র শেষপর্যন্ত আত্মহত্যা করে এবং এই প্রেমের কাহিনী অবলম্বন করিয়া বহু বর্মী কাব্য ও নাটক রচিত হইয়াছে। এই নাটকগুলি এখন পর্যন্ত রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়।

ক্যানজিথের রাজ্যকালে বর্মার সহিত ভারতবর্ষের খুব নিকট সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। বহু বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ভারতবর্ষ হইতে তাঁহার রাজ্যে গিয়া বসতি স্থাপন করে। কথিত আছে যে রাজা তিন মাস যাবৎ প্রত্যহ নিজের হাতে আটজন ভারতীয় সাধুকে আহার দিতেন। এই সব সাধুদের নিকট হইতে ভারতীয় মন্দিরগুলির বর্ণনা শুনিয়া রাজা বিখ্যাত আনন্দ মন্দিরের নকশা তৈয়ারি করেন ও মন্দিরটি নির্মাণ করেন। এই আনন্দ মন্দিরটি বর্মা দেশের স্থাপত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া পরিগণিত হয়। এই কাহিনী সম্বন্ধে যে যাহাই ধারণা করুক, আনন্দ মন্দিরটির নকশা যে ভারতীয় আদর্শে পরিকল্পিত সে বিষয়ে সন্দেহের

কোনও অবকাশ নাই। আধুনিক কালের একজন ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করিয়াছেন :

"এখন পর্যন্ত দৈনিক প্রার্থনালয় রূপে ব্যবহৃত আনন্দ মন্দিরের শ্বেতবর্ণ কায় ও প্রভাতের সূর্যালোকে দীপ্ত স্বর্ণমণ্ডিত চূড়া পাগানের আশ্চর্য দৃশ্যগুলির অন্যতম। মন্দিরের অভ্যন্তরে একটি বিশাল বুদ্ধ মূর্তির পাদদেশে দুইটি প্রমাণ আকারের মনুষ্য মূর্তি জানু পাতিয়া উপবিষ্ট; তাহারা এইভাবে প্রায় আট শতাব্দীর উপর উপবিষ্ট আছে। এই মূর্তি দুইটির একজন রাজা ও অন্য-জন তাঁহার গুরু অরহন। রাজার মুখমণ্ডল বর্মীদের মত নয়—তাঁহার মাতা ভারতবর্ষীয়া ছিলেন।"

ক্যনজিথ তাঁহার পিতার আরব্ধ শোয়েজিগন প্যাগোডার নির্মাণ কার্য শেষ করেন এবং নিজেও প্রায় চল্লিশটি ছোট প্যাগোডা নির্মাণ করেন। তিনি বুদ্ধ গয়ার বিখ্যাত মন্দিরটিরও সংস্কার করেন। আখ্যায়িকাতে লেখা আছে :

"বিভিন্ন ধরনের রত্ন সমূহ সংগ্রহ করিয়া ক্যনজিথ গয়ার পবিত্র মন্দির নির্মাণের জন্য জাহাজে করিয়া পাঠান এবং সেখানে বরাবরের জন্য দীপ জ্বালিবার ব্যবস্থা করেন। রাজা অশোক নির্মিত গৃহগুলি পুরাতন ও ভগ্নদশা প্রাপ্ত হওয়ায় ক্যনজিথ এইগুলি নূতন করিয়া আরও সুন্দর ভাবে নির্মাণ করেন।"

কথিত আছে যে ক্যনজিথ ভারতবর্ষের এক চোল রাজাকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণে প্ররোচিত করেন। এই চোল রাজা বহু মূল্যবান উপহার সহ তাঁহার কন্যা বর্মী রাজাকে দান করেন।

দক্ষিণ আরাকানের বিরুদ্ধে ক্যনজিথ যুদ্ধযাত্রা করেন ও ইহার অধিপতিকে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। ১১০৩ ও ১১০৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্যনজিথ চীনে দূত পাঠান এবং তাঁহার স্থান চোল রাজাদের দূতের অগ্রে এইরূপ দাবি করেন। পাগান একটি স্বাধীন রাজ্য বলিয়া এই দাবি গ্রাহ্য হয়।

৩। অরিমর্দনপুরের পরবর্তী রাজগণ

১১১২ খ্রীষ্টাব্দে ক্যনজিথর মৃত্যু হয় ও সিংহাসনের উত্তরাধিকারী তাঁহার দৌহিত্র অলৌংসিথু বা জয়সূর পঞ্চান্ন বৎসর কাল রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজ্যকালে অনেক বিদ্রোহ দেখা দেয়। দক্ষিণ আরাকানের অধিপতি সীমান্তের গ্রামগুলি লুঠপাট করে; এই অপরাধে তাহার শিরশ্ছেদ করা হয়। রাজা নিজেই টেনাসেরিমের একটি বিদ্রোহ দমন করেন। উত্তর আরাকানের রাজা সিংহাসনচ্যুত হইয়া পাগানের রাজসভায় আশ্রয় লয়। অলৌংসিথু জল ও স্থল উভয় পথেই সৈন্য প্রেরণ করেন ও প্রকৃত অধিকারীকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। কৃতজ্ঞ আরাকানের রাজা ইহার প্রতিদান দিতে চাহিলে অলৌংসিথু তাঁহাকে বোধগয়ার মন্দির সংস্কার করিয়া দিতে বলেন; তিনি তাঁহার প্রতিনিধিকে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ দিয়া উক্ত কার্য সমাধা করিতে পাঠান।

অলৌংসিথুর বেশির ভাগ সময় ভ্রমণে কাটিত এবং বলা হইয়াছে যে তিনি মলয়, আরাকান ও বাংলা দেশে গিয়াছিলেন। আরও জানা যায় যে তিনি বুদ্ধদেবের দাঁত আনিতে একদল সৈন্য সহ নানচাও-এ যান, কিন্তু এই কার্যে বিফল হন। তিনি পাগানে বিখ্যাত থটপ্যিন্নু মন্দির ও কতকগুলি ছোট ছোট মন্দির নির্মাণ করেন। তিনি পট্টিকেরর রাজার এক কন্যাকে বিবাহ করেন। বৃদ্ধ বয়সে নরথু (নরসূর) নামে নিজের পুত্রের হস্তে তিনি নিহত হন ও ১১৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এই পুত্র সিংহাসন আরোহণ করে।

নরথু অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিলেন। তাঁহার বড় ভাই সিংহাসন দাবি করাতে তিনি প্রতারণা পূর্বক তাহাকে হত্যা করেন; এবং রাজবংশের আরও অনেক লোককে হত্যা করেন। তিনি সাধু ও সাধারণ লোকদিগকে সমানভাবেই পীড়ন করিতেন এবং শেষ পর্যন্ত স্বহস্তে তাঁহার বিমাতা পট্টিকেরর রাজকুমারীকে নিহত করেন। রাজকুমারীর পিতা এই হত্যার প্রতিশোধ লইতে

বদ্ধপরিকর হন। তাঁহার অনুচরদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আটজন এই কার্যে জীবন উৎসর্গ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। তাহারা নরথুর প্রাসাদে পুরোহিতের ছদ্মবেশে প্রবেশ করে এবং যখন রাজা তাহাদের আশীর্বাদ গ্রহণ করিতে আসেন তখন তাহারা তাহাদের পোশাকের ভিতরে লুকানো ছোরা বাহির করিয়া রাজাকে হত্যা করে। এইরূপে তিন বৎসর রাজত্ব করিয়াই এই নিষ্ঠুর রাজার মৃত্যু হয়।

নরথুর পরে তাঁহার পুত্র নরসিংহ (নরথেইঙ্খ) রাজ্যলাভ করেন কিন্তু রাজপ্রাসাদের আভ্যন্তরিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া তিন বৎসর রাজত্ব করিবার পরে তাঁহার অনুজ নরপতিসিথু কর্তৃক নিহত হন। ১১৭৩ খ্রীষ্টাব্দে নরপতিসিথু (দ্বিতীয় জয়সূর) সিংহাসন আরোহণ করেন এবং তাঁহার রাজ্যকালের উল্লেখযোগ্য বিষয় ধর্মসম্বন্ধীয় ব্যাপারে সিংহলের প্রাধান্য। সিংহলে বৌদ্ধধর্মের যে মতবাদ প্রচলিত ছিল তাহা ১১৯০-২ খ্রীষ্টাব্দে পাগানে প্রচারিত হয় ও শেষপর্যন্ত ইহা ১০৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অনিরুদ্ধ কর্তৃক প্রচারিত মোন দেশের বৌদ্ধ ধর্মের স্থান অধিকার করে। এই রাজা গবদব-পলিন (Gawdaw-Palin) ও সুলমণি নামে দুইটি সুন্দর মন্দির পাগানে নির্মাণ করেন ও জলসেচ প্রণালীর বিশেষ ব্যবস্থা করেন। তিনি তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র জয়সিংহকে (জয়থেইঙ্খ) উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন এবং ১২১০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

জয়সিংহ তিলোমিনলো (Htilominlo) ও ননতৌংম্য (Nantaungmya) এই দুইটি নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি রাজকার্য তাঁহার ভ্রাতাদের হস্তে অর্পণ করিয়া নিজে ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে, বিশেষতঃ মন্দির নির্মাণ কার্যে, আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বোধগয়ার বিখ্যাত মন্দিরের অনুকরণে মহাবোধি মন্দির এবং তিলোমিনলো নামে আর একটি সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেন।

জয়সিংহর পরে প্রথমে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নরসিংহ ও পরে অপর

পুত্র ক্যস্ব (Kyaswa, কাশ্যপ ?) ১২৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার ধর্মানুরাগ তাঁহার পিতার অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে ছিল, এবং তিনি বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন ও ধর্মপুস্তক রচনায় তাঁহার সময় অতিবাহিত করিতেন। মিনবু প্রদেশের বিখ্যাত কৃত্রিম হ্রদ এমারেল্ড লেক তাঁহারই কীর্তি।

ক্যস্ব-এর পুত্র উজন (উদয়ন ?) ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যলাভ করেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি তাঁহার পূর্ববর্তী দুই রাজা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ছিল। তিনি মদ্যপান ও মৃগয়ায় আসক্ত ছিলেন এবং হস্তি পদদলিত হইয়া ১২৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

৪। মোঙ্গল বিজয় ও বর্মারাজ্যের পতন

উজন-এর পরে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র নরসিংহপতি (নরথিহপতে) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সিংহসূরকে তাড়াইয়া রাজ্য লাভ করেন। এই রাজা অত্যন্ত ভোজনবিলাসী ছিলেন এবং গর্ব করিতেন যে তিনি প্রত্যহ তিনশত পাত্র ব্যঞ্জন গ্রহণ করেন ও তাঁহার উপপত্নীর সংখ্যা তিন হাজার। এই সময়ে রাজ্য যে বিপদের সম্মুখীন হইল তাহা প্রতিরোধ করিতে এই ধরনের রাজা মোটেই উপযুক্ত ছিলেন না। ১২৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গল রাজ কুবলাই খাঁ ইউনান অধিকার করেন। ১২৭১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিবার আদেশ জানাইয়া তিনি বর্মায় দূত পাঠান। এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়াতে ১২৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজদূত পাঠানো হয়। কিন্তু রাজদূত ও তাহার সঙ্গীরা প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বার বার জুতা খুলিতে অস্বীকার করায় নরসিংহপতি তাহাদিগকে ও তাহাদিগের বহু অনুচরদিগকে নিহত করেন। ইহার চারি বৎসর পরে ভামোর সত্তর মাইল উপরে অবস্থিত টপিং নদীর তীরে কাঙ্গাই নামক একটি রাজ্যের রাজা কুবলাইখাঁর আনুগত্য স্বীকার করার দরুন বর্মী রাজা ঐ রাজ্য আক্রমণ করেন। ইউনানের শাসনকর্তা বর্মী সেনাদলকে পরাজিত

করে। ১২৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বর্মীরা আবার সীমান্ত প্রদেশ আক্রমণ করে, কিন্তু পরাজিত হয় ও ইহাতে তাহাদের বহু ক্ষতি হয়। পরাজয়ের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নরসিংহপতি ভীত হইয়া পাগান হইতে বেসিনে পলাইয়া যান। মোঙ্গলরা বর্মাদেশ আক্রমণ করিল না এবং যখন বর্মী রাজা এক ভিক্ষু দ্বারা আনুগত্যের প্রস্তাব পেশ করিলেন তখন সহানুভূতিপূর্ণ উত্তর পাইলেন। কিন্তু এই পরাজয় ও কাপুরুষের ন্যায় রাজার পলায়নে চারি দিকে বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হইল এবং রাজার পুত্র তাঁহাকে বিষ খাওয়াইয়া হত্যা করেন (১২৮৬ খ্রী)। রাজার মৃত্যুর খবর পাইয়া মোঙ্গলেরা আক্রমণ করিতে মনস্থ করিল। কুবলাইখাঁর এক পৌত্রের অধীনে একদল সৈন্য পাগানে উপস্থিত হইল এবং এই নগরটি তাহার কর্তৃক 'ভীষণ রক্তপাত ও অগ্নিদাহের মধ্যে' ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। এইরূপে দুইশত চল্লিশ বৎসরের পর অনিরুদ্ধ প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের গৌরবোজ্জ্বল অস্তিত্বের লোপ হইল।

বর্মাদেশ কুবলাইখাঁ কর্তৃক পরাজিত হওয়ার ফলে এখানে রাজনৈতিক অনৈক্য ও সাংস্কৃতিক অবনতি দেখা দেয়। বর্মা দেশ এই সময় অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হইল। তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: (১) শান অধিকৃত উর্ধ্বতন বর্মা—ইহার রাজধানী প্রথমে পিন্য ও পরে ইরাবতী নদীর উপরের অংশের তীরে আভাতে অবস্থিত ছিল; (২) ব-দ্বীপের অন্তর্গত পেগুতে মোন অথবা তলাইঙ্গ রাজ্য; (৩) এই দুই রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত বর্মীয় তৌঙ্গু (Toungoo) রাজ্য। প্রাচীন বিবরণীগুলিতে এই রাজ্যগুলির শাসকদিগের মধ্যে অসংখ্য যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র, নৃশংসতা ও প্রতারণার বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। এই সময়ে চীন সাম্রাজ্যের সীমান্ত বর্মাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল এবং রাজনৈতিক হিসাবে বর্মাদেশ এই মহৎ সভ্যতা-কেন্দ্রের অধীন ছিল। সুতরাং চীনের প্রভাবে বর্মার সাংস্কৃতিক জীবনে

এক নূতন যুগের সূত্রপাত হইবে ইহাই অনুমান করা স্বাভাবিক। কিন্তু কার্যতঃ ঠিক ইহার বিপরীত দেখা গেল। এই সময় হইতে পরবর্তী দুইশত পঞ্চাশ বৎসর বর্মী সভ্যতার অন্ধকার যুগ। ছোট ছোট রাজ্যগুলির মধ্যে অনবরত যুদ্ধ হওয়ার ফলে জনসাধারণের শান্তি ও সমৃদ্ধি লোপ পায়; শিল্প ও সাহিত্য বিপন্ন হয়; এবং ভারতীয়েরা যে সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিল তাহা কোনও রকমে টিকিয়া থাকে। এই সময়ে কতকগুলি প্যাগোডা নির্মিত হইয়াছিল; কিন্তু ইহাদের বেশির ভাগ নির্মিত না হওয়াই বরং ভাল ছিল; কারণ, ইহাদের মধ্যে যেগুলি সর্বোৎকৃষ্ট সেই-গুলিকেও পাগানের মন্দির গুলির সহিত এক শ্রেণীতে দাঁড় করানো যায় না। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে আবার সমস্ত দেশ একটি রাজত্বের অধীন হয়, ভারতবাসী কর্তৃক প্রচারিত যে সভ্যতার আলোক এতদিন ম্লান হইয়াছিল, তাহা সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে, এবং দেশের সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির মধ্যে এক নূতন জাগরণের সূচনা দেখা দেয়।

৫। অরিমর্দনপুরের হিন্দু সংস্কৃতি

পাগান রাজবংশের রাজত্বকালে বর্মায় যে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া অনাবশ্যক, কারণ ইহা বর্তমান কালেও যথেষ্ট পরিমাণে অব্যাহত আছে। এখানে প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এই দেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ক্রমশঃ লোপ পায় এবং কেবলমাত্র বৌদ্ধধর্মের থেরবাদ প্রাধান্য লাভ করে। এই নূতন রাজ্যের রাজগণ নব ধর্ম প্রচারে অভূতপূর্ব উৎসাহ প্রকাশ করিতেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকের ধর্মানুরাগ ও ধর্মপরায়ণতার অভিব্যক্তি অতুলনীয়। গভীর অভিনিবেশ সহকারে পালি সাহিত্যের অনুশীলন করার ফলে বর্মায় এক নূতন পালি সাহিত্য গড়িয়া উঠে। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম ক্রমশঃ ক্ষীয়মান হওয়ার দরুন বর্মার সহিত সিংহলের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধিও ইহার অন্যতম কারণ।

বর্মী বৌদ্ধধর্মের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ বৌদ্ধধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান ঘটনাবলী ও স্থানগুলি সবই বর্মা দেশের বলিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়াস। বর্মী বিবরণ অনুসারে বুদ্ধদেব এই দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং ধর্মশাস্ত্রে বিবৃত তাঁহার জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলী বর্মাদেশের বিভিন্ন স্থানেই ঘটিয়াছিল। পাগান, মাণ্ডালে ইত্যাদির ন্যায় প্রধান শহরগুলি স্থাপিত হওয়া সম্বন্ধেও বুদ্ধদেবই নাকি ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন। এই একই মনোভাবের প্রকাশ দেখা যায় বর্মার রাজবংশগুলির বৃত্তান্ত বর্ণনা-কালে। তগাউঙ্গের ন্যায় অন্যান্য রাজ বংশ যে শাক্য বংশ হইতে উদ্ভূত—বুদ্ধদেবও সেই শাক্য বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার আরাকানের রাজবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা জাতকের একটি গল্প হইতে গৃহীত, শুধু প্রয়োজন মত স্থানগুলির পরিবর্তন করা হইয়াছে।

বংশ মর্যাদার শ্লাঘা, ধর্মানুরাগ, এবং ঔপনিবেশিকের পক্ষে তাহাদের নূতন বাসভূমিতে নিজেদের পরিচিত বিভিন্ন নাম আমদানি করিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ফলে বর্মায় সুপরিচিত বহু ভারতীয় ভৌগোলিক নাম পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি নাম বেশ প্রাচীন্ যুগের।

ইরাবতীর উপরের অংশে মোয়েয়িন (Mweyin) নির্দেশ করিতে বর্মী লেখতে মৌর্য নাম ব্যবহার করা হইয়াছে এবং খুব সম্ভব এই নাম হইতেই টলেমির (Ptolemy) ম্যারেউর (Mareura) নামের উৎপত্তি। ইহা সত্য হইলে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে এই নামের অস্তিত্ব ছিল। শ্রীক্ষেত্র ও হংসাবতীও খ্রীষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দী অপেক্ষা প্রাচীন। আরও কয়েকটি প্রাচীন ও প্রধান নাম এই :— অপরান্ত, অসিতাঞ্জন, অবন্তি, বারাণসী, চম্পানগর, ধন্যবতী, দ্বারবতী, গন্ধার, কাম্বোজ, কেলস (কৈলাস), কুসুমপুর, মিথিলা, পুষ্কর, পুষ্করাবতী, রাজগৃহ, সংকাশ্য, উৎকল, বৈশালী প্রভৃতি। এই তালিকা আরও

বহু গুণ বাড়ানো যায়। বুদ্ধদেবের সহিত সংশিষ্ট ঘটনাগুলি ছাড়াও বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস বর্ণনায় এবং বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী বুদ্ধ বা সাধু ব্যক্তিদের জীবনের যে সমস্ত ঘটনার কথা বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে জানা যায় তাহাদের অনেকগুলি বর্মা দেশে স্থাপন করা হইয়াছে। অশোক প্রেরিত ধর্ম প্রচারকেরা যে সমস্ত স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিল তাহার অনেকগুলিকেও এই দেশে স্থাপন করা হইয়াছে। ভারতীয় উপনিবেশ-গুলির মধ্যে আর কোথায়ও এইরূপ একটি নূতন ভারতবর্ষ গড়িয়া তুলিবার বিধিমত চেষ্টা লক্ষ্য হয় না।

বর্মীয় বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় এদেশে এক স্বতন্ত্র ও সমৃদ্ধিশালী পালি সাহিত্যের উদ্ভব। যে সমস্ত ভারতীয় উপনিবেশে বৌদ্ধধর্ম প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল সেই সকল স্থানে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং এই সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন অতি সাধারণ ব্যাপার বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু সিংহল ব্যতীত আর কোথায়ও এখানকার মত এই ধর্মপুস্তকের ভাষা দেশের প্রাচীন ভাষা বলিয়া গ্রহণ ও তাহাকে আদর্শ করিয়া এক নূতন সাহিত্য সৃষ্টির দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। এই ব্যবস্থা বর্তমানকাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ আছে।

বর্মার পালি সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়াও এখানে সম্ভব নহে। ডাঃ বোডে (Dr. Bode) ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ এই সম্বন্ধে যে সকল প্রামাণিক গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহা হইতে এই বিষয়ের একটি যথাযথ বিবরণ পাওয়া যাইবে। তবে এই সাহিত্যের ব্যাপ্তি ও তাহার গুরুত্ব যে কতখানি তাহা বুঝাইতে এইটুকু বলা প্রয়োজন যে বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন বিভাগ, ইহার ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত, আশ্রমের নিয়মাবলী, দার্শনিক মতবাদ ছাড়াও ব্যাকরণ, আইন ও রাজনীতিসহ বিভিন্ন সাংসারিক বিষয়গুলিও এই সাহিত্যের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। এই সাহিত্যের কলেবর এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে ইহার ইতিহাসও রচিত হইয়াছে। এইরূপ দুইখানি পুস্তক—গন্ধবংশ সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দে ও শাসনবংশ উনবিংশ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে বর্মা যখন ব্রিটিশ কর্তৃক বিজিত হয় তখনও এখানে যথেষ্ট সাহিত্যচর্চা ছিল। মিনডন-মিনের রাজ্যকালকে (১৮৫৩-৭৮ খ্রী) বৌদ্ধধর্ম ও পালি সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়, কারণ এই সময়ে বর্মার থেরগণ যথাসম্ভব প্রাচীন রীতিনীতি ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করে। এই সম্বন্ধে বোডে (Bode) বলিয়াছেন, "এইরূপে উনবিংশ খ্রীষ্টাব্দ দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দের সহিত জড়িত হইয়াছে এবং বর্মায় পালি সাহিত্যের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইয়াছে।" কিন্তু বর্মায় এই জ্ঞানস্পৃহা একেবারে লুপ্ত হয় নাই। বোডে দেখাইয়াছেন "বর্মায় জ্ঞানের ধারা সুদূরবর্তী দ্বাদশ শতাব্দীর অনুকরণেই বিংশ শতাব্দীতে হইতেছে।" বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে একজন বিজ্ঞ ভিক্ষু রচিত পুস্তকগুলির একটি তালিকা বোডে প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই গ্রন্থগুলি পালি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার পরিষ্কার প্রতিরূপ-প্রদর্শক।

একজন রাজ্যপাল ও তাঁহার পত্নীর বৌদ্ধসংঘে দানের বিবরণ ১৪৪২ খ্রীষ্টাব্দের একটি লেখতে পাওয়া যায় এবং ইহা হইতে বর্মার সাহিত্য চর্চার কতকটা ধারণা করা যায়। তাঁহারা একটি বিহার, বাগান, ধানের জমি ও দাস ছাড়াও কতকগুলি পুঁথি দান করেন। সৌভাগ্যবশতঃ এই সঙ্গে পুঁথিগুলির একটি তালিকা দেওয়া আছে এবং ইহাতে ২৯৫ খানি পৃথক পুঁথির নাম আছে। ইহা হইতে পঞ্চদশ শতাব্দের পূর্বে বর্মার পালি সাহিত্যের বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করা যায় এবং বহু পুস্তকের রচনাকালও ইহা হইতে স্থির করা সম্ভব।

এই তালিকায় কতকগুলি সংস্কৃত পুস্তকের নাম আছে। আগেই বলা হইয়াছে যে বর্মায় খ্রীষ্টীয় শতকের প্রথম দিকেই সংস্কৃতের অনুশীলন ছিল। এই তালিকা হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে বৌদ্ধধর্ম ও পালিভাষা প্রাধান্য লাভ করিলেও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য এই দেশ হইতে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে আইন বিষয়ে

বর্মা পালি সাহিত্য—ধম্মসথ—মূল সংস্কৃতের আদর্শে রচিত। ইহার অন্যান্য শাখার ন্যায় সিংহলের প্রভাব এই বিষয়ের উপর দেখা যায় না। একথা এখন সকলেই স্বীকার করেন যে বর্মার প্রাচীন ও আধুনিক উভয়কালের বিধিবদ্ধ আইন-নীতিই মনু, নারদ ও যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্র হইতে উদ্ভুত। অবশ্য বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্যের ফলে আইন ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু ইহার ভারতীয় উৎপত্তি সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দের শেষভাগে নিম্ন বর্মার রাজা ওয়াগরু (Wagaru) কর্তৃক যে ধম্মসথ সংকলিত হইয়াছিল তাহা ষোড়শ শতাব্দে বুদ্ধঘোষ নামে এক তলইং ভাষী আইনজ্ঞ ব্যক্তি পালিতে অনুবাদ করেন, কারণ এই সময় পর্যন্ত ইহা কেবলমাত্র তলইং ভাষায় প্রচলিত ছিল। এই পালি বইটির নাম দেওয়া হইয়াছিল মনুসার, এবং সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দে সম্পাদিত আরও অনেকগুলি এই জাতীয় পুস্তকের মনুর নামে নামকরণ করা হয়। ইহা হইতে বর্মী আইননীতির সহিত ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রের যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্মার সামাজিক জীবনে ও মানুষের নৈতিক চরিত্র ও মনোবৃত্তি গঠনে পালি সাহিত্যের অবদান কতখানি তাহা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা শক্ত। একজন বিদেশী সমালোচক লিখিয়াছেন :

"ভাষা ও জাতির দিক্ হইতে নিকট সম্পর্ক না থাকিলেও ভারতীয় চিন্তাধারা কিরূপ কার্যকরী হইতে পারে তাহার প্রমাণ বর্মায় পাওয়া যায়। আমরা বলিতে পারি যে ভারতীয় প্রতিভা, মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মদর্শিতা, বৌদ্ধধর্মের অন্তর্গত উচ্চভাব সমূহ—এই সব কিছুই বর্মা ভাষার উন্নতিবিধানে, গভীরতায় ও বিস্তারে অনবরত সাহায্য করিয়াছে। যখন বর্মাভাষা (চতুর্দশ শতাব্দের কাছাকাছি সময়ে) সাহিত্যের ভাষার পর্যায়ে পৌছিল, তখনও মতামত প্রকাশের জন্য এই মাতৃভাষা পর্যাপ্ত না হওয়ায় বহু ভারতীয় শব্দ যোগ করার প্রয়োজন হইয়াছিল।

এই প্রসঙ্গের সমাপ্তির আগে এই সমালোচকের আর কয়েকটি মন্তব্যের উদ্ধৃতি নিম্নে দেওয়া হইল :

"বর্মা সভ্যতা যে বৌদ্ধধর্মের উপর গঠিত হইয়াছিল ইহার প্রকাশই পালি সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক অবদান বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এইখানকার ধর্ম ও সাহিত্যের অন্যান্য শাখার গ্রন্থগুলি অনুশীলন কালে ইহাদের অন্তর্নিহিত বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসের যে ধারা পরিলক্ষিত হয়, দেখা যায় যে তাহা দ্বারা সাহিত্যের অবিচ্ছিন্ন উন্নতি ও অব্যাহত গতি পরিরক্ষিত হইয়াছে। যখন প্রাচীন বিবরণীগুলিতে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সংগ্রামের বর্ণনা দেখিতে পাই তখন আমরা এই ধর্মের শক্তির কার্যকারিতাও সেই সঙ্গে দেখিতে পাই, কারণ ইহার সহায়তায় বর্বরতা দমন করা সম্ভব হইয়াছে, প্রচলিত রীতির মধ্যে আরও ন্যায়পরায়ণতা স্থান পাইয়াছে, এবং মানুষ পরস্পরের মধ্যে ভেদাভেদের সীমানা দূর করিতে সক্ষম হইয়াছে। সামাজিক জীবনে ও জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই ধর্মশক্তির প্রভাব সম্বন্ধে একটি সম্পূর্ণ চিত্র পালি সাহিত্য হইতে পাওয়া যায়। কাজেই ভারতবর্ষ বর্মাকে জয় করিয়াছিল,—এই প্রাচীন উক্তির প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত। ইতিহাসে যত জয়ের বিবরণ পাওয়া যায় তাহাদের কোনটিই ইহা অপেক্ষা বেশি স্থিতিশীল বা হিতকর নহে।"

বিভিন্ন রাজগণ কর্তৃক মন্দির নির্মাণের কথা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি স্থাপত্যকলার উৎকৃষ্ট নিদর্শন, এবং ইহা হইতে শিল্পকলা ক্ষেত্রে জাতীয় দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রাঙ্কন—শিল্পের এই সব কয়টি ক্ষেত্রেই যথেষ্ট উদ্যম দেখা যায়, কিন্তু ইহাদের সকলগুলিতেই ভারতীয় শিল্পকৌশলের ছাপ সুস্পষ্ট। ভারতবর্ষের সহিত বর্মার নিয়মিত ও অন্তরঙ্গ সংস্রব বর্মীয় সভ্যতার বিবর্তনের একটি বিশেষ লক্ষণ। বস্তুতঃ দেখা যায় যে ভারতবর্ষ হইতে অনবরতই বণিক, কারিগর, ব্রাহ্মণ, সৈন্য, জ্যোতিষী ও বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারক বর্মার বিভিন্ন অংশ পরিদর্শনে

বা বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে যাইত। অপরপক্ষে বর্মীরাও ভারতবর্ষে বাণিজ্য বা ধর্মস্থানগুলি ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আসিত। একটি স্থানীয় বিবরণীতে দেখা যায় যে একজন বর্মী পোতাধ্যক্ষ নিয়মিত দেবমূর্তির ব্যাবসা করিত। গঙ্গাস্রোতে বিধ্বস্ত প্রাচীন মন্দিরের মূর্তিগুলি বারাণসীতে লোকে সংগ্রহ করিত, সে তাহাদের নিকট হইতে এইগুলি কিনিয়া জাহাজে পেগুতে বিক্রয়ের জন্য লইয়া আসিত। এই উপায়েও হয় তো বর্মী শিল্প ভারতীয় শিল্পের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষ ও বর্মার মধ্যে স্থল ও জল উভয়পথে যাতায়াতের সুব্যবস্থাই যে ভারতীয় সংস্কৃতি বর্মায় প্রগাঢ় ও স্থায়ী হওয়ার প্রধান কারণ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ক্যানজিত্থ সম্বন্ধে বর্ণনা কালে যে আনন্দ মন্দিরের উল্লেখ করা হইয়াছে সেটি বর্মার মন্দিরগুলির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। ইহা একটি প্রশস্ত চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে অবস্থিত। সমচতুষ্কোণ প্রাঙ্গণটির মাপ প্রতিদিকে ৫৬৪ ফিট। ইটের তৈয়ারি সমচতুষ্কোণ প্রধান মন্দিরটির প্রতিপার্শ্বের মাপ ১৭৫ ফিট। প্রতি পার্শ্বের মধ্যস্থলে একটি করিয়া ৫৭ ফিট লম্বা অলিন্দ বাহির হইয়াছে, সুতরাং মন্দিরটির প্রতি পার্শ্বের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ২৯০ ফিট। অভ্যন্তর ভাগের মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ ইষ্টক চত্বরের চারিপার্শ্বে মূর্তি স্থাপনের জন্য বৃহৎ কুলঙ্গি এবং প্রতি কুলঙ্গির মধ্যে ৮ ফিট উচ্চ সিংহাসনের উপর ৩১ ফিট উচ্চ বুদ্ধের দণ্ডায়মান মূর্তি স্থাপিত। কেন্দ্রের ইষ্টক চত্বরের দুইধারে দুইটি সমান্তরাল বারান্দা এবং ইহার ভিতর দিয়া অলিন্দগুলি হইতে প্রতিদিকের বুদ্ধমূর্তির নিকট যাতায়াতের পথ আছে।

মন্দিরের বাহিরের দিকে ৩৯ ফিট উচ্চ দেয়াল; তাহার উপরিভাগে ছিদ্রযুক্ত প্রাকার (battlemented parapet) এবং ইহার প্রতি কোণে বৃত্তাকার বলয়-যুক্ত (ringed) প্যাগোডা

অবস্থিত। প্রাকারের উপরে নিচেকার সমান্তরাল বারান্দার দুইটি ছাদ পর পর অবস্থিত ; ইহাদের প্রত্যেকটির বাহিরের দিক বক্ররেখা বিশিষ্ট এবং প্রতিকোণে একটি লম্বাকৃতি স্তূপ ও মধ্যস্থলে অলিন্দের অনুকরণে বক্র গবাক্ষ অবস্থিত। এই দুইটি ছাদের উপরে চারিটি ক্রমশঃ সংকুচিত ধাপ একটি উচ্চ শিখরের ভিত্তি রূপে নির্মিত। এই শিখরটির শীর্ষে লম্বাকৃতি ঘণ্টার ন্যায় গম্বুজওয়ালা স্তূপ ও সর্বোপরি লোহার সরু হ্‌টি (hti) স্থাপিত। প্রত্যেকটি সংকুচিত ধাপের প্রতিকোণে একটি করিয়া সিংহমূর্তি ও মধ্যস্থলে অলিন্দের অনুকরণে ছোট ছোট খোলা জায়গা। সুন্দর সুবিন্যস্ত আকার ও পরিকল্পনায় সামঞ্জস্য ছাড়াও দেয়ালের অলংকরণ রূপে ব্যবহৃত অর্ধ-খোদিত প্রস্তর চিত্রগুলির ভাস্কর্য ও কাচের ন্যায় মসৃণ পোড়া মাটির ফলকগুলি দ্বারা আনন্দ মন্দিরের সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। আশিটি অর্ধ-খোদিত চিত্র ও কতকগুলি ফলক দ্বারা বুদ্ধদেবের জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি বিবৃত করা হইয়াছে, এবং ৯২৬টি ফলক দ্বারা জাতকের গল্পগুলি বিবৃত হইয়াছে। মন্দিরটির অনন্যপূর্ব পরি-কল্পনার উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা তর্ক বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু আগেই বলা হইয়াছে ইহা যে মূলত: ভারতীয় ধারা হইতে উদ্ভূত সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নাই। এই ধরনের মন্দির বাংলা দেশে ছিল এবং খুব সম্ভব এই গুলির আদর্শে আনন্দ মন্দির পরিকল্পিত হইয়াছিল। ডুরোসেল (Duroiselle) এই বিষয়ে বিশেষরূপে অনুশীলন করিয়া এই মতই প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"যে সমস্ত স্থপতিরা আনন্দমন্দির পরিকল্পনা ও নির্মাণ করিয়াছিল তাহারা যে ভারতীয় ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। মন্দিরটির শিখর হইতে ভিত্তি অবধির পরিকল্পনায়, বারান্দায় যে অসংখ্য প্রস্তরে খোদিত ভাস্কর্যের নমুনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং

ইহার ভিত্তিগাত্র ও বিভিন্ন ধাপ অলংকরণে যে ফলকগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাদের সমস্তগুলির মধ্যেই ভারতীয় প্রতিভা ও কারিগরীর ছাপ সুস্পষ্ট। কাজেই এই দিক দিয়া বিচার করিলে বলা যায় যে আনন্দ মন্দির বর্মার রাজধানীতে নির্মিত হইলেও আসলে ইহা একটি ভারতীয় মন্দির।"

প্রায় একশত বর্গমাইল পরিমিত পাগানের চতুষ্পার্শ্বের সমতল-ভূমিতে অসংখ্য মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। মিঃ ইউল (Yule) অনুমান করেন যে কেবল পাগান শহরেই ইহাদের সংখ্যা ৮০০ বা ১০০০টির কম নহে। পাগান শহরটি ইরাবতীর তীরে আট মাইল দীর্ঘ ও গড়পরতা ইহার গভীরতা দুই মাইল। এই মন্দির-গুলির মধ্যে যে অল্প কয়টি মোটামুটি ভাল অবস্থায় আছে সেগুলি খুব সুন্দর। তাহাদের পরিকল্পনা আনন্দ মন্দিরের অনুরূপ, তবে বিন্যাসে কিছু তফাত দেখা যায়। ইহাদের সবগুলিই পাগানের পতনের পূর্বে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় এয়োদশ শতাব্দীর আগে নির্মিত এবং ভারতীয় কারিগরীর ছাপ নাই এমন কোনও কিছুর নিদর্শন ইহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্যু-জাতির রাজধানী শ্রীক্ষেত্র নগরীর (৩০৩ পৃঃ) ভাস্কর্যের ন্যায় পাগানের ভাস্কর্যেও ভারতীয় প্রভাব খুব বেশী দেখা যায়। তবে পাগানের ভাস্কর্যে বাংলার পাল ও সেন যুগের প্রভাব খুবই স্পষ্ট। এমন কি অনেকগুলি মূর্তি ভারতীয় ভাস্করের দ্বারা নির্মিত বলিয়াই মনে হয়। মন্দিরের অভ্যন্তরে ফ্রেস্কো (Fresco) ছবিগুলিতে বাংলা ও নেপাল দেশের ছবির খুবই প্রভাব দেখা যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্যামদেশে হিন্দু উপনিবেশের আরম্ভ

যে দেশটি অল্পদিন আগে পর্যন্ত শ্যাম নামে পরিচিত ছিল তাহা এখন থাইল্যাণ্ড বা থাইদের রাজ্য বলিয়া অভিহিত। এই নামের স্থানীয় ব্যাখ্যা থাই অর্থাৎ স্বাধীন দেশ, কিন্তু থাই একটি জাতির নাম এবং থাইল্যাণ্ড বলিতে প্রকৃত পক্ষে থাইদের রাজ্য নির্দেশ করে।

এই থাইরা এয়োদশ শতাব্দীর আগে শ্যাম দেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয় নাই। এই সময়ের পূর্বে প্রায় হাজার বৎসর কাল হিন্দুরা শ্যামে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া এই দেশের বিভিন্ন অংশে অনেকগুলি ছোট ছোট হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

শ্যামে হিন্দু উপনিবেশ আরও প্রাচীন না হইলেও অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় প্রথম দুই শতাব্দীর মধ্যে আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। প্রা পাথোমে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যের নমুনা পাওয়া যায়, এবং ইহা খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী অথবা ইহার কিছু পূর্বেকার সময়ের বলিয়া অনুমান হয়। ইহার কুড়ি মাইল পশ্চিমে পোঙ্গটুক নামক স্থান খুঁড়িয়া একটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ও হাঁটার ভঙ্গীতে একটি ছোট বুদ্ধমূর্তি আবিস্কৃত হইয়াছে, তাহাও এই একই সময়ের। গুপ্ত শিল্পের শৈলী অনুযায়ী ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের মূর্তি এ দেশের সর্বত্র পাওয়া যায়। পেচাবুরির নিকটে মুঙ্গসিটেপ নামক স্থানে শৈব ও বৈষ্ণব ভাস্কর্যের সহিত খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর একটি সংস্কৃত লেখ পাওয়া গিয়াছে।

কতকগুলি বৌদ্ধ ভাস্কর্যের মধ্যে অতি প্রাচীন যুগের বৌদ্ধধর্মের

সংস্কার ও ধারণা লক্ষ্য হয় এবং ইহা দ্বারা সোডেশের (Coede's) মতে "ভারতীয় বৌদ্ধদের দ্বারা অতি প্রাচীন কালে দক্ষিণ শ্যামে উপনিবেশ স্থাপনের যুক্তি ও প্রমাণ আরও দৃঢ় হয়।" তিনি আরও বলিয়াছেন; "এই অঞ্চলের বিভিন্ন নাম, যথা সুপান, কানবুরি, উথোঙ্গ, প্রভৃতির অর্থ 'সোনার ভূমি', এবং ইহা হইতে যে কেহই মনে করিতে পারে যে পালি শাস্ত্র ও প্রাচীন প্রবাদ অনুযায়ী অতি প্রাচীন কালে যে সুবর্ণভূমি হইতে বৌদ্ধধর্ম চতুর্দিকে প্রচারিত হইয়াছিল তাহার অবস্থান বর্মাদেশ অপেক্ষা এই দেশে অনুমান করাই অধিকতর যুক্তিসংগত।"

এই সম্বন্ধে মতামত যাহাই হউক এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে শ্যামে অনেকগুলি হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল।

কিন্তু এই আদি উপনিবেশগুলির কোনটিই শক্তিশালী রাজ্যরূপে গড়িয়া উঠে নাই। আগেই বলা হইয়াছে যে শ্যাম দেশের একটি বড় অংশ ফু-নান রাজ্যের অধীনে ছিল। ফু-নানের পতনের পরে শ্যামে দ্বারবতী নামে একটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। ৬৩৮ ও ৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারবতী হইতে চীনে দূত পাঠানো হয় এবং এই রাজ্য কাম্বোডিয়ার সীমান্ত হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আগেই বলা হইয়াছে হিন্দু ধর্মে অনুপ্রাণিত মোনরা এই রাজ্যে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল এবং উত্তরে হরিপুঞ্জয় বা লম্ফুন পর্যন্ত তাহাদের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। দশম শতাব্দীতে কাম্বোজের রাজগণ নিম্ন মেনাম উপত্যকায় আধিপত্য বিস্তার না করা পর্যন্ত হরিপুঞ্জয় একটি সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। ক্রমে ক্রমে সমগ্র শ্যাম দেশে কাম্বোজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই দেশ খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত কাম্বোজের শাসনাধীন ছিল; তাহার পরেই এইখানে থাইরা কতকগুলি ছোট স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

থাই অধিকারের আগের সময়ের একটি মূল্যবান দলিল—একটি শিলাখণ্ডের উভয় দিকে খোদিত লিপি—বান মাপ মাখমে (নাকোন সাভন প্রদেশে বানপোট জেলায়) পাওয়া গিয়াছে। শ্যামে মধ্য মেনাম উপত্যকায় যেখানে মেপিং নদী মেনাম নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে তাহার উত্তরে বান মাপ মাখম অবস্থিত। শিলাখণ্ডটির একদিকে কুড়ি লাইনে রচিত একটি পালি লেখ ছিল; ইহার মধ্যে মাত্র দশ লাইনের কিছু অংশ অবিকৃত আছে। শিলাখণ্ডের অপর দিকে খমের (Khmer) ভাষায় তেত্রিশ লাইনে রচিত লিপিটি সম্পূর্ণ পড়া যায়। ইহার তারিখ ১০৮৯ শকাব্দ (১১৬৭ খ্রী)। উভয় লেখতেই কম্‌রতেং জগৎ শ্রীধর্মাশোকের পবিত্র দেহাবশেষের উল্লেখ আছে এবং ইহার প্রতি সম্মান বশতঃ যে সব জমি ইত্যাদি দান করা হইয়াছিল তাহার কথা আছে।

মহারাজাধিরাজ কুরুং শ্রীধর্মাশোকের আদেশ মহা-সেনাপতি শ্রীভুবনাদিত্য ঈশ্বরদ্বীপ ধন্যপুরের শাসক সুনত্তকে জানান এবং ইনিই এই সব দানের ব্যবস্থা করেন। 'কম্‌রতেং জগৎ' বলিতে দেবতা অথবা মহৎ ব্যক্তিকে বুঝায়। সুতরাং এই দেহাবশেষ ভারতবর্ষের সম্রাট অশোকেরও হইতে পারে, কারণ কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে তাঁহার প্রেরিত বৌদ্ধ পরিব্রাজকরা এইসব অঞ্চলেও আসিয়াছিল। এই-সব জিনিসের দাতা মহারাজাধিরাজ ধর্মাশোক সম্ভবতঃ হরিপুঞ্জয়ের একজন শাসনকর্তা ছিলেন।

থাইদের ইতিহাস আলোচনার আগে তাহাদের ক্ষমতালাভের পূর্বে শ্যামদেশের সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। লেখ, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পের দ্বারাই প্রমাণ পাওয়া যায় যে এই সময়ের মধ্যে শ্যাম পরিপূর্ণরূপে ভারতীয় সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছিল। ভারতীয় ধর্ম ও ধর্মপুস্তক এবং ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য এখানে অত্যন্ত প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছিল, এবং আধুনিক কালেও ইহার প্রভাব বর্তমান। প্রথম যুগের দ্বারবতীর বৌদ্ধ ভাস্কর্যের

সহিত ভারতবর্ষের সমসাময়িক গুপ্তযুগের শিল্পের নিকট-সাদৃশ্য লক্ষ্য হয় এবং মূর্তিগুলির মুখাবয়বও ভারতীয়দের অনুরূপ। যদিও পরবর্তী যুগের বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মূর্তিগুলির মুখাবয়বে মোঙ্গল-জাতীয় চিহ্ন পরিস্ফুট, তথাপি ইহা ভারতীয় শিল্পধারার অনুযায়ী; তবে স্থানীয় প্রভাবে কিছু পরিবর্তিত। এই ভাস্কর্যের নমুনার মধ্যে কতকগুলির শিল্পকার্য অতি উৎকৃষ্ট ধরনের, এবং আশ্চর্যের বিষয় এইগুলি সমুদ্রতীর হইতে অনেক দূরে দেশের অভ্যন্তর ভাগে পাওয়া গিয়াছে। কারণ সাধারণতঃ সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলেই হিন্দু ঔপনিবেশিকদের প্রধান ঘাঁটি ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। পাথর ও ব্রঞ্জ ধাতু দ্বারা গঠিত অসংখ্য ভাস্কর্যের নমুনা শ্যামে পাওয়া গিয়াছে। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নমুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে প্র-পথম-এ; ইহা একটি ধর্মচক্র ও সঙ্গে অর্ধশয়ান (crouching) ভঙ্গীতে মৃগমূর্তি। যে সময়ে ভারতীয় শিল্পে বুদ্ধদেবের মনুষ্যমূর্তি না করিয়া কেবলমাত্র কোন প্রতীক দ্বারা তাঁহার উপস্থিতি জ্ঞাপন করার রীতি প্রচলিত ছিল, ইহা সেই যুগের অন্তর্বর্তী বলিয়া অনুমান করা হয়। তবে যে নমুনাটি পাওয়া যায় সেটি অত প্রাচীন না হইলেও খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতকের পরবর্তী নহে। তাহা হইলে ধরিয়া লইতে হয় যে এই ভাস্কর্যের দ্বারা অলংকৃত প্র-পথমের আদিম বৌদ্ধ মন্দিরটি যে যুগে ভারতীয় ভাস্কর্যে বুদ্ধদেবের মূর্তি নির্মাণ প্রথা প্রচলিত হয় নাই, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় অব্দ আরম্ভের পূর্বেকার সময়ে নির্মিত হয় এবং পরবর্তী যুগেও এই রীতি অনুসরণ করা হইত। অতি প্রাচীন কালেই ভারতীয় বৌদ্ধদের দক্ষিণ শ্যামে বসতি স্থাপনের প্রমাণ এই ভাস্কর্যের নমুনাগুলি হইতে পাওয়া যায়। পঙ্গটুকে প্রাপ্ত ব্রঞ্জের বুদ্ধমূর্তিটি খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের অমরাবতী শিল্পরীতির অনুরূপ। বহু সংখ্যক বুদ্ধমূর্তিতে প্রাচীন ও পরবর্তী যুগের গুপ্ত শিল্পরীতির সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখা

যায়। পরবর্তী যুগের রীতি অনুযায়ী নির্মিত দুইটি পাথরের মূর্তিতে যে লেখ আছে তাহা হইতে জানা যায় যে এই দুইটি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত। কাজে কাজেই প্রাচীন মূর্তিগুলি যে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে নির্মিত এরূপ মনে করা যাইতে পারে। এই যুগের একটি যক্ষিণী মূর্তির মুণ্ডহীন দেহ (torso) একটি অতি উৎকৃষ্ট ভাস্কর্যের নমুনা। ইহা পেচবুড়ির নিকটে সি টেপ (শ্রীদেব) নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছে; এই স্থানটি সমুদ্র হইতে অনেক দূরে এবং ইহা হইতে বুঝা যায় যে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব দেশের অভ্যন্তরেও বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

এই একই সময়ের কয়েকটি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ভাস্কর্যের নমুনায় মূল গুপ্তশিল্পের অনুকরণ এত সুস্পষ্ট নহে এবং ইহা স্থানীয় উপাদানের প্রভাব নির্দেশ করে। যদিও সামান্য কিছু লৌকিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তাহা হইলেও দ্বারবতীর যুগের ভাস্কর্য যে গুপ্ত শিল্প হইতে উদ্ভূত তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দে হিন্দু শিল্পের দ্বারা প্রভাবিত কাম্বোজের খ্মের (Khmer) শিল্প দ্বারা শ্যামের শিল্প যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হইয়াছিল, কিন্তু মূল ভারতীয় বৈশিষ্ট্য একেবারে লোপ পায় নাই।

ভাস্কর্যের ন্যায় স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও শ্যামে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সময়ের আদর্শ অনুকরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু প্রাচীনকালের নমুনাগুলি সাধারণতঃ ক্ষয়শীল বস্তু দ্বারা নির্মিত হওয়ায় ইহাদের কিছুই অবশিষ্ট নাই। পরবর্তী যুগে, যে সকল রীতির উদ্ভব ভারতবর্ষে হইয়াছিল তাহাদের সবগুলির উদাহরণ সুদূর প্রাচ্যের অন্যান্য উপনিবেশ, যথা জাভা, কম্বোজ, চম্পা ও বর্মার ন্যায় শ্যামেও দেখা যায়, এবং ইহা হইতে অন্যান্য দেশের ন্যায় এখানেও প্রাচীন নমুনার অস্তিত্ব ছিল বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়। এয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত সবনকলোকের পাথরের রেলিঙ্গের সহিত সাঁচী

স্তূপের রেলিঙের সদৃশ্য হইতে শ্যামের শিল্পের রক্ষণশীলতার নির্দেশ পাওয়া যায়। শ্যামের সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট স্থাপত্য শিল্পের নমুনা প্রাঙ্গ ; ইহা একটি চতুষ্কোণ মন্দির এবং ইহার ছাদটি ছোট ছোট ধাপে নির্মিত ; সমস্তটি এক সঙ্গে মিলিয়া একটি বক্ররেখা-বিশিষ্ট শিখরের আকার ধারণ করিয়াছে। চতুর্দশ শতাব্দী হইতে মন্দির নির্মাণ পদ্ধতিতে এই আদর্শ প্রসার লাভ করিয়াছিল, এবং প্রাচীন যুগে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের শিখরের সংমিশ্রণের ফলে যে স্বতন্ত্র এক প্রকার শিখর নির্মাণের প্রচলন হইয়াছিল তাহা হইতেই যে এই আদর্শের উদ্ভব হয় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

পঞ্চম অধ্যায়

থাই জাতি

১। প্রাচীন ইতিহাস

থাইরা মোঙ্গল জাতীয় এবং সাধারণ বিশ্বাস এই যে ইহারা জাতি হিসাবে চীনাদের সগোত্র। বর্তমানে চীন নামে পরিচিত দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে ইহারা বাস করিত। খ্রীষ্টীয় অব্দ আরম্ভ হইবার বহুপূর্বেই এই জাতির একটি বৃহৎ অংশ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে চলিয়া যায় ও ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। তাহাদের ক্রমিক অগ্রসরের বিভিন্ন অধ্যায় বা তারিখ সঠিক ভাবে নির্ণয় করা যায় না, তবে অষ্টম বা নবম শতাব্দীর মধ্যে তাহারা পশ্চিমে সলউইন নদীর তীর ও ইরাবতী নদীর উর্ধ্বতন অঞ্চলে এবং দক্ষিণে শ্যাম ও কম্বোডিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল।

যে অঞ্চলে থাইদের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজ্য গঠিত হইয়াছিল বর্তমানে তাহা ইউনান নামে পরিচিত। ইহা তখন চীন রাজ্যের অংশ বলিয়া পরিগণিত হইত না, কিন্তু এই রাজ্যটি প্রায়ই চীনাদের দ্বারা আক্রান্ত হইত। ইউনানের থাইরা মাঝে মাঝে পরাজিত হইত এবং দীর্ঘ বা অল্পকালের জন্য চীনের আনুগত্যও স্বীকার করিত। কিন্তু কোন দিনই চীনের প্রভুত্বকে উপেক্ষা করিতে দ্বিধা করে নাই। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে তাহারা নিজেদের চীনের কবল হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিতে সক্ষম হইল এবং একটি শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিল। পরবর্তী ছয় শত বৎসর এই রাজ্যটি ইন্দোচীনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল।

যদিও জাতি হিসাবে চীনাদের সহিত নিকট সম্বন্ধ এবং বহু শতাব্দী চীনাদের অধীনে থাকায় তাহাদের সহিত ঘনিষ্টরূপে সংশ্লিষ্ট ছিল, তথাপি ইউনানের থাইরা ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বারাই প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। চীনারা এই দেশকে নান-চাও বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে. কিন্তু ইন্দোচীনে ইহা গন্ধার নামে পরিচিত ছিল; ইহার এক অংশকে আবার বিদেহ রাজ্য বলা হইত ও তাহার রাজধানী মিথিলা নামে পরিচিত ছিল। ইহার অধিবাসীরা যে লিপি ব্যবহার করিত তাহা ভারতীয় লিপি হইতে উদ্ভূত। স্থানীয় প্রবাদ অনুযায়ী ভারতবর্ষ হইতে অবলোকিতেশ্বর আসিয়া এই দেশকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। কথিত আছে যে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে এই দেশের রাজা চীন সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট হওয়াতে সাতজন ভারতীয় ধর্মযাজক কর্তৃক তিরস্কৃত হন। মগধে জন্মগ্রহণের জন্য মাগধ বলিয়া উল্লিখিত চন্দ্রগুপ্ত নামে এক হিন্দু সন্ন্যাসী খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইউনানে যাদুবিদ্যার জন্য বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইউনানে পিপ্পল গুহা, বোধিবৃক্ষ, পবিত্র পর্বত গৃধ্রকূট ও বৌদ্ধধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট আরও অন্যান্য স্থান দেখা যায়। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর একজন চৈনিক পরিব্রাজক একটি স্থানীয় প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে বলা হইয়াছে যে শাক্যমুনি ইউনানের টা-লি হ্রদের নিকটে বোধি লাভ করেন। একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত দুইটি ঘন্টার উপরে খোদিত চীনা ও সংস্কৃত লেখ হইতে ইউনানে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়। নানচাও-র রাজার উপাধি ছিল মহারাজা এবং ইহা ছাড়া আরও একটি হিন্দু উপাধি ছিল যাহার অর্থ পূর্বদেশের রাজা। স্থানীয় প্রবাদ অনুযায়ী এই রাজবংশ অশোক হইতে উদ্ভূত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর লেখক রশিদুদ্দিন শুধু যে এই দেশকে গন্ধার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহা নহে, উপরন্তু তিনি বলিয়াছেন যে এই দেশের অধিবাসীরা

ভারতবর্ষে গিয়াছিল। ৭৮৫ হইতে ৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে রচিত কিয়াতান (Kia Tan)এর ভৌগোলিক বিবরণীতে টনকিন হইতে ইউনান ও বর্মার মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে আসিবার দুইটি পথের বিবরণ পাওয়া যায়। ৯৬৪ খৃষ্টাব্দে চীনা সম্রাট ধর্মগ্রন্থ অনুসন্ধান করিবার জন্য যে ৩০০ জন ধর্মযাজক ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন, তাঁহারা ফিরিবার সময় ইউনানের মধ্য দিয়া যান। ইহা হইতে বুঝা যায় যে দশম শতাব্দীতেও এই পথ যথেষ্ট ব্যবহার করা হইত। এইরূপে প্রমাণ পাওয়া যায় যে যদিও ইন্দোচীনের উপকূলভাগ হইতে দূরে অবস্থিত দেশগুলি ও ভারতবর্ষের মধ্যে যাতায়াতের স্থলপথ কিছুকাল পূর্বেও সামান্যই পরিচিত ছিল, তথাপি সুদূর অতীতে এই পথ পার হইয়াই ভারতীয় ঔপনিবেশিকরা এই অঞ্চলে ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিল।

হিন্দুধর্মে অনুপ্রাণিত থাইদের স্বাধীন গন্ধার রাজ্য একটি শক্তিশালী ও সুগঠিত রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। প্রথমে ইহার সহিত চীনের শান্তিপূর্ণ সম্বন্ধ ছিল এবং উভয়ের মধ্যে বন্ধুতাসূচক সন্ধিও নিষ্পন্ন হয়। ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে কো-লো-ফং সিংহাসনে আরোহণ করেন ও টলিফুতে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত করেন। তিনি একবার চীন পরিভ্রমণে যান, কিন্তু সেখানে অপমানিত হওয়ায় ক্রুদ্ধ হইয়া ফিরিয়া আসেন ও চীন আক্রমণ করেন। তিনি বত্রিশটি নগর ও গ্রাম দখল করেন এবং যে চীনা সৈন্যদল তাঁহার বিরুদ্ধে পাঠানো হয় তাহাদের তিনবার পরাজিত করেন। তিনি তিব্বতের সহিত সন্ধি করেন এবং ৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে আবার চীনাদের পরাজিত করিয়া তাহাদের যথেষ্ট ক্ষতিকরেন। কো-লো-ফঙ্গের পরে তাঁহার পৌত্র ই-মিউ-সিন ৭৭০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তাঁহার তিব্বতীয় মিত্রদের সহিত মিলিত হইয়া চীন আক্রমণ করেন, কিন্তু পরাজিত হন। অতঃপর তিনি চীনাদের সহিত সন্ধি করিলেন, তাঁহার রাজ্যে যে সব তিব্বতীয় ছিল তাহাদিগকে হত্যা করিলেন,

তিব্বত আক্রমণ করিয়া যোলটি নগর অধিকার করিলেন ও অজস্র দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া আনিলেন। কিন্তু চীনের সহিত শান্তি বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। ৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ই-মিউ-সিনের এক উত্তরাধিকারী চীন আক্রমণ করিলেন এবং সুদক্ষ কারিগর সহ বহু ব্যক্তি বন্দী করিয়া আনিলেন। ৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে গন্ধারের রাজা সম্রাট উপাধি গ্রহণ করিলেন। ইহাতে চীনের টাং সম্রাট অপমানিত বোধ করিলেন। ফলে দীর্ঘকাল ধরিয়া দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ চলিল, কিন্তু চীনারা ক্রমাগতই পরাজিত হইতে লাগিল। গন্ধারের সম্রাট ৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে টনকিন আক্রমণ করেন এবং ৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে আনাম জয় করেন। কিন্তু তিন বৎসর পরেই চীন এই দেশ পুনরায় দখল করে। চীনাদের দ্বারা ফা নামে অভিহিত একজন নূতন সম্রাট ৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে গন্ধারের সিংহাসন লাভ করেন। তিনি চীনের সহিত শান্তি স্থাপন করেন এবং ৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র চীন সম্রাটের কন্যা বিবাহ করেন। ইহার পর হইতে চীন আর গন্ধারের সহিত বিবাদ করে নাই। কারণ শক্তিশালী টাং রাজবংশ বহুদিন ব্যাপী যুদ্ধে বিফল হওয়ায় গন্ধারের শক্তি সম্বন্ধে চীনের গভীর শ্রদ্ধা জন্মে। এই নিষ্ফল যুদ্ধের স্মৃতি এতদূর দুঃখপূর্ণ হইয়াছিল যে যখন প্রথম সং বংশীয় সম্রাটের (৯৬০-৯৭৬ খ্রী) এক সেনাপতি গন্ধার আক্রমণের প্রস্তাব করিল, তখন টাং রাজ্যকালের চীনা সৈন্যদের দুর্দশা স্মরণ করিয়া সম্রাট ঐ রাজ্যের সহিত কোনও প্রকার বাদ বিসংবাদ করিতে অস্বীকার করিলেন।

বর্তমান কালের ইউনানে অবস্থিত গন্ধার বা বিদেহ রাজ্য ছাড়া হিন্দুধর্মে অনুপ্রাণিত আর কোনও থাইরাজ্যই বিশিষ্ট শক্তিশালী বা প্রভাবশালী রাজ্যে পরিণত হয় নাই। ইহাদের বেশির ভাগই তাহাদের প্রতিবেশী হিন্দুধর্মে অনুপ্রাণিত শক্তিশালী বর্মী, মোন ও খ্মেরদিগের অধীন রাজ্যরূপে ও প্রায়ই ইহাদের রাজ্যের অংশরূপে পরিগণিত হইত।

হিন্দুধর্মে অনুপ্রাণিত গন্ধারের থাইরাজ্য ১২৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং এই সময়ে মোঙ্গল সম্রাট কুবলাই খাঁ ইহা জয় করেন। দক্ষিণ দিক হইতে চীনদেশ আক্রমণের চেষ্টায় কুবলাই খাঁ এমন একটি দুঃসাহসিক সামরিক অভিযান করেন যাহার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে খুবই বিরল।

একলক্ষ সৈন্যসহ মোঙ্গলিয়ার নিংসিয়া (Ning-hsia) হইতে যাত্রা করিয়া কয়েক শত মাইল বিস্তৃত যে তুষারাবৃত পর্বতমালা কুয়েনলুন (Kuen Lun) পর্বতমালা ও হিমালয়ের দুর্গম অংশ-বিশেষ এবং চীন ও তিব্বতের উচ্চ মালভূমির মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর রূপে বিরাজিত, তাহা অতিক্রম করেন। সামরিক পার্বত্যজাতিদিগের সহিত অনবরত যুদ্ধ করিতে করিতে তুষারাচ্ছন্ন উপত্যকার মধ্য দিয়া প্রায় হাজার মাইল পার হইয়া তিনি ইউনানের সীমান্তে ইয়াং সি কিয়াং নদীর তীরে উপস্থিত হন। গন্ধারের রাজা আত্মসমর্পণ করিতে অসম্মত হইয়া প্রাণপণে মোঙ্গলদের বাধা দেন। কিন্তু তিনি কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হন এবং তাঁহার রাজধানী অধিকৃত হয়। অবশেষে ১২৫৩ খৃষ্টাব্দে রাজা আত্মসমর্পণ করেন এবং হিন্দুধর্মে অনুপ্রাণিত গন্ধারের থাই রাজ্যের অবসান হয়।

সম্ভবতঃ গন্ধার রাজ্যের পতনের ফলে হিন্দুধর্মে অনুপ্রাণিত থাইরা এই রাজ্য হইতে দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলে চলিয়া যাইতে থাকে এবং এই কারণেই এই অঞ্চলে থাই রাজ্যগুলির প্রতিষ্ঠা ও শক্তি বৃদ্ধি হয়। কেহ কেহ মনে করেন যে মোঙ্গলদের দ্বারা গন্ধার বিজয়ের বেশ কিছুকাল আগে হইতেই থাই জাতি ধীরে ধীরে দক্ষিণ অঞ্চলে প্রবেশ আরম্ভ করিয়াছিল। এই মতের সপক্ষে ভামোর উত্তরে মোগৌঙ্গে (Mogaung) ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং মোন বা মুঙ্গঙ্গ-নাইতে ১২২৩ খ্রীষ্টাব্দে থাইরাজ্য স্থাপনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১২২৯ খ্রীষ্টাব্দে থাইরা উত্তরে আসাম জয় করে এবং পশ্চিমে টেনাসেরিম ও আরাকান পর্যন্ত অগ্রসর হয়। অপর দিকে যে শান্‌জাতি বহুকাল

যাবত বর্মার সীমান্ত প্রদেশে পার্বত্য অঞ্চলে বাস করিতেছিল তাহারাও এই সময় যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়া উর্ধ্বতন বর্মা দখল করে এবং এই অঞ্চল প্রায় আড়াইশত বৎসর (১২৮৭-১৫৩১ খ্রী) তাহাদের শাসনাধীন থাকে। কিন্তু থাইদের দক্ষিণ অঞ্চলের বিজয়ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কারণ তাহারা সমস্ত শ্যাম দেশে তাহাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং এখন পর্যন্ত এই দেশ তাহাদের অধীনে আছে।

২। শ্যামের থাইজাতি

বর্মার স্থায় শ্যামেও থাইরা ত্রয়োদশ শতাব্দের বহু আগেই বসতি স্থাপন করিয়াছিল এবং খুব সম্ভব ছোট ছোট রাজ্যও গঠন করিয়াছিল। বর্তমানে যে দেশ লাওস নামে পরিচিত, অর্থাৎ উত্তর উডন, ভিয়েংচান ও লুয়াং প্রাবাং শহরগুলি সহ মেকং উপত্যকা এবং পশ্চিমে পেচবুন ও চলিয়েং (প্রাচীন সবঙ্কলোক), এই সমস্ত অঞ্চলই শিব্ সোং চু থই-র রাজা ক্রোম ও তাহার উত্তরাধিকারীদের ক্রমবর্ধমান রাজ্যের অন্তর্গত হয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দের প্রথম দিকে হরিপুঞ্জয় মোন জাতির অধীনে ছিল। মিশ্রিত পালি ও মোন ভাষায় রচিত ১২১৫, ১২১৮, ও ১২১৯ খ্রীষ্টাব্দের লেখ হইতে রাজা সব্বাধিসিদ্ধির নাম জানা যায়। থাইদের দ্বারা বিজিত হইবার পূর্ব্বে এই রাজ্যে আরও কয়েকজন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া আখ্যায়িকাগুলিতে উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দে রাজা ইন্দ্রাদিত্য সর্বপ্রথম সুখোদয় নামে শক্তিশালী একটি থাই রাজ্য স্থাপন করেন। সমস্ত শ্যাম দেশটি কাম্বোজ রাজের অধীনে ছিল এবং এই সময়ে তাঁহার বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ সফল হওয়ায় ফলে এই রাজ্য স্থাপন সম্ভব হইয়াছিল। একজন কাম্বোজ সেনাপতিকে এই বিদ্রোহ দমন করিতে পাঠানো হয় কিন্তু যুদ্ধে সে পরাজিত হয় ও বিজয়ী ইন্দ্রাদিত্য সুখোদয়ে

(সুখোথই) রাজধানী স্থাপন করিয়া একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিবেশীদের সহিত অবিরত সংগ্রাম করিয়া ইন্দ্রাদিত্য চারিদিকে তাঁহার রাজত্ব বিস্তার করেন এবং এই রকম একটি যুদ্ধে তাঁহার পুত্র রাম কামহেঙ্গ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ইন্দ্রাদিত্যের রাজ্যকাল সঠিকরূপে নির্ণয় করা যায় না, তবে আপাততঃ ইহা ত্রয়োদশ শতাব্দের মাঝামাঝি ধরিয়া লওয়া যায়। তাঁহার পরে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র কিছুকাল রাজত্ব করেন ও ইহার মৃত্যুর পরে রাম কামহেঙ্গ ১২৮৩ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্বে সিংহাসন আরোহণ করেন। তিনি যে একটি বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া রাখিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহার বংশের ও তাঁহার নিজের কীর্তি-কলাপের বহু খবর পাওয়া যায়। তিনি যে সমস্ত রাজ্য জয় করিয়াছিলেন তাহাদের একটি দীর্ঘ তালিকাও এই বিবরণে পাওয়া যায়। শ্যামের কতকগুলি থাইরাজ্য ছাড়াও নিম্নবর্মার হংসাবতী বা পেগু এবং মালয় উপদ্বীপের নখোন সি থম্মরতের নাম; এবং মেকং ও মেনাম নদীর তীরে অবস্থিত লুয়াং প্রাবাং পর্যন্ত কয়েকটি খ্মের (Khmer) রাজ্য এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে অতিরঞ্জন যাহা আছে তাহা বাদ দিলেও ইহা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করা যায় যে রাম কামহেঙ্গ একজন ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন এবং সুখোদয়কে একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন। সুখোদয় ছাড়া এই রাজ্যে সজ্জনালয় নামে আর একটি রাজধানী ছিল এবং এই রাজ্য কখনও কখনও সজ্জনালয়-সুখোদয় নামে অভিহিত হইত। মোন রাজ্য হরিপুঞ্জয় ১২৯১-২ খ্রীষ্টাব্দে চিয়েং রায়ের থাই রাজকুমার মংরে দ্বারা বিজিত হয় ও ইহার রাজধানী চিয়েংমায়ে স্থানান্তরিত হয় (১২৯৬ খ্রী)।

রাম কামহেঙ্গ লুয়াং প্রাবাং হইতে লিগোর ও ভিয়েঙ্গচান হইতে পেগু পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু সমস্ত শ্যামদেশ তাঁহার অধীনে একটি রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল একথা মনে করা

ভুল হইবে। প্রকৃত পক্ষে শ্যামদেশ অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং এইগুলির মধ্যে আরও তিনটি স্বাধীন থাইরাজ্য যথেষ্ট সুপরিচিত ছিল। প্রথম দুইটি উত্তর শ্যামের প্রাচীন ইয়োনোকে, তৃতীয়টি লান না চাঙ্গ,—ইহার রাজধানী ছিল ভিয়েঙ্গ চান। প্রথম দুইটি লান না থাইর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহা ছাড়া নিম্ন মেনাম উপত্যকায় সুখোদয়ের দক্ষিণে ছিল লুভো বা লোপবুরি। ইহাদের সবগুলি কিংবা বেশির ভাগ কাম্বোজ রাজ্যের অধীনে ছিল এবং ত্রয়োদশ শতাব্দে থাই নায়কদের চেষ্টায় স্বাধীনতা লাভ করে। ১২৮২ হইতে ১৩২৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সিয়েন এবং লো-হু নামে দুই রাজ্য হইতে পুনঃ পুনঃ চীনে দূত পাঠানোর উল্লেখ চীনা ঐতিহাসিকরা করিয়াছেন। চীনা ভাষায় লিখিত এই নাম দুইটি যে শ্যাম ও লোপবুরি সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও কারণ নাই। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে লোপবুরি যদিও সুখোদয়ের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল তথাপি ইহার প্রাধান্য বজায় ছিল। ইহা উল্লেখযোগ্য যে তখন পর্যন্ত শ্যাম বলিতে কেবল এই দেশের উত্তর অঞ্চলকে বুঝাইত, সমস্ত দেশকে নহে। এই প্রভেদ কাম্বোজেও স্পষ্ট দেখা যায়, কারণ অঙ্কোর ভাটের উত্তর-পশ্চিম অলিন্দে কাম্বোজ দেশীয় পরিচ্ছদে ভূষিত সৈন্যদের লুভোর (Lvo) সেনাদল রূপে পরিচয় লেখা আছে এবং অন্য ধরনের পোশাক ও অস্ত্রে ভূষিত সেনাদল শ্যামকুটের সেনাদল বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। শ্যাম নামটি আসলে প্রথমে সুখোদয় রাজ্যের নাম ছিল। কিন্তু রাম কামহেঙ্গের বিজয়ের ফলে অন্য সকল রাজ্যের উপর সুখোদয়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই নাম সমস্ত দেশের উপর আরোপ করা হয়।

সামরিক দক্ষতা ছাড়াও রাম কামহেঙ্গের চরিত্রে অন্যান্য অনেক বিশিষ্ট গুণ ছিল এবং এই কারণে তিনি মহৎ রাজা এই উপাধির যোগ্য পাত্র। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও যে যুগে তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিলে তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা ও মনুষ্যত্বের

যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার ন্যায়ধর্মের দ্বারা পরিচালিত শাসনে প্রজারা সুখ ও সমৃদ্ধির মধ্যে দিন কাটাইত। রাজা সর্বদাই প্রজাদের সুখ সুবিধার দিকে নজর রাখিতেন এবং ছোট ও বড় কেহই ন্যায়বিচার হইতে বঞ্চিত হইত না ; যাহাতে তাঁহার রাজ্যের নিম্নতম শ্রেণীর প্রজাও রাজার সাহায্য হইতে বঞ্চিত না হয় সেই জন্য রাজপ্রাসাদের দরজার কাছে একটি ঘণ্টা টাঙানো থাকিত। যে কেহ নিজেকে উৎপীড়িত মনে করিত ও রাজার সাহায্য লাভ করিতে ইচ্ছুক হইত সে এই ঘণ্টা বাজাইত। রাজা এই ঘণ্টাধ্বনি শুনিলে তাহাকে দর্শন দিয়া ন্যায্য বিচার করিতেন।

দেশবাসীর সুবিধার জন্য রাম কামহেঙ্গের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কার্য, প্রচলিত লিপিকে থাইভাষার উপযোগী সংস্করণ ও প্রচলনের ব্যবস্থা। ভারতীয় লিপির যে পরিবর্তিত রূপ কাম্বোজে প্রচলিত ছিল তাহাই এ যাবৎ শ্যামদেশে ব্যবহৃত হইত। রাম কামহেঙ্গ ইহাকে থাইভাষার উপযোগী করিয়া পরিবর্তিত করিলেন এবং ইহাই থাইদের জাতীয় লিপিরূপে গৃহীত হইল। রাজা বৌদ্ধধর্মের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং সুখোদয় নগরী মন্দির, আশ্রম ও বুদ্ধ মূর্তি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থগুলির উপর সকলের গভীর আস্থা ছিল এবং এইগুলি নিয়মিত অধীত হইত।

রাম কামহেঙ্গের রাজত্বের যে দুইটি তারিখ জানা যায়, তাহা ১২৮৫ ও ১২৯২ খ্রীষ্টাব্দ। তবে তাঁহার রাজ্যকালের সঠিক তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব নহে। সোয়াডেসের (Coedes) মতে রাম কামহেঙ্গ ১৩১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহা মানিয়া লইলে ১৩১৩ খ্রীষ্টাব্দে যে রাজা চম্পার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন, তিনিও রাম কামহেঙ্গ একই ব্যক্তি ধরিয়া লইতে হইবে। এই যুদ্ধযাত্রা থাইশক্তির ক্রমশঃ শক্তিবৃদ্ধি এবং কাম্বোজ দেশের অবনতির পরিচায়ক। কারণ চম্পা আক্রমণের জন্য থাইদের কাম্বোজ দেশের মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছিল।

রাম কামহেঙ্গের পুত্র ও উত্তরাধিকারী লো-থাই (লোদৈয়) ট্যাভয় ও টেনাসেরিম পুনরায় জয় করেন, কিন্তু যখন মার্তাবান জয় করিতে অগ্রসর হন তখন গুরুতররূপে পরাজিত হন। সম্ভবতঃ ১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। লো-থাই-এর পুত্র লু-থাই (লিদৈয়) তাঁহার পিতার রাজ্যকালে সাত বৎসর (১৩৪০-৪৭ খ্রী) রাজপ্রতিনিধিরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং ১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আনুষ্ঠানিক ভাবে শ্রীসূর্যবংশ রাম মহাধর্ম-রাজাধিরাজ নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং বিনয়, অভিধর্ম ও জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি বিষ্ণু ও শিব মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং ১৩৬১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহল হইতে একজন বৌদ্ধ পুরোহিতকে তাঁহার রাজ্যে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন। এই রাজা একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন এবং ধর্মানুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাম কামহেঙ্গের বিজিত বিস্তৃত রাজ্য শাসন করিবার উপযুক্ত ছিলেন না।

রাম কামহেঙ্গের জীবিতকালেই প্রাচীন লোপবুরি রাজ্য একজন থাইরাজার অধীনে স্বাধীনতা বজায় রাখিয়াছিল এবং ১২৮৯ হইতে ১২৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কয়েকবার চীনে দূত পাঠাইয়াছিল। এই রাজ্যের থাই রাজা জয়শ্রীর পরে প্রথমে তাঁহার পুত্র ও পরে তাঁহার জামাতা উ-টংএর অধিপতি এই রাজ্য লাভ করেন। উ-টং-এ কলেরা রোগ মহামারী রূপে দেখা দেওয়াতে তিনি ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে লবোর (লোপবুরি) একত্রিশ মাইল দক্ষিণে মেনাম নদীর একটি দ্বীপে তাঁহার আবাসস্থল স্থাপন করেন। নূতন রাজা রামাধিপতি নাম গ্রহণ করেন এবং নূতন নগরটি দ্বারবতী শ্রীঅযোধ্যা (অযুথিয়া) নামে পরিচিত হয়। ইহার পূর্বে ১৩৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সুখোদয় আক্রমণ করেন এবং ইহার রাজাকে তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইতে হয়। এই সময় হইতে শ্যামদেশের থাইরাজ্যগুলির মধ্যে সুখোদয় রাজ্যের পরিবর্তে অযোধ্যা রাজ্য প্রাধান্য লাভ করে।

সুখোদয়ের রাজারা পূর্ব শক্তি ও গৌরব হারাইয়া প্রথমে অযোধ্যার অধীন রাজারূপে এবং ক্রমশঃ এই সম্মান হইতেও বঞ্চিত হইয়া বংশানুক্রমে সুখোদয়ের শাসনকর্তার স্থান গ্রহণ করেন। অযোধ্যা রাজ্য ক্রমশ: লাওস ও কাম্বোডিয়ার বেশ কিছু অংশে তাহার আধিপত্য বিস্তার করে কিন্তু বর্মা দেশের রাজার কাছে বড় রকমের পরাজয় স্বীকার করে। গৌরবময় ও শক্তিশালী রাজারূপে এবং মাঝে মাঝে নানারূপ বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইয়াও এই রাজ্য আধুনিককাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত আছে। অযোধ্যা নগরটি ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বর্মা আক্রমণের ফলে বিনষ্ট হয় এবং রাজধানী ব্যাঙ্ককে স্থানান্তরিত হয়। এখন পর্যন্ত রাজধানী এইখানেই আছে।

আগেই বলা হইয়াছে যে থাইরা তাহাদের আদি নিবাসস্থলেই অংশতঃ হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। শ্যামদেশ জয় করিবার পর এই দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা তাহারা পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করে। সুখোদয় ও অযোধ্যার অধিবাসী ও রাজগণ বৌদ্ধধর্মের অনুগামী ছিলেন এবং এখন পর্যন্ত ইহাই এই দেশের ধর্ম। পালি পবিত্র ভাষারূপে পরিগণিত হইত এবং পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দেও ঐতিহাসিক বিবরণীগুলি ও অন্যান্য গ্রন্থ এই ভাষায় লেখা হইত। বর্মার ন্যায় শ্যামদেশেও ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা ভাষা, সাহিত্য, শিল্প ও ধর্মের মধ্য দিয়া রক্ষিত হইয়াছে। ভারতীয় নগরগুলির নামানুসারে নগরের নামকরণ এবং বৌদ্ধ কাহিনীগুলির অন্তর্গত বুদ্ধদেবের জীবনের নানাবিধ ঘটনার সহিত এই নগরগুলির সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা বর্মার ন্যায় এখানেও লক্ষ্য করা যায়।

মন্দির ও মূর্তি নির্মাণ বিষয়ে শ্যামের থাই রাজাদের যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। যদিও থাইশিল্প কাম্বোজ ও দ্বারবতীর হিন্দুশিল্প দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত ছিল, তথাপি ইহার মধ্যে যে নূতন উপাদান ও ধারা প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা হইতেই বিশিষ্ট শ্যামদেশীয় শিল্পের উদ্ভব হয়। একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত লিখিয়াছেন :

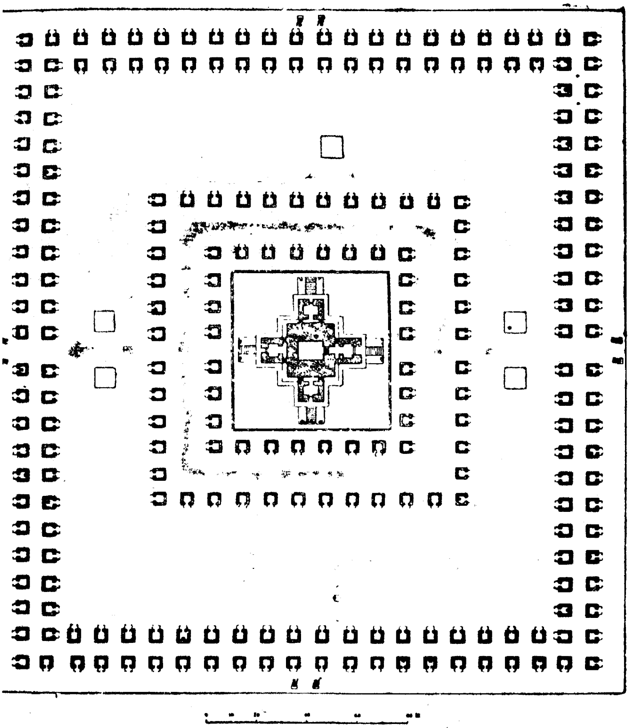
"সেই সময় ভারতীয় প্রভাব প্রত্যক্ষ অনুভূত না হইলেও ইহার স্বতন্ত্র সত্ত্বা এত প্রখর ছিল যে কখন কি উপায়ে এই আদর্শ শ্যামে উপনীত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও স্তূপ ও শিখরের স্থাপত্য শিল্পের শৈলীতে, বুদ্ধমূর্তি নির্মাণে ভাস্কর্যের আদর্শে, এবং অলংকরণের অসংখ্য নকশার নমুনা হইতে অনায়াসে শ্যামের শিল্পকে ভারতীয় উপনিবেশ-শিল্পের একটি শাখা বলিয়া সনাক্ত করিতে পারিবে। এমন কি শ্যামের ক্ষুদ্র শিল্পগুলি, যথা রৌপ্য, লাক্ষা, খোদাই ও বস্ত্র শিল্পের মূলে ভারতীয় উপাদান দেখা যায় ও ভারতীয় শিল্পের সহিত নিকট সম্বন্ধ লক্ষ্য করা যায়।"[১]

বস্তুতঃ পুরাতত্ত্বীয় প্রমাণ বিচার করিলে কোনওরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের প্রেরণাতেই শ্যামের শিল্পের উৎপত্তি হয় এবং যুগযুগান্তর ধরিয়া বিশুদ্ধ ভারতীয় শিল্প ইহাকে প্রেরণা দিয়াছে ও ইহাকে পরিচালিত করিয়াছে।

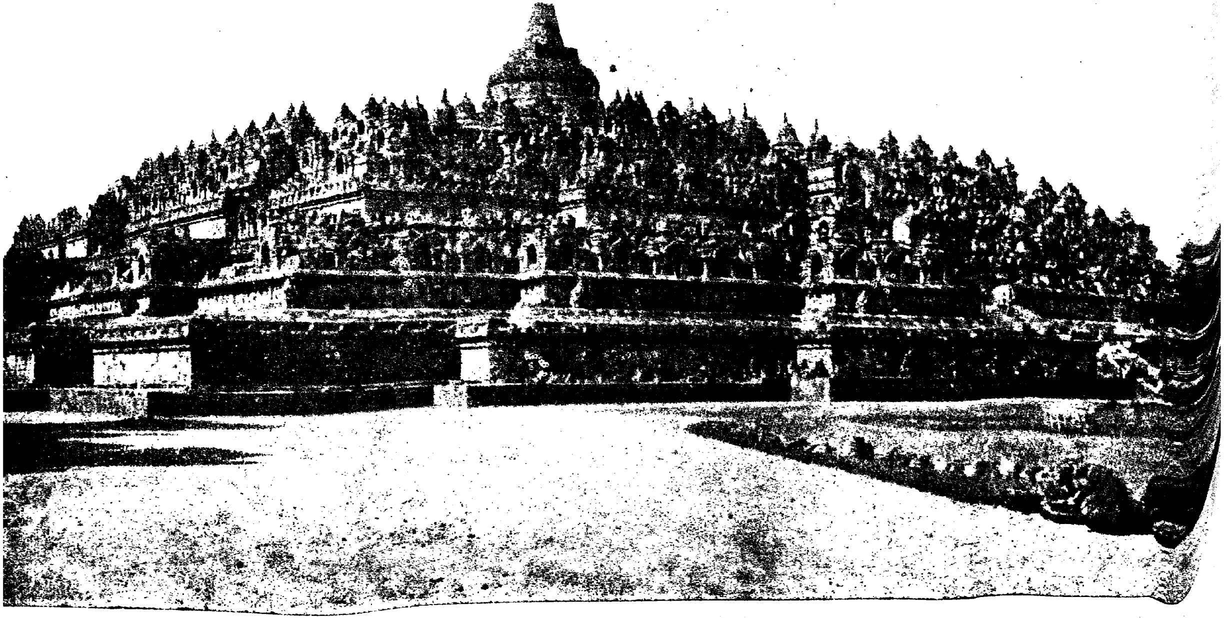
সর্বশেষে লাওস দেশে থাইরাজ্য প্রতিষ্ঠার সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন। রাম কামহেঙ্গের ভিয়েংচান জয় করার পরেও কাম্বোজ রাজগণ খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত মেকং নদী যেখানে পূর্বদিকে একটি বৃহৎ বাঁক নিয়াছে সেই পর্যন্ত শাসন করিতেন। কিন্তু সুখোদয়ের পতনের পরেই ১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ফাঙ্গুম ভিয়েংচান-এ একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন এবং ক্রমে ক্রমে লুয়াং প্রাবাং এবং কয়েকটি পার্শ্ববর্তী অঞ্চল জয় করেন। এইরূপে লাওস দেশে একটি শক্তিশালী থাইরাজ্য গড়িয়া উঠে এবং ইহার ফলে কাম্বোজ রাজ্যের সীমানা বসাক ও কোরাট ছাড়িয়া আরও দক্ষিণে সরিয়া যায়। এই রাজ্য প্রতিষ্ঠার একটি সুফল হইল এই যে শ্যাম ও কাম্বোজের ভারতীয় সভ্যতা মেকং নদীর ঊর্ধ্বতন উপত্যকায় বিস্তৃত হইল।



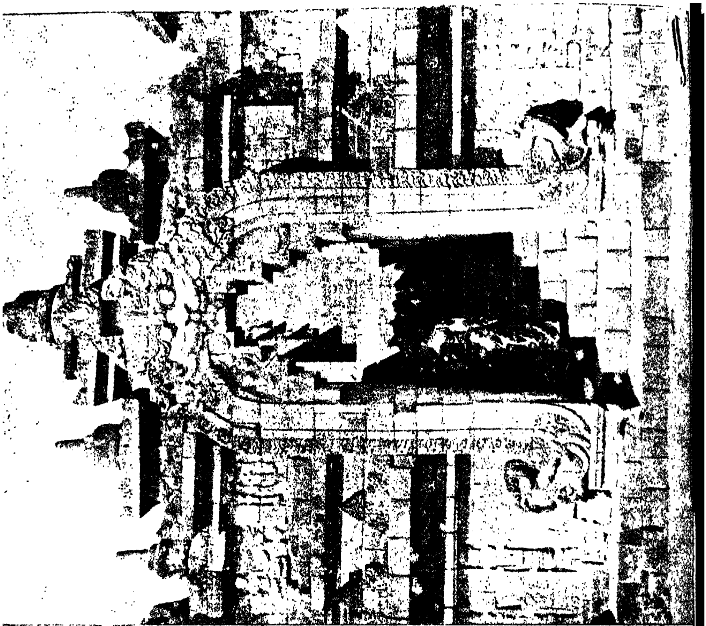
চণ্ডি বিম (ডিয়েং, জাভা)

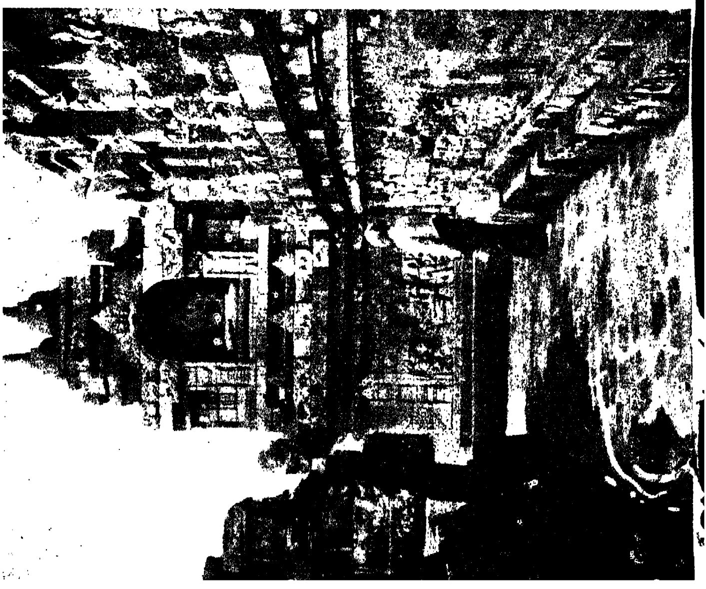


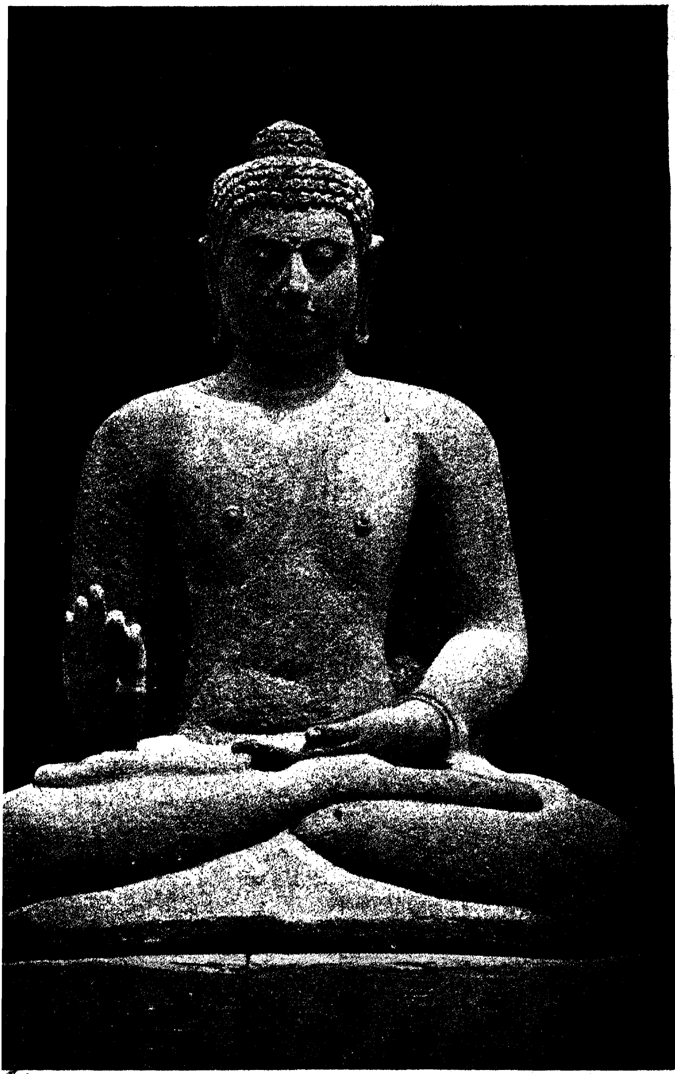
চণ্ডি সেবুর নকশা (জাভা)



বড়বুদুর



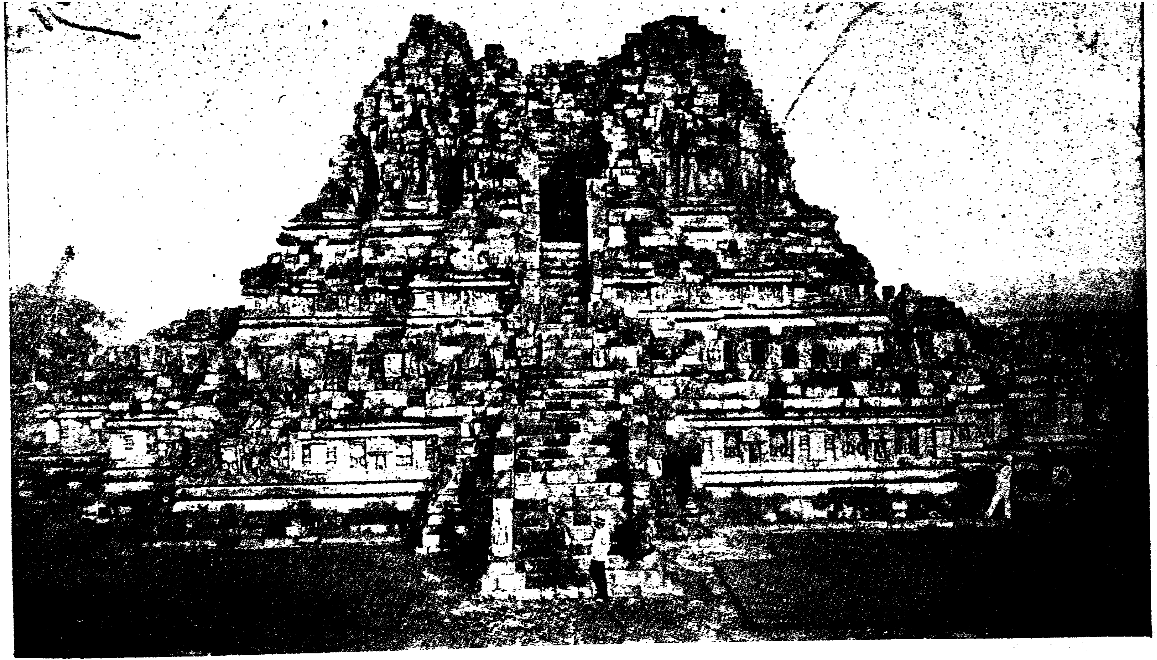




বুদ্ধ, বড়বুদুর

নং ৬





লরা-জো রং মন্দির (জাভা)



মহাদেব, লরা-জোংরং



(১) খোদিত পাষাণ-ফলক, লরা-জোংরং



(২) খোদিত পাষাণ-ফলক, পনতরণ (জাভা)

প্লেট নং ১০



প্রজ্ঞাপারমিতা চণ্ডি সিংঘসারি





পো রোম মন্দির (চম্পা)



পো ক্লোং গোরাই মন্দির (চম্পা)

ট নং ১৬

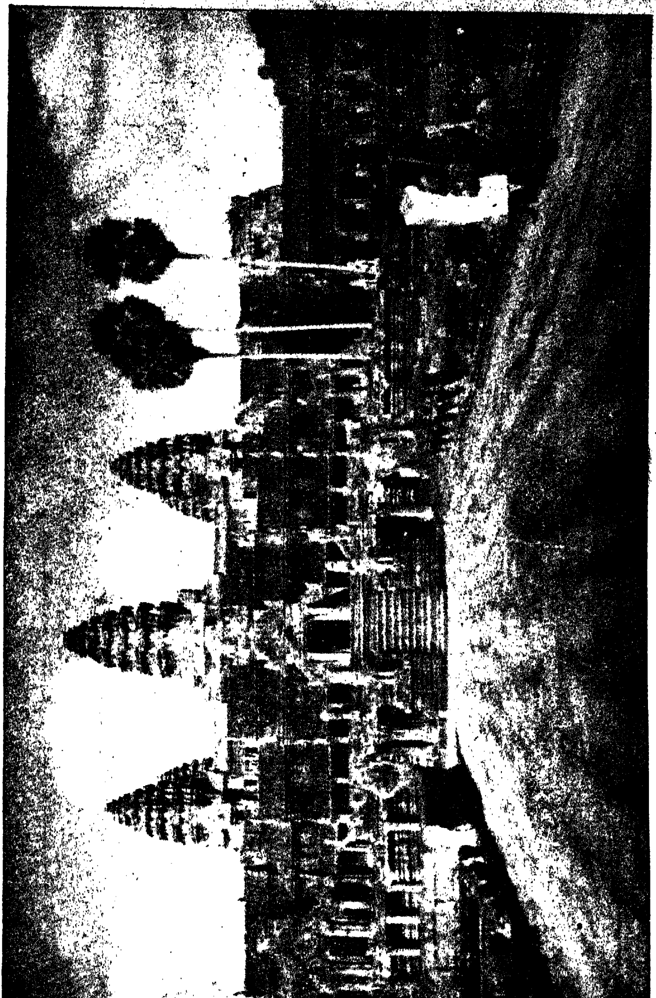


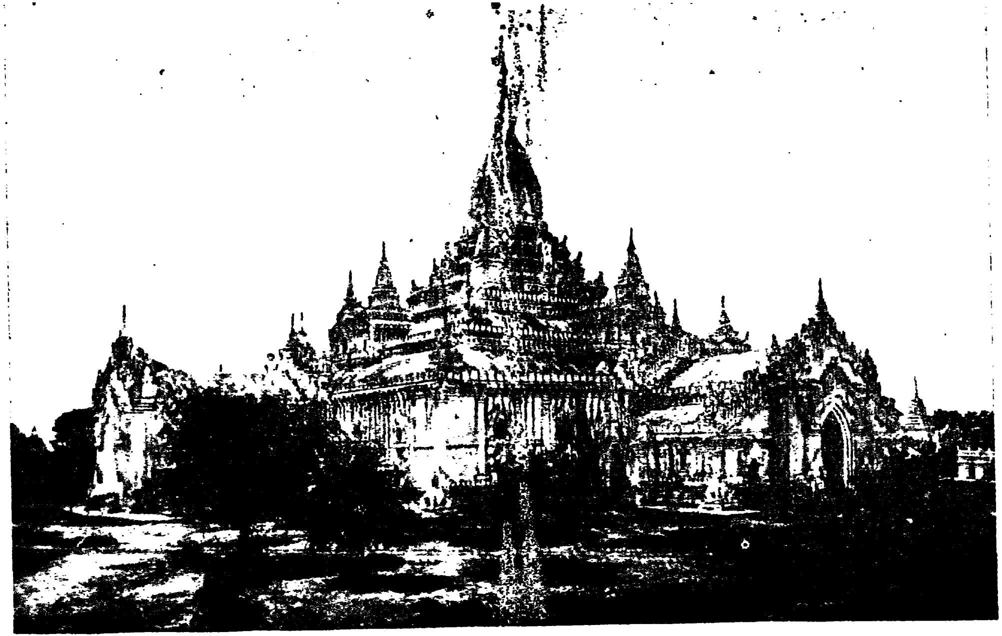
(১) স্কন্দ, মাইসোন



(২) বুদ্ধ, ডং ডুওঙ্গ (চম্পা)

প্লেট নং ২৭





আনন্দ মন্দির (বার্মা)



বুদ্ধ, কোত বঙ্গুন (বোর্ণিও)

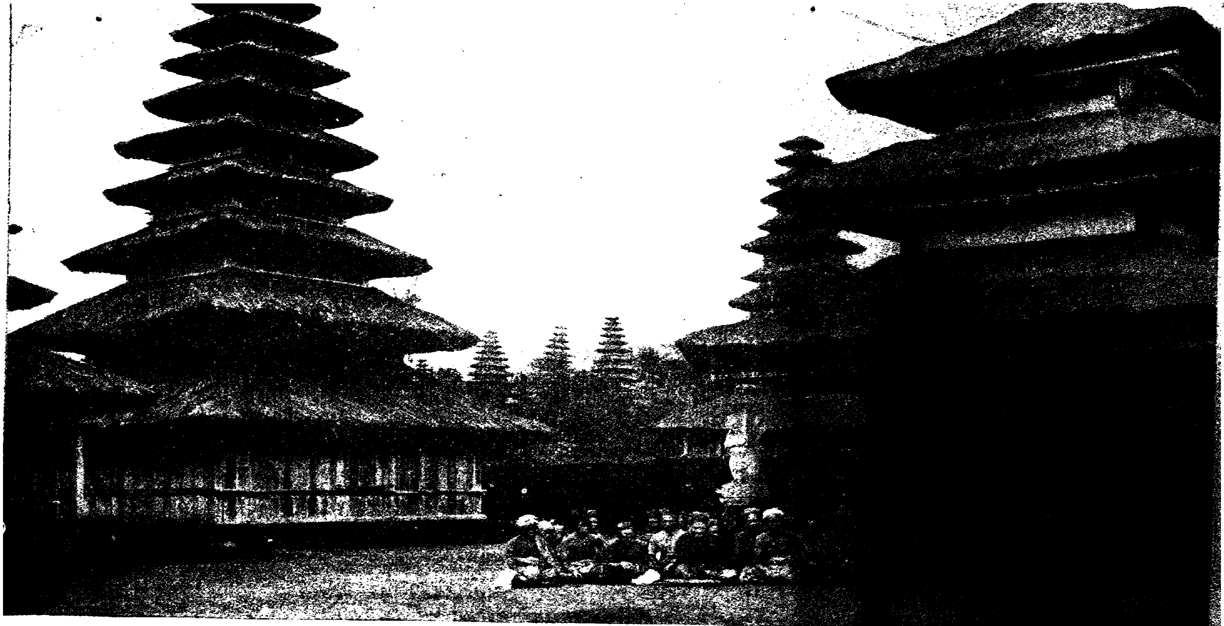


বুদ্ধ, (মালয় উপদ্বীপ)



বুদ্ধের তাম্রমূর্ত্তি (সেলিবেশ)





বেসকি মন্দির (বলি)

नं २४

